পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা

মোঃ আবদুল হান্নান

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা

BANSDOC Library
Dhaka

ড. মোঃ আবদুল হান্নান
প্রোগ্রাম অফিসার
সিএনআরএস
ঢাকা

BANSDOC Library
20934

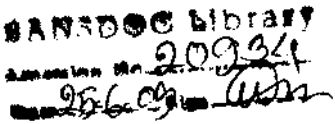

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা
[পরাগায়নবিষয়ক]

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১০/জুন ২০০৩

বা/এ ৪৩৬৬
(২০০২-২০০৩ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ৮)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩০৬

প্রকাশক
মুহম্মদ নুরুল হুদা
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
একশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র

PORAGAYON PRATIBESHBIDDYA (Pollination Ecology) by Dr. Md. Abdul Hannan, Published by Mohammad Nurul Huda, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2003. Price : Taka 195.00 only.

ISBN 984-07-4375-9

উৎসর্গ
আমেনা, মনু ও নিওরাকে

WEB

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	পরাগায়নের ইতিহাস	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা	৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	মৌমাছির পরাগায়ন	২২
চতুর্থ অধ্যায়	:	স্বতন্ত্র মৌমাছির পরাগায়ন	২৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	হুলবিহীন মৌমাছির পরাগায়ন	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	বাংলাদেশের মৌমাছি	৩৯
সপ্তম অধ্যায়	:	এশিয়ার মৌমাছি	৬২
অষ্টম অধ্যায়	:	আফ্রিকান মৌমাছি	৬৭
নবম অধ্যায়	:	ইউরোপের মৌমাছি	৮৭
দশম অধ্যায়	:	কৃষিকাজে পলিনেটরের ভূমিকা	৯০
একাদশ অধ্যায়	:	শস্য পরাগায়ন ও বন্য মৌমাছি	৯৮
দ্বাদশ অধ্যায়	:	দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পলিনেটর গ্রুপ	১০৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	বন্য পলিনেটরের জন্য বাসস্থান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা	১১২
চতুর্দশ অধ্যায়	:	কীটপতঙ্গ এবং পরিবেশ	১১৯
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	সামাজিক মৌমাছি এবং পরিবেশ	১২২
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	:	পলিনেটর ব্যবস্থাপনা	১২৪
সপ্তদশ অধ্যায়	:	কীটপতঙ্গ উৎপাদনের শিল্প প্রতিষ্ঠান	১২৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	:	পরিবেশতন্ত্রে পলিনেটরের গুরুত্ব	১২৮
ঊনবিংশ অধ্যায়	:	ফুলের গঠন	১৩০
বিংশ অধ্যায়	:	পরাগ	১৪১
একবিংশ অধ্যায়	:	নেকটার	১৪৮
দ্বাবিংশ অধ্যায়	:	পলিনেটর চিহ্নিত করা	১৫২
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	:	মৌ-উদ্ভিদ	১৫৫
		পরিশিষ্ট ১	১৭২
		পরিশিষ্ট ২	১৮০
		পরিশিষ্ট ৩	১৮৮
		তথ্যপঞ্জি	১৯৩
		নির্ঘণ্ট	২০৫

ভূমিকা

পরাগায়ন নিয়ে বর্তমানে সারা বিশ্বে অনেক অনেক উন্নতমানের কাজ হচ্ছে, বিশেষ করে ইউরোপের কতগুলো দেশে, জাপানে এবং উত্তর আমেরিকায়। সবার একটিই লক্ষ্য, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, উন্নতমানের ফল ও বীজ উৎপাদন এবং সর্বোপরি পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

উপযুক্ত পরাগায়ন ছাড়া শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই যেসব শস্য এবং ফল-মূলের পরাগায়ন হয় না তাদের উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে কখনোই লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা হলেও খুবই কম। সঙ্গত কারণেই আমাদেরও এ বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে এবং এর উন্নয়নের সঠিক পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

আজকাল সবাই পরিবেশ নিয়ে ভাবছেন এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন আশা করছেন। এ কাজ যদি সফল হয় তাহলে পরিবেশের সকল জীবই বেঁচে যাবে। একই সঙ্গে পলিনেটররাও বেঁচে যাবে। সাধারণত আমরা বড় বড় প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ে তথ্য বেশি পাই এবং তাদের প্রতিকারের কথাও ভাবি কিন্তু ছোটো ছোটো প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপারে খুবই কম জানি এবং তাদের প্রতিকারের কথাও নানাভাবে উপেক্ষিত হয়। কারণ এদের নিয়ে গবেষণা বেশ জটিল, কষ্টকর এবং সময়সাপেক্ষ। পলিনেটরের মতো এতবড় একটি উপকারী গ্রুপ কিছুতেই ফেলে রাখা উচিত নয়। এদের নিয়ে গবেষণা করতে হবে এবং এদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে যা পরিশেষে আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।

উন্নত দেশগুলো পরাগায়নের ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। যেখানে পলিনেটর নেই সেখানে কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটর উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে ফসলের পরাগায়ন ঘটানোর জন্য। আমাদের দেশে অবশ্য সে পর্যায়ে পৌছাতে অনেক সময় লাগবে। সেজন্যই এখনই কাজ শুরু না করলে খুব দেরি হয়ে যাবে এবং আমরা বঞ্চিত হবো পলিনেটরের প্রত্যক্ষ সাহায্য থেকে। আর অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে বিরাট এক রত্ন ভাণ্ডার।

সুখের কথা এই আমাদের দেশেও অনেক জাতের পলিনেটর রয়েছে এবং প্রাকৃতিকভাবে রয়েছে এদের উপযুক্ত বাসযোগ্য ভূমি। তবে যতদিন পর্যন্ত এদের সনাক্ত করা না যাবে এবং এদের কার্যপদ্ধতি ও জীবনবৃত্তান্ত না জানা যাবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের এদের সাহায্য পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আমরা এদের সম্পর্কে না জানলে এদের কাজে লাগানোর চিন্তা করা এক দুরূহ ব্যাপার বৈকি।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা সম্পর্কে ইংরেজিও খুব বেশি বই পাওয়া যাবে না। আমার গবেষণার সময় এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিলো তাই নানা উৎস থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন

ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এক পর্যায়ে মনে হয়েছে আমাদের মাতৃভাষায় এ বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করলে দেশে পলিনেটর সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হবে। তাই আমার ঐ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নতুন এক বিষয়ে কিছু লিখে সামান্য হলেও ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করলাম মাত্র।

এ গ্রন্থটি পরিবেশ নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের এবং পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা গবেষকদের সহায়ক পুস্তক হিসেবে খুবই প্রয়োজন হবে। প্রাণিবিজ্ঞান এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানের ছাত্র–ছাত্রী ও গবেষকদের জন্যেও Reference Book হিসেবে এর প্রয়োজন হবে।

এ গ্রন্থটি প্রণয়নের সময়ে অনেক তথ্য বিভিন্ন গবেষণাপত্র, বই প্রভৃতি থেকে নিয়েছি এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখ করেছি এজন্যে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যাদের অনুপ্রেরণায় গ্রন্থটি লিখতে পেরেছি প্রথমেই বলতে হয় আমার পিতা এবং অনুজ–এর কথা। আমার স্ত্রীর (এলিজা) অনুপ্রেরণা শুধু লিখতেই শক্তি যোগায়নি বরং সর্বক্ষণ উৎসাহিত করেছে এটি সুন্দরভাবে সমাপ্ত করার জন্য। গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাই।

এ বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ, ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের যেকোনো উন্নয়নমূলক পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ হবো। সবচেয়ে খুশি হবো যদি এ বইটি পড়ে আপনাদের মনে এতটুকুও দাগ কাটে যে, আমাদেরকে আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে একটি সুন্দর বাস্তব্যতন্ত্র তৈরি করার জন্য।

ড. মোঃ আবদুল হান্নান

প্রথম অধ্যায়

পরাগায়নের ইতিহাস

মৌমাছি এবং ফুলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। আর এও তাদের জানা ছিল যে ফল ও বীজ উৎপাদন করতে হলে অনেক ফুলেরই পরাগায়ন করানো প্রয়োজন।

মৌমাছির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে Aristotle তাঁর গ্রন্থ *History of Animals* এবং Virgil তাঁর গ্রন্থ *Georgics*-এ বর্ণনা করেছেন। Theophrastus খেজুরের নিষেকক্রিয়া (fertilization) সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করেন। ইংরেজ উদ্ভিদবিদ Nehemiah Grew (1682) বলেন যে, ফুলের পুংকেশর (stamen)-এর সঙ্গে বীজ উৎপাদনের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

Camerarius (1694) পরাগায়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, যদি ফুলের পরাগধানী (anther) ফেলে দেয়া হয় তাহলে সে ফুলে বীজ হয় না। Meeuse (1961) পরাগায়নের কথা বলতে গিয়ে মেসোপোটামিয়া সময়ের একটি সুন্দর চিত্রকর্ম তুলে ধরেন (চিত্র ১.১)। Professor Maeta মৌমাছি কিভাবে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তাদের বাসায় বয়ে নিয়ে যায় তার উপর একটি সুন্দর ছবি অঙ্কন করেছেন (চিত্র ১.৩)।

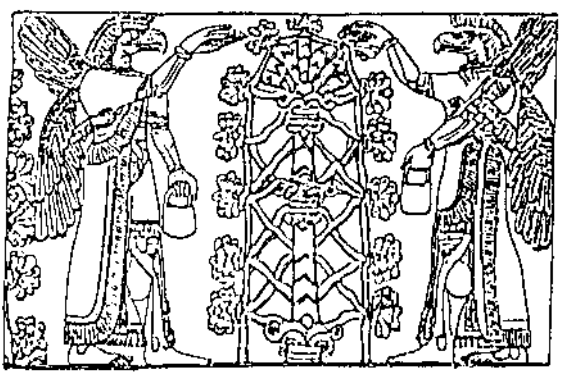

চিত্র ১.১ : মেসোপোটামিয়া সময়ের একটি চিত্রকর্ম যা সম্রাট আশুরনাসিরপাল (884-860 BC) এর সময়ে পাওয়া গিয়েছিল। Meeuse ১৯৬১ সালে এটি প্রকাশ করেন। দুজন দেবতা খেজুরের পুষ্পদণ্ড (inflorescence) ধরে আছে এবং স্ত্রী ফুলের কৃত্রিম পরাগায়ন করছে

১৭৫০ সালে Arthur Dobbs বলেন যে, মৌমাছি ফুলে পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এ সম্পর্কে ১৭৫১ সালে Miller ও একই কথা বলেছিলেন। Kolreuter ১৭৬১ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে পতঙ্গ পরাগায়নে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী Sprengel ১৭৯৩ সালে পতঙ্গ পরাগায়ন সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেন। Darwin ১৮৫৯ এবং ১৮৬২ সালে পতঙ্গ পরাগায়নের কথা বলেন। তাঁর Origin of Species এর পরাগায়ন সম্পর্কিত বিবরণ সে সময়কার গবেষকদের মাঝে পতঙ্গ, উদ্ভিদ এবং পরাগায়ন জীববিজ্ঞান (pollination biology) সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি করেছিলো। যার ফলশ্রুতিতে পরপর কয়েক দশকে এ বিষয়ে নিবিড় গবেষণা ও জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছিলো।

THE NATURAL HISTORY OF POLLINATION

চিত্র ১.২ : Sprengel প্রণীত গ্রন্থের শিরোপাতে পুষ্পবিন্যাসের উপর তাঁর পর্যবেক্ষণের অঙ্কিত চিত্রে হর্নেটমথ, মৌমাছি ও বোলতাকে পরাগায়ন করতে দেখা যাচ্ছে

বিজ্ঞানী Kato এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ১৯৯৫ সালে *Gnetum* এর পরাগায়ন জীববিজ্ঞান সম্পর্কে অর্থাৎ এর পলিনেটর (pollinator), পরাগ (pollen) এবং নেকটার (nectar) সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের বর্ণনায় *Gnetum* এর পলিনেটর হিসেবে পাওয়া গিয়েছে, দুধরনের নেকটার সংগ্রহকারী মথকে (Pyralidae এবং Geometridae গোত্রের)। এছাড়াও তাঁরা বলেন যে, এক ধরনের ছোট মাছিকেও (Lauxaniidae, Diptera) এদের পরাগ সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে। Kato (১৯৯৬) পরিষ্কারভাবে উদ্ভিদ এবং পলিনেটরের একটি সম্পর্ক চিত্র তুলে ধরেন তাঁর সারাওয়াকের একটি গবেষণায়। তিনি ২১টি পরিবারের ৪১টি উদ্ভিদের পরাগায়ন জীববিজ্ঞান সম্পর্কে সেখানে বর্ণনা করেন। এসব উদ্ভিদে প্রায় ৭১% মৌমাছি, ১০% পাখি এবং মাত্র কয়েকটিতে পরাগায়ন করেছিলে মাছি, মথ, প্রজাপতি, বোলতা এবং বিটল ইত্যাদি।

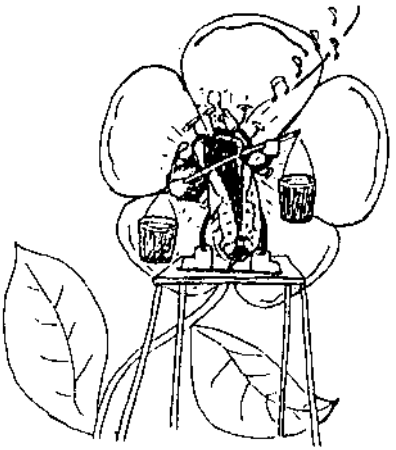

চিত্র ১.৩ : Professor Maeta এই চিত্রটি তাঁর একটি প্রকাশনায় ব্যবহার করেন। তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মৌমাছিরা এভাবেই ফুল থেকে মধু বহন করে তাদের বাসায় নিয়ে যায়

ইদানিংকালে যাঁরা পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা নিয়ে কাজ করেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত কয়েকজন হলেন, Y. Maeta, T. Inoue, M. Kato, P. Macfarlane, J. B. Free, এবং P. F. Torchio। এদের গবেষণাকর্ম এবং দূরদর্শিতার ফলে এ বিষয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে (চিত্র ১.৩)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলেই নয় যে, Professor Tamiji Inoue ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মালয়েশিয়াতে একটি গবেষণা কাজ করতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। তিনি এ বিষয়ে জাপানের শীর্ষস্থানীয় এবং পৃথিবীব্যাপী বিশেষভাবে খ্যাত একজন গবেষক। তাঁর সাথে এই গ্রন্থের লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যাতে অর্কিড একটি আলাদা এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিজ্ঞানী Dressler ১৯৮১ সালে তাঁর এক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে, ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের মধ্যে অর্কিড একটি বড় গোত্রাধীন যাতে প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতি

রয়েছে। বিজ্ঞানী Pijl ও Dodson ১৯৬৬ সালে তাঁদের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে, পরাগায়নের কারণেই সম্ভবত অর্কিডের এত বিশাল বৈচিত্র্য এসেছে।

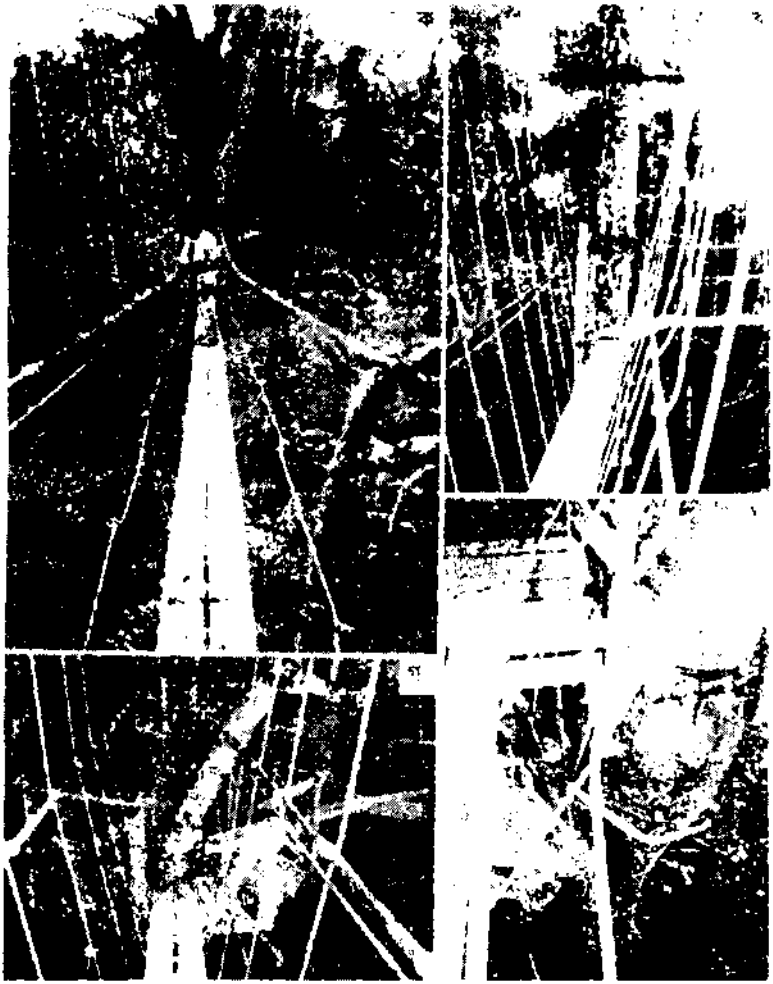

চিত্র ১.৭ : গবেষকগণ যেভাবে উঁচু বৃক্ষের উপর মাচা এবং টাওয়ার করে পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যার কাজ করেন, তার একটি চিত্র

অর্কিডের পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গবেষণা হয়েছে। যাঁরা এ সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন Kipping (1971), Ackerman (1975), Kallunki (1976, 1981), Muller (1873), Darwin (1877), Voth (1992), Gray (1862), Dressler (1990, 1993), Ishikawa (1968), Tanaka

(1990), Nilsson (1979, 1980), Calvo (1990), Judd (1972), Porter (1896), Ivri ও Dafni (1977), Pijl ও Dodson (1966), Nilsson (1978), Brantjes (1980) এবং Pettersson ও Nilsson (1993).

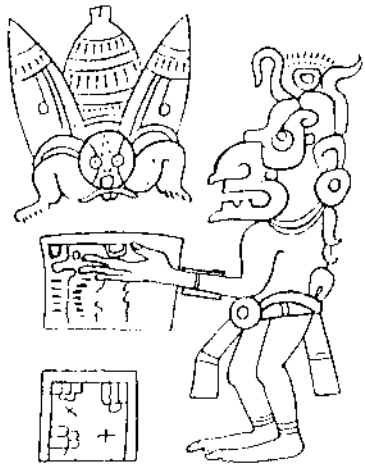

চিত্র ১.৫ : মায়া সময়ের একটি চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। একটি মৌমাছি তার চাকে প্রবেশ করেছে ; Poovey, 1992 (এঁকেছেন Alberto Beltran, Victor W. Hugen–এর "World of the Maya" প্রকাশনায়। আর এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে Beekeeping & Development, 1992 গ্রন্থে)

Linhart (১৯৭৩), Stiles (১৯৭৫) এবং Kress (১৯৮৩) বলেন যে, *Heliconia* নামক কলার পরাগায়ন ঘটাতে হামিং বার্ড খুবই দক্ষ যাদেরকে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পূর্ব মালয়েশিয়াতে। Kress (১৯৮৫) আবার বলেন যে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এ কলাকে এক ধরনের বাদুর পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে (Macroglossinae bats)। এদিকে Itino এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (১৯৯১) বলেন সুমাত্রার দুটি বন্য কলা *Musa acuminata halabanensis* এবং *M. salaccensis* এর পরাগায়ন ঘটায় এক ধরনের নেকটারভোজী বাদুর *(Macroglossus solorinus)* এবং নেকটারভোজী পাখি *(Arachnothera longirostris* এবং *Aethopyga siparaja)*। তাঁরা এসব পলিনেটরদের ধরে সংরক্ষণ করেন এবং শনাক্ত করেন। বিজ্ঞানী Nur ও এই একই কথা বলেন (১৯৭৬)।

বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গই পরাগায়ন করে থাকে। এদের মধ্যে Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, এবং Diptera বর্গের পতঙ্গই অধিক মাত্রায় দেখা যায়। কিছু কিছু থ্রিপস এবং তেলাপোকার পরাগায়ন ক্রিয়া উৎঘাটিত হয়েছে অতি সাম্প্রতিককালে

(Nagamitsu ও Inoue, 1997; Appanah ও Chan, 1981; Proctor ও Yeo, 1972; Perry, 1978; Roth ও Willis, 1960)। Proctor ও Yeo ১৯৭২ সালে বলেন যে, Blattodea ই ষষ্ঠতম বর্গ যা পলিনেটর হিসেবে গণ্য হয়েছে। এ সম্ভাব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেন Nagamitsu ও Inoue ১৯৯৭ সালে। তাঁরা মালয়েশিয়ার সারাওয়াকে *Uvaria elmeri* নামক এক ধরনের কাষ্ঠল লতানো উদ্ভিদে তেলাপোকার পরাগায়নের কথা উল্লেখ করেন। এই ঘটনাকে তেলাপোকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম পরাগায়ন রেকর্ড বলে তারা দাবি করেন। তেলাপোকা এ উদ্ভিদের পুরুষ এবং স্ত্রী ফুলে রাতে ভ্রমণ করে ফুলের নির্যাস (Stigmatic exudate) এবং পরাগ খাওয়ার জন্যে। আর এর ফলে *Uvaria*-তে পরাগায়ন সম্পন্ন হয় (চিত্র ১.৬)।

পলিনেটরের কৃত্রিম উৎপাদন সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন। তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, G. E. Bohart, P. F. Torchio, J. B. Free, Y. Maeta, M. J. Duchateau, এবং H. H. W. Velthuis। Free (1970), Torchio (1987, 1990) এবং McGregor (1976) এরা সকলেই বলেন যে, ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হলে কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটর উৎপাদন তথা পলিনেটরের ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

Torchio ১৯৮৭ সালে বলেন যে, আজ থেকে বহু পূর্বেই বন্য মৌমাছিকে (প্রায় ১০০ বছর পূর্বে) ফসলের জন্য খুবই ভালো পলিনেটর হিসেবে ধারণা করা হয়েছিল। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৪০-এর শেষের দিকে এদের বাণিজ্যিক পলিনেটর হিসেবে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন। সেই থেকে এদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের দিকটা গবেষকদের চিন্তায় আসে।

Heinrich ১৯৭৯ সালে বলেন যে, ভ্রমর শীতপ্রধান দেশে একটি খুবই দক্ষ পলিনেটর। Kenoyer (1916), Kevan (1972), Macior (1974), Bauer (1983) এবং Yumoto (1986) বলেন যে, উত্তর মেরুর দেশগুলোতে পরাগায়নের জন্যে ভ্রমরের উপর অনেক উদ্ভিদকেই নির্ভর করতে হয়। সেখানে ভ্রমরের পরাগায়ন ছাড়া অনেক উদ্ভিদেরই উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়।

J. B. Free (1993) বলেন যে, একমাত্র রেড ক্লোভারের পরাগায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে বৃটেন থেকে ভ্রমর নিউজিল্যান্ডে আমদানি করা হয়। এটি ভ্রমরের সর্বপ্রথম একটি ভিন্ন দেশে নিয়ে ব্যবহারের ঘটনা। এই ঘটনা ভ্রমরের বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছিলো। ইদানিংকালে অনেক দেশেই প্রয়োজনের তাগিদে পলিনেটর আমদানি করা হচ্ছে।

ভ্রমরের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক কাজ হয়েছে যার ফলে বেশ কয়েকটি প্রজাতির ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এঁদের কয়েকজন হলেন— Duchateau (1991), Duchateau ও Velthuis (1988), Doorn ও Heringa (1986), Eijnde *et al.* (1991), Donovan ও Wier (1978), Hobbs *et al.* (1960, 1962), Holm (1965), Hannan *et al.* (1997); Hobbs, (1964); Hasselrot, (1952); Ono *et al.* (1994) এবং Asada ও Ono, (1996)। শুধু তাই নয়, এ ভ্রমরের ব্যবস্থাপনার কাজে আরও অনেকেই এর জীবনবৃত্তান্ত, কৃত্রিম প্রজনন, কৃত্রিম বাসস্থান,

কৃত্রিম অবস্থানে থাকা-খাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর কাজ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন (Hannan *et al.*, 1998; Katayama, 1973, 1975, 1993 ; Duchataeu 1991; Van Doorn 1987; Sakagami ও Katayama 1977 ; Free ও Butler, 1959)।

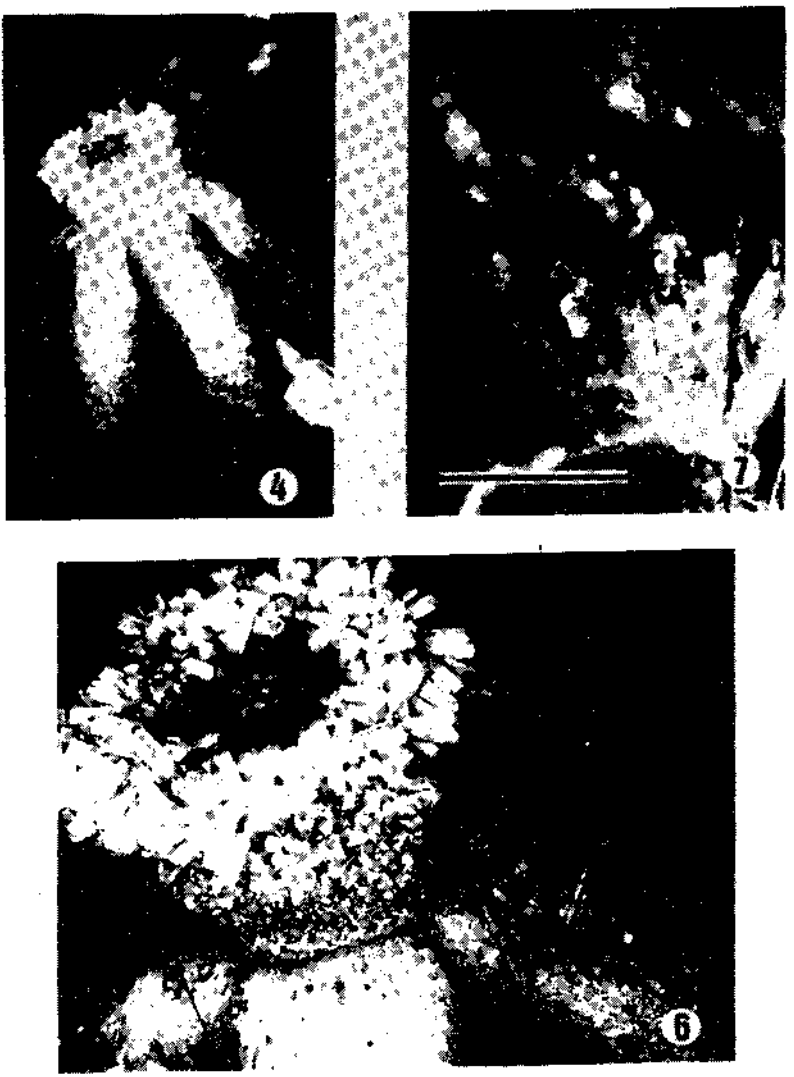

চিত্র ১.৬ : তেলাপোকার পরাগায়নের বিভিন্ন ধাপের ছবি (ক-গ)

ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিগত ৩০ বছরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (কোষবিদ্যা, কৌলিবিজ্ঞান, বিবর্তনবিদ্যা, বাস্তব্যতন্ত্র) উন্নতির ফলে এর সাথে সাথে পরাগায়ন জীববিজ্ঞানের কিছুটা হলেও উন্নতি সাধন হয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এর উপর সবার নজর পড়েছে। একটি বিষয় ভালোভাবে জানা গিয়েছে যে, উদ্ভিদের বীজ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন পলিনেটরের, অন্যদিকে পলিনেটরের প্রয়োজন উদ্ভিদ থেকে পরাগ ও নেকটারের। এখন এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন গবেষণার, যাতে উদ্ভিদ এবং পলিনেটরের সম্পর্ক থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি।

বাংলাদেশে পরাগায়নের ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অতি সাম্প্রতিককালে পরাগায়ন সম্পর্কে দেশের গবেষকগণ চিন্তা করতে শুরু করেছেন, তাও বিশেষ কয়েকটি উদ্ভিদের জন্যে। মৌমাছি পালনের প্রধান উদ্দেশ্য কিছুকাল আগে পর্যন্তও ছিল মধু উৎপাদনের জন্যে, পরাগায়নের জন্যে নয়। তবে ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে যে, সে ধারণা বদলাচ্ছে। এখন কৃষকরা মৌবাক্স রাখছে পরাগায়নের উদ্দেশ্যে, তার সঙ্গে তারা মধু পাচ্ছে অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে।

আমাদের দেশে অতিতে পরাগায়নের জন্যে প্রাকৃতিক পলিনেটরেরই প্রধান ভূমিকা ছিল এবং সেসময় এদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল। যার ফলে বিভিন্ন ফলমূল এবং ফসল প্রাকৃতিক উপায়েই উৎপাদিত হতো। সমস্যা হয়েছে আজ এ কারণে যে, ফসল উৎপাদনের জমির পরিমাণ বেড়েছে, ফসল এবং ফলমূলের বৈচিত্র্য বেড়েছে, এদিকে সে পরিমাণে পলিনেটরের চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু পলিনেটরের সংখ্যা বাড়ে নি। কারণ পরিবেশ বিদূষণ এবং পরিবেশতন্ত্রের অবক্ষয়ের কারণে আমাদের দেশে পলিনেটরের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এ বিষয়টি একটু চিন্তা করলেই সহজে বোঝা যায় মৌমাছি আগে কি পরিমাণ ছিল আর এখন কি পরিমাণ আছে। ফলে এখন সময় এসেছে এদের নিয়ে গবেষণা করার এবং এদের কার্যকারিতা, উপকারিতা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করার, যাতে আমরা আমাদের কাজে এদের ব্যবহার করতে পারি।

কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটর উৎপাদনের প্রথার কথা বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। কারণ এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত এ দেশে গবেষণা হয় নি বলেই জানা গিয়েছে। অথচ এটি একটি অতীব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা কৃষিকে যথাযথ উন্নত করার জন্য একান্তভাবেই প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা পরিবেশ বিদূষণের ফলে পলিনেটরের বাসস্থান এবং খাদ্যের উৎস বিনষ্ট হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এদের বিলুপ্তি ঘটে অথবা এরা অন্যত্র চলে যায়। তাই অতিরিক্ত চাহিদার সময় কৃত্রিম উপায়ে এদের উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু আমাদের দেশে পরাগায়নের উপর তেমন কাজ হয় নি, তাই কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটরের উৎপাদনের কথাটি একেবারেই অপরিচিত রয়ে গেছে। তবে দেশের যথাযথ উন্নয়ন ঘটাতে হলে অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয় নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা

মানুষ যতই বাড়ছে খাদ্যের চাহিদাও সে হারে বাড়ছে। কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ে নি পৃথিবীর চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ। তাই সঙ্গত কারণেই সীমিত স্থানে অধিক ফসল ফলানোর জন্য পৃথিবীব্যাপী নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে উদ্ভব হচ্ছে নানা ধরনের উন্নততর প্রযুক্তি এবং যার উপর নির্ভর করে উন্নত দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত এসব উন্নত প্রযুক্তির কারণে সেসব দেশে আর্থিক উন্নয়নও সহজতর হয়েছে। আমাদের দেশেও কৃষিবিষয়ক উন্নয়ন সম্ভব হলে দেশের আর্থিক উন্নয়ন সহজতর হবে।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি গবেষণার বিষয়, যার সাথে এদেশের পারিবেশিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব – দুটোই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে এখনও তেমন কোনো গবেষণামূলক বা তথ্য সংগ্রহমূলক কাজ হয় নি। উন্নত বিশ্বে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ) বর্তমানে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণামূলক বিভিন্ন কাজ চলছে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা সম্পর্কে একেবারেই নির্বিকার। এর মূল কারণ এই বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। পলিনেটররা কোথায় থাকে, এরা কি কাজ সম্পাদন করে, কিভাবে এদের বংশবৃদ্ধি করা যায় এবং সর্বোপরি একই সাথে কিভাবে ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়গুলো সবারই জানা আবশ্যক। তাই সাধারণ মানুষের কাছে পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যার পরিচিতি তুলে ধরা এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে।

পলিনেটরের খাদ্যের একমাত্র উৎস ফুল। আর এ কথা নিশ্চিত একবার এদেশের সাধারণ মানুষ যদি ফুল চাষের উপকারিতা বুঝতে পারেন, তবে সারা দেশেই ফুল চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যদি এটি বাস্তবে পরিণত হয়, তাহলে একদিকে যেমন দেশের পরিবেশ হবে সুন্দর, অন্যদিকে পলিনেটররাও পাবে তাদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ। পাশাপাশি সংযোজন ঘটবে আর্থিক উন্নতিরও।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যার সংজ্ঞা

পরিবেশ বিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদ এবং পলিনেটর-এর মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকেই পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা (Pollination Ecology) বলে। এ শাখায় প্রকৃতিতে কিভাবে উদ্ভিদ এবং পলিনেটর একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও একে অপরের কাছ থেকে উপকৃত হয় তা নিয়ে গবেষণা করা হয়। কি করে এদের উন্নয়ন করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা নিয়ে কাজ শুরু করা হলে আমাদের পরিবেশের উন্নয়ন, বিশেষ করে আমাদের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হবে।

পলিনেটর গ্রুপ

প্রাণিজগতের কয়েকটি বিশিষ্ট গোত্রের প্রাণী পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে বাদুর, হামিং বার্ড, প্রজাপতি, বিটলস, মৌমাছি ইত্যাদি। প্রকৃতিতে একই পলিনেটর সব ধরনের উদ্ভিদের পরাগায়ন সার্থকভাবে ঘটাতে পারে না (এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। একটি বিশেষ পলিনেটর একটি বিশেষ বৃক্ষ বা উদ্ভিদের সার্থক পরাগায়ন ঘটাতে পারে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রকমের পলিনেটর আছে তার মধ্যে মৌমাছিদের ভূমিকা শস্য পরাগায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির মৌমাছি রয়েছে (Torchio, 1987)। এদের মধ্যে মাত্র ৮ থেকে ১০টি প্রজাতি হচ্ছে সামাজিক মৌমাছি, (social bee) বাকি সবগুলোই হলো স্বতন্ত্র মৌমাছি (solitary bee)। এসব স্বতন্ত্র মৌমাছিকে অমৌমাছি (Non honey bee), নন সোশ্যাল মৌমাছি (non social bee) বা বন্য মৌমাছিও (wild bee) বলা হয়। মূলত পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যাতে এসব অমৌমাছিরা (বন্য মৌমাছিকে অমৌমাছি বলার কারণ এরা সাধারণত মধু ও মোম উৎপাদন বা সঞ্চয় করে না) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পলিনেটরের বাসস্থান

প্রকৃতিতে বন্য মৌমাছিরা কিভাবে বসবাস করে, তা অনেকেরই অজানা, কিন্তু বড় চাকের অস্তিত্ব দেখে বা এক জায়গায় জড় হয়ে থাকতে দেখে সামাজিক মৌমাছিদের অবস্থান খুব সহজেই বোঝা যায় (রঙিন চিত্র ২)। অমৌমাছিদের অবস্থান সহজে বোঝবার কোনো সুযোগ নেই, কারণ এরা সহজে দেখা যায় এমন কোনো জায়গায় সাধারণত বাসা তৈরি করে না। এরা একাকি বা সমষ্টিগতভাবে মাটির গর্ত, নল-খাগড়ার নলের ভিতর, মাটির দেওয়াল, মৃত শামুকের খোলস, বিশুষ্ক ডালের সরু নল, ফেলে রাখা বা পড়ে থাকা কাঠের সরু গর্ত, ইত্যাদি স্থানে বাসা তৈরি করে।

পলিনেটরের খাদ্য

সামাজিক মৌমাছি এবং অমৌমাছিদের খাদ্যের প্রধান উৎসই হচ্ছে ফুলের নেকটার এবং পরাগ। অর্থাৎ ফুল যেখানে নেই, সেখানে এদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আর মূলত এ কারণেই অনেক সময় লোকালয়েও মৌমাছিদের বাসা তৈরি করতে দেখা যায়। কারণ পরিবেশ বিনষ্টের কারণে এখন বন-বাদারেও তেমন গাছপালা ও ফুল নেই, যা আছে তাও দেখা মেলে চাষের জমি বা ফুলের বাগানে। সাম্প্রতিককালে বিদেশি একটি গবেষণা প্রবন্ধে দেখা গেছে যে, মৌমাছিদের সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলেই বেশি। এর মূল কারণ হিসেবে শহরাঞ্চলে ফুলের বাগানের প্রাচুর্য্যের কথা বলা হয়েছে। আর ফুলের প্রাচুর্য্য যেখানে এদের খাবারের প্রাচুর্য্য সেখানেই। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে আগের মতো বনজবৃক্ষ এবং ফুল তেমন নেই, যার ফলে সেখানে এদের খাদ্যের উৎসও নষ্ট হয়ে গেছে।

পলিনেটরের কাজ

কিছু গাছ আছে যেগুলোর ফুল পলিনেট করানো না হলে একেবারেই ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না। যেমন, ডুমুর। আবার কিছু গাছ আছে, যাদের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় যেমন—আপেল, নাশপাতি, আম, জাম, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি। টমেটো এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন—তরমুজ, শশা, আম, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদির চাষ আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত, তাই (পলিনেটর ব্যবহার করা ছাড়া) উৎপাদন হ্রাস পেলে কৃষক এসব ফল চাষ করতে উৎসাহী হবে না। এ কারণেই পৃথিবীর বহু দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের ফল উৎপাদন করতে কৃষকরা পলিনেটরের ব্যবহার করে থাকে।

চিত্র ২.১ : পরাগায়ন করালে ফলন সে বেশি হয় তার একটি চিত্র

জাপানে আম পরাগায়নের জন্যে এক ধরনের মাছি ব্যবহার করা হয়। সে মাছি জন্মানোর জন্যে স্থানীয়ভাবে সেখানের আম চাষীরা আম গাছের নিচে ছোট ছোট পলিথিন ব্যাগ ভরে মাছ রেখে দেয়। মাছিরা সেখানে ডিম পাড়ে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। আমের ফুল ধরতে শুরু হলে বয়স্ক মাছিরা তাতে পরাগায়ন সম্পাদন করে।

বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের কৃষকেরা সাধারণত পলিনেটর ব্যবহার করেন না, কিন্তু ফলন ঠিকই হয়। পলিনেটর ব্যবহার করে এই ফলন অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব, যা উন্নত দেশগুলোতে করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে যেটুকু উৎপন্ন হয় যেমন, বিভিন্ন ফল-মূল, সবজি ইত্যাদি সেগুলোতেও মানুষের অজান্তে বন্য মৌমাছি বা প্রাকৃতিক পলিনেটর পরাগায়ন ঘটায় বলেই হয়।

কোনো টমেটো ক্ষেতে যখন ফুল ফোটে বা যখন খেজুরের ফুল ফোটে তখন কি পরিমাণ মৌমাছি সেখানে আসে, কিংবা অন্য যে-কোনো প্রজাতির ফলের বৃক্ষে মৌমাছির সমাগম দেখলে (রঙিন চিত্র ৩) সহজে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে সামান্য কিছু পলিনেটর আছে বলেই এখনও এসব ফলমূল জন্মাচ্ছে। যদি প্রাকৃতিক এসব পলিনেটরকে বাঁচতে এবং এদের বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ না দেয়া হয় তবে দিনে দিনে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো পলিনেটর যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। সেসব দেশে যেকোনো ফল-মূলের উৎপাদনের জন্যে তারা এদের ব্যবহার করে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিচে উল্লেখিত হলো :

- বন্য ফুল সংরক্ষণ করা ;
- অন্যান্য ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;
- বাসা তৈরির স্থান নষ্ট না করা ;
- কৃত্রিম বাসস্থান সৃষ্টি করা।

এ প্রসঙ্গে জাপানের গবেষকরা প্রকৃতিতে কি করে ফাঁদ পাতা বাসা (trap nest) ব্যবহার করেন (রঙিন চিত্র ৪) সে তথ্য জানা গেছে। ফাঁদ পাতা বাসা তৈরির ফলে প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র মৌমাছির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এটি এদের বংশবৃদ্ধির জন্যে খুবই সহায়ক হয় কেবল তখনই, যখন আমজনতা সখের বশে ফুলের চাষ করেন। জাপানে এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো ফুলের গাছ নেই। এসব ফুলের অনেকগুলো প্রজাতিই মৌমাছিদের সহায়ক খাদ্য সরবরাহকারী উদ্ভিদ হিসেবেও কাজ করে।

আমাদের দেশে আমজনতা তেমনভাবে ফুলের বাগান করেন না, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তো নয়ই। শহরাঞ্চলেও একমাত্র অফিস-আদালতে কিছু ফুলের বাগান দেখা যায়

বা সখ করে কেউ কেউ বাড়িতে ফুলের বাগান করেন। এসব বাগানও অত্যন্ত সিলেকটিভ জাতের কিছু ফুল (যেমন, গোলাপ, জবা, গাদা, রজনিগন্ধা, বেলী, হাসনাহেনা ইত্যাদি) নিয়ে করা হয়। ফুলের ভিতরের সঞ্চিত খাদ্যের পরিমাণ, রঙ, গন্ধ ইত্যাদি মৌমাছিকে আকৃষ্ট করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। আর যেহেতু গোলাপ, জবা, হাসনাহেনা এসব সুন্দর ফুলের সাধারণত ফ্লোরাল রিওয়ার্ড (নেকটার এবং পরাগ) নেই বললেই চলে বা থাকলেও পলিনেটরের পছন্দের নয়, তাই এখানে মৌমাছি আসে না বা আসলেও খুম কম। সেজন্যই ফুলের বাগান করার সময় এমন প্রজাতির ফুল দিয়ে বাগান করা উচিত, যাতে ফ্লোরাল রিওয়ার্ড থাকে। এ ব্যাপারে অদূর ভবিষ্যতে মৌ উদ্ভিদের একটি তালিকা ও বাগানে এসব ফুলের চাষ যাতে সবাই করতে আগ্রহী হয় সেলক্ষ্যে তথ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করা হবে।

পলিনেটর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ

এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই বলতে হয় যে, অধিকাংশ আমজনতাই পলিনেটরের স্বভাব এবং বাসস্থান সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত নন। নিজেদের এই অজ্ঞতার কারণে অনেকেই অজ্ঞাতসারে এ বিশাল রত্নভাণ্ডার (পলিনেটর গ্রুপ এবং বিভিন্ন বন্য উদ্ভিদ) ধ্বংস করে দিচ্ছে দিনে দিনে। মৌমাছির ক্ষেত্রেও একইভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে তাদের কলোনি, আর এটি করা হচ্ছে মৌচাক কেটে মধু এবং মোম সংগ্রহ করতে গিয়ে। মৌয়াল বা সাধারণ লোক যারা মধু সংগ্রহ করে এদের বেশিরভাগই জানেন না কি করে মধু সংগ্রহ করতে হয়। ফলে সামান্য মধু সংগ্রহ করার জন্যও তারা সমস্ত চাকটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে, গাছের কোটরে তৈরি করা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্যে মধু আহরণকারীরা আগুন লাগিয়ে গাছটিকে মেরে ফেলতেও কোনো দ্বিধা করছে না। এতে দেখা যাচ্ছে যে মৌমাছি এবং বৃক্ষ দুটোই ধ্বংস হচ্ছে। বিজ্ঞানী Morse ও Laigo (1869) বলেন যে, প্রতি বছর ফিলিপাইনে আগুন লাগিয়ে মধু সংগ্রহের সময় হাজার হাজার পূর্ণবয়স্ক মৌমাছিকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। বাংলাদেশে নিম্নোক্ত উপায়ে পলিনেটরের বংশবৃদ্ধি হ্রাস করা হচ্ছে বা ধ্বংস করা হচ্ছে তাদের পরিবেশ :

- উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নামে এদের বাসস্থান ধ্বংস করা ;
- বন কেটে আবাদি জমি সৃষ্টি করা ;
- বৃক্ষ নিধন এবং বন্য গাছপালা নিধন করা ;
- কীটনাশক, সার ইত্যাদি ব্যবহার করা।

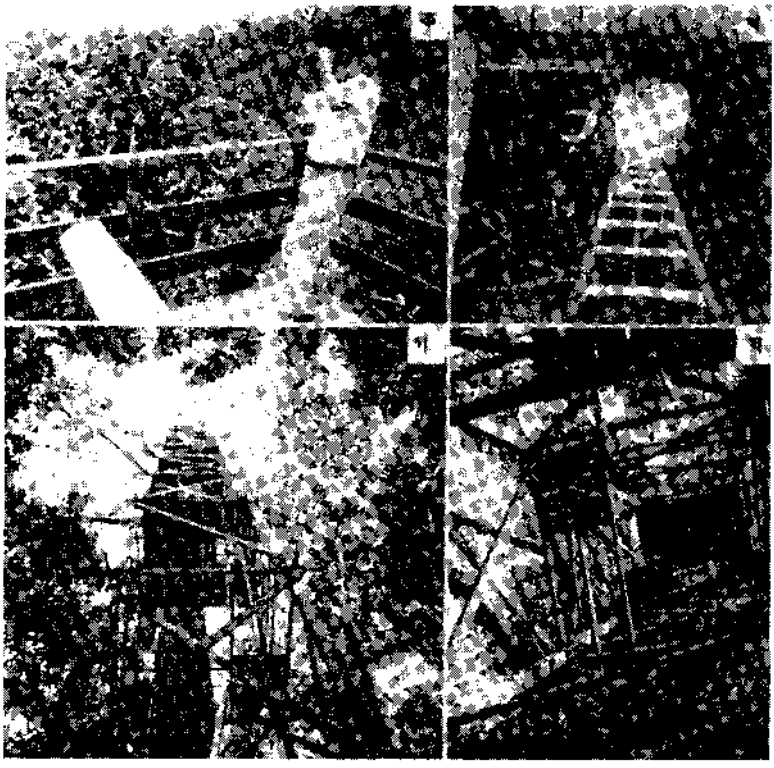

চিত্র ২.২ : মৌমাছি নিয়ে কর্মরত গবেষকগণ মাচা করে মৌমাছির আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন

বিভিন্ন দেশে পলিনেটরের ব্যবহার

উন্নত দেশসমূহে কৃষকরা শুধু প্রাকৃতিক পলিনেটরের উপরই নির্ভরশীল নয় বরং কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন গবেষণাগারে এর উৎপাদন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করছে। আমেরিকা, জাপান, কানাডা, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে যেখানে সাধারণত গ্রিনহাউজে বিভিন্ন রকমের শাকসবজি এবং ফলমূল উৎপাদন করা হয়, সেখানে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পলিনেটরের প্রবেশের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব গ্রিনহাউজে তারা একমাত্র কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত পলিনেটরের উপর নির্ভরশীল।

জাপানে ফল ও বিভিন্ন ধরনের শাক–সবজি উৎপাদনকারীরা গ্রিনহাউজে টমেটো চাষের জন্য ভ্রমর ব্যবহার করে এবং স্ট্রবেরি, আপেল, নাশপাতি, প্রভৃতির জন্যে মেশন মৌমাছি ব্যবহার করে থাকে (চিত্র ২.৩)। আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্যি যে, এদের সংযোজন

ছাড়া সেখানে এসব ফল মূলের বিপুল পরিমাণ উৎপাদন একেবারেই অসম্ভব। একইভাবে বিভিন্ন ধরনের পলিনেটরের (মৌমাছি, অমৌমাছি) উপর গ্রিনহাউজ শস্যের জন্য আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ একান্তভাবে নির্ভরশীল।

আমেরিকাতে গো খাদ্য যেমন রেড ক্লোভার এর জমি এতো বড় যে সেটা গ্রিনহাউজে চাষ করা সম্ভব নয়। তাই কৃষকরা খোলা জমিতে চাষ করে এবং পরাগায়ন করানোর জন্য সেসব জমির বিভিন্ন স্থানে পলিনেটরের কলোনি রেখে দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে শস্যের চাষের জন্যও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রেড ক্লোভারের বীজ উৎপাদনের জন্য পরাগায়নের প্রয়োজনে সর্বপ্রথম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পলিনেটর আমদানি করা হয়। সে সময় নিউজিল্যান্ড ও বৃটেন থেকে ভ্রমরের কলোনি আমদানি করে।

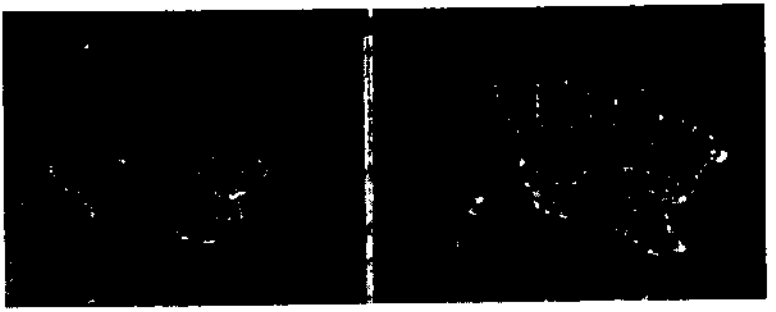

চিত্র ২.৮: ভ্রমরের কর্মী বিভিন্ন ফুলে পরাগায়ন করছে। ক. ... ফুল খ. সূর্যমুখী ফুল, গ. টমেটোর ফুল

এশিয়া মহাদেশে বিশেষ করে এই উপমহাদেশে প্রায় ৬০% তেলবীজ (সরিষা) উৎপাদিত হয়। ট্রপিক্যাল এশিয়ান দেশগুলোতেই এর উৎপাদন সমগ্র উৎপাদনের প্রায় ৬৪%। সরিষা জাতীয় বীজের প্রধান উৎপাদনকারী দেশগুলো হলো চীন, ভারত এবং বাংলাদেশ। এছাড়া ইথিওপিয়া, কলাম্বিয়া এবং ব্রাজিলেও অল্প পরিমাণে এগুলো উৎপাদিত হয়ে থাকে। আর এই সরিষা উৎপাদনকারী দেশগুলোতে যেমন– বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তান, তাইওয়ান, জাপান এবং আর্জেন্টিনাতে সরিষার ফুল হলো নেকটার আহরণের জন্যে মৌমাছিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং ভারতে তেলবীজের প্রধান পলিনেটর হলো সামাজিক মৌমাছি এবং কিছু প্রজাতির বন্য মৌমাছি।

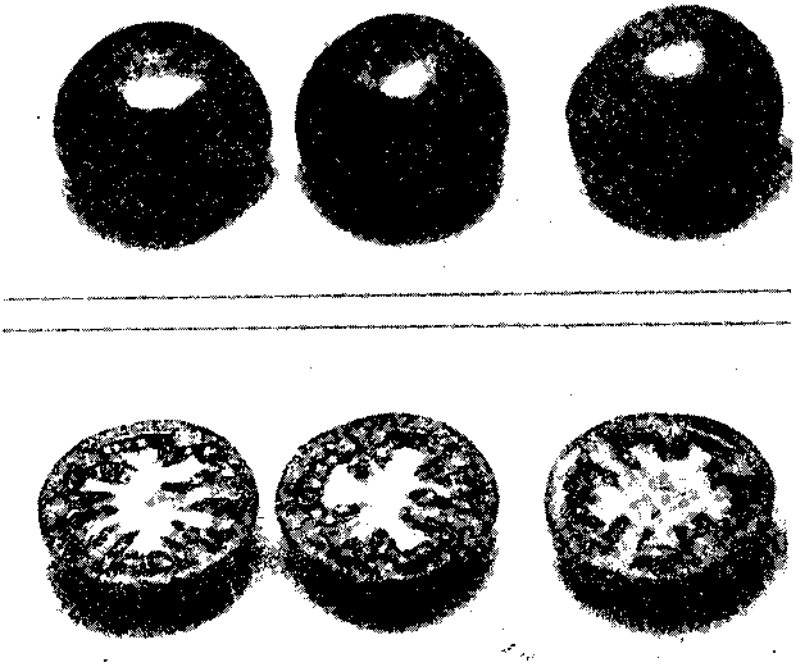

চিত্র ২.৪ : ভ্রমরের পরাগায়ন করা টমেটো এবং হরমোন দিয়ে পরাগায়ন করা টমেটোর তুলনা করা হয়েছে এ চিত্রে

শালগমজাতীয় উদ্ভিদ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পলিনেটর সাহায্য ছাড়া এদের বীজ উৎপাদন খুবই কম পরিমাণে হয়। কাশ্মীরে অ্যালমন্ডের সফল বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য সামাজিক মৌমাছি এবং বড় ছুতার মৌমাছি (large carpenter bee) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। এরা ২০— ৪০% ফুলের বীজ উৎপাদন করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে স্পেনে একটি স্বতন্ত্র মৌমাছি (solitary bee) ৬০—৮০% ফুলের পরাগ সংগ্রহ করে প্রচুর পরিমাণ অ্যালমন্ড উৎপাদনে সহায়তা করে।

থাইল্যান্ডে বিভিন্ন প্রজাতির সামাজিক মৌমাছি এবং হুলবিহীন মৌমাছি কুলজাতীয় ফুলের পরাগায়ন করে। বাংলাদেশ এবং ভারতে পেঁয়াজের পরাগায়ন সাধারণত মৌমাছিরাই করে থাকে। পরাগায়ন ছাড়া এর বীজ উৎপাদন অনেকাংশে কম হয়, যা বাণিজ্যিকভাবে তেমন লাভজনক নয়।

টমেটো একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। আমাদের দেশ ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশেই এর চাষ হয়ে থাকে, যেমন– ভারত, জাপান, হল্যান্ড, চীন, মিশর, মেক্সিকো, ইত্যাদি। এসব দেশের কোথাও পলিনেটরের সাহায্য ছাড়া সাধারণত টমেটো উৎপন্ন হয় না। পলিনেটরের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় গ্রিনহাউজে এর চাষ করলে, সেখানে পলিনেটর ছাড়া বা কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন করা ছাড়া টমেটো ফলানো সম্ভব নয়। তাই এর বাণিজ্যিক লাভের জন্যে পলিনেটরের ব্যবহার করা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

Solanaceae গোত্রের সবজি যেমন– টমেটো, বেগুন, তামাক, আলু ইত্যাদির পরাগায়নের জন্যে কয়েকটি প্রজাতির স্বতন্ত্র মৌমাছির এবং ভ্রমরের জুড়ি নেই। গ্রিনহাউজে টমেটো উৎপাদনের জন্য ভ্রমরের কলোনি এখন অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমরের পরাগায়ন বা কৃত্রিম পরাগায়ন ছাড়া টমেটো চাষীদের বাণিজ্যিকভাবে লোকসানে পড়তে হয়, বিশেষ করে যারা গ্রিনহাউজে টমেটো চাষ করেন। টমেটোর ফলন সবচেয়ে বেশি হয় (প্রায় এক তৃতীয়াংশ) এশিয়ার কয়েকটি দেশে। এছাড়া মিশর, মেক্সিকো এবং ব্রাজিলেও এটি সামান্য পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

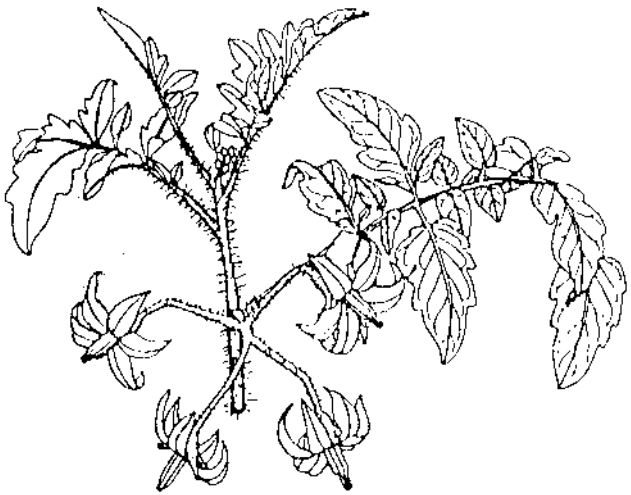

চিত্র ২.৫ : টমেটো ফুল থেকে অনেক প্রজাতির বন্য মৌমাছি সংগ্রহ করা হয়েছে বিশেষ করে *Pithitis* spp. থেকে

টোঙ্গা এবং ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ায় প্রতি বছর প্রায় ৩,০০০ টন তরমুজ উৎপন্ন হয়। তরমুজের এ অধিক উৎপাদনের লক্ষে পরাগায়ন করার জন্য সেখানের কৃষকরা বিদেশ থেকে মৌমাছির কলোনি আমদানি করে। এছাড়া টুভালু দ্বীপে এ মৌমাছি আমদানি করার ফলে শশা, তরমুজ এবং অন্যান্য শস্যের আর হস্ত-পরাগায়ন (hand pollination) করার প্রয়োজন হয় না।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাণিজ্যিকভাবে সূর্যমুখী উৎপাদন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে জালের ভেতরে পরাগায়ন ছাড়া ৪৫% বীজ উৎপাদিত হয়েছে; যেখানে জালের বাইরে খোলা জায়গা হয়েছে ৭৩.৫%। আবার জালের ভিতরে মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন করানোর ফলে ৭২% বীজ উৎপাদিত হয়েছে। এর অর্থই হচ্ছে সূর্যমুখীর বীজ উৎপাদন করার জন্য পলিনেটর একান্তভাবেই প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পলিনেটরের ব্যবহার

আমাদের দেশে কৃত্রিম পলিনেটরের ব্যবহার নেই বললেই চলে। যা আছে সেও শুধু সামাজিক মৌমাছিতেই সীমাবদ্ধ। সাধারণত প্রাকৃতিক পলিনেটররাই আমাদের দেশের বিভিন্ন ফলমূল, লতা, বৃক্ষের পরাগায়নের একমাত্র মাধ্যম। এখনো আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক পলিনেটর রয়েছে, যা পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণে দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। যদি এ ধরনের অবক্ষয় রোধ না করা যায়, তবে ভবিষ্যতে হয়তো এদের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় আমাদের দেশে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পলিনেটররা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে :

- বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ এবং ডাল-এর পরাগায়ন করতে;
- বিভিন্ন প্রকার সবজি, যেমন ঢেড়শ, বেগুন, টমেটো ইত্যাদির পরাগায়ন করতে;
- প্রায় সব প্রকার ফলমূলের পরাগায়ন করতে;
- বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ-লতা এবং গুল্মের পরাগায়ন করতে।

এসব উদ্ভিদের সবগুলোতেই প্রাকৃতিক পলিনেটররাই পরাগায়নের কাজ সম্পাদন করে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত পলিনেটরের ব্যবহার এখনো আমাদের দেশে অপরিচিত একটি বিষয়। আর যখন আমাদের কৃষি আরও অনেক উন্নত হবে সে সময় হয়তো কৃত্রিম উপায়ে এদের উৎপাদনের চিন্তা শুরু হবে। অতএব এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন এবং করণীয় হলো প্রাকৃতিক পলিনেটর রক্ষা করা এবং লালন করা।

বর্তমান অবস্থা উন্নয়নে করণীয় বিষয়

আমাদের দেশের পলিনেটর রক্ষা করতে হলে এখনই জরুরি ভিত্তিতে যা করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে এদের বাসস্থান এবং বনজ খাদ্যের উৎসকে সংরক্ষণ করা। আর তা খুব সহজেই করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এজন্য শুধু গণ সচেতনতা গড়ে তোলাই যথেষ্ট। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা

হয়েছে যে, মানুষ না জেনেই পলিনেটরদের বাসা এবং খাদ্যের উৎসগুলোকে বিনষ্ট করছে। অবশ্য এটি মূলত মানুষের অজ্ঞতার কারণেই ঘটছে। পলিনেটর সম্পর্কে আমজনতার প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলে হয়তো কেউ-ই এদের ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করতো না।

এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে সবার মনেই প্রয়োজনীয় সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে এদের খাদ্যের উৎস বাড়াতে হবে। সেটা বিভিন্নভাবে করা সম্ভব, যেমন সরকারি এবং বেসরকারি – দু'ভাবেই। বাসস্থান বা অফিস-আদালতের আশে-পাশে কিছু না কিছু বাগান সৃজন করা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সুন্দর হবে অন্যদিকে আসবে প্রচুর পলিনেটর। এমনিভাবেই এদের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে।

উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং এর ব্যবহার আমাদের দেশের কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষভাবে দরকার। এর গবেষণা থেকে নিম্নরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে :

- ❑ এদেশে পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে, এরা শস্য ক্ষেতে পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করবে এবং ফসলের মান ও উৎপাদন বাড়বে ;
- ❑ এদের স্বার্থে বন্য গাছ-পালা তথা ফুল উৎপাদনকারী বৃক্ষ নিধন থেকে বিরত থাকলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ তার প্রাকৃতিক রূপ ফিরে পাবে ;
- ❑ পরাগায়নের ফলে বীজ উৎপাদিত হয় বলে প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভিদ বংশবিস্তার করতে পারবে এবং দেশের কাঙ্ক্ষিত বনজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ;
- ❑ এদেশের অনেক লতা-গুল্ম আছে যা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পলিনেটরের পরাগায়ন ক্রিয়ার ফলে এদের উৎপাদন বাড়বে যা পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ক্রস পরাগায়ন (cross pollination) হচ্ছে ভালো বীজ উৎপাদনের অন্যতম পূর্বশর্ত। যে কোনো ফসলের জন্যই হোক এই ক্রস পরাগায়ন করাতে হলে পলিনেটর আবশ্যক। তাই বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রস পরাগায়নের উদ্দেশ্যে মৌমাছি ব্যবহার করে থাকে।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশই পরাগায়নের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। আর সেজন্যেই সেসব দেশে পলিনেটরের ব্যবহার করে বেশি বেশি এবং উন্নতমানের ফসল ফলানো হচ্ছে (রঙিন চিত্র ৬)। পরাগায়ন পদ্ধতি ব্যবহারে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তা নিচে উল্লেখিত হলো :

- ❑ ক্রস পরাগায়নের মাধ্যমে বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করা যায় ;
- ❑ ভালো ফল উৎপাদন করা যায় ;

- সুস্বাদু ফল উৎপাদন করা যায় ;
- উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা যায় ;
- অধিক ফলন হয় ;
- অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

শুধু তাই নয়, অনেক দেশেই একটি নতুন ধরনের অর্থ উপার্জনের পথ সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো পলিনেটরের কলোনি ভাড়া দেওয়া। অনেক মৌমাছি পালক আছেন যারা মৌমাছির কলোনি তৈরি করেন ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যেগুলো আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফল বা সবজির পরাগায়নের জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ভাড়া থেকে যে আয় হয় তাদের হিসাব মতে তা মধু বা মোম তৈরির আয় থেকে অনেক বেশি। তাই এসব মৌ পালকেরা মৌচাক ভাড়া দিয়ে থাকেন। শুধু মৌমাছি-ই নয়, বিভিন্ন শস্যের পরাগায়ন করার জন্য অন্যান্য পলিনেটরের ও সেখানে ভাড়া দেয়া বা বিক্রি করা হয়।

এটা সাধারণভাবে বলা খুবই কঠিন যে, পলিনেটর অর্থনৈতিকভাবে কি পরিমাণ সাহায্য করে থাকে। কারণ এ সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে (বিশেষত আমাদের দেশে)। তবে একটি বিষয়ে গবেষকরা একমত যে, মৌমাছির পরাগায়ন মূল্য, এর মধু, মোম এবং অন্য যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

McGregor (১৯৭৬) সালে তাঁর এক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালে আমেরিকাতে ১.৫ বিলিয়ন ডলার (US) মূল্যের শস্য উৎপাদন হয়। Levin (1983) সালে বলেন পরবর্তীতে এটি বেড়ে হয়েছিল ১৮.৯ বিলিয়ন ডলার (US)। এসব শস্য মৌমাছির সাহায্যে পরাগায়ন করা হয়েছিল। শস্যের মধ্যে ছিল সবজি, বীজ ইত্যাদি এবং এর উপর নির্ভরশীল অন্যান্য বিষয়। Winston ও Scott (1984) বলেন, মৌমাছির পরাগায়নের ফলে উৎপাদিত শস্যের মূল্যের পরিমাণ কানাডাতে হয়েছিল ১.২ বিলিয়ন ডলার (US)। এদিকে নিউজিলান্ডে মৌমাছির পরাগায়নের ফলে উৎপাদিত শস্য থেকে আয় হয়েছিল ১২৫৩ মিলিয়ন ডলার (Matheson ও Schrader, 1987)। এখানে তারা একটি আশ্চর্যজনক তথ্য প্রদান করেন যে, শুধু পরাগায়ন ক্রিয়াই নয় সেখানে নাইট্রোজেনাস উদ্ভিদ (nitrogen fixing plants) চাষ করার ফলে জমি যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পেয়েছিল সে পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগ করলে খরচ হতো ১৭৪৬ মিলিয়ন ডলার। Robinson *et. al* (1989) বলেন শস্যের অতিরিক্ত ফলন হয়েছিল পরাগায়নের কারণে এবং ৩০ বিলিয়ন ডলারের (US) শস্যের মধ্যে ৯.৩ বিলিয়ন ডলার (US) মূল্যের (৩১%) শস্য উৎপাদিত হয়েছিল মৌমাছির পরাগায়নের কারণে।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব গবেষকরাই বলেছেন মৌমাছির পরাগায়নের জন্যে যে খরচ হয় (বাক্স ভাড়া বা কেনা বাবদ) সে খরচ বাদ দিয়েই এ লাভ গণনা করা হয়। তাই উন্নত দেশগুলোতে ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্যে শস্যের পরাগায়ন করানো একটি অতি জরুরি কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে এ কথা বিশেষভাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশে এ বিষয়ে অনতিবিলম্বে গবেষণা শুরু করা প্রয়োজন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে পলিনেটরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে এবং সঙ্গত কারণেই প্রয়োজনে হয়তো বিদেশ থেকে এদের আমদানি করা প্রয়োজন হতে পারে। বহু দেশই তাদের কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির পলিনেটর এবং বনজ উদ্ভিদ রয়েছে, যেগুলো সবই আমাদের কৃষির উন্নয়নে প্রয়োজন। এদের যদি রক্ষা করা না যায়, তাহলে আমাদের এ প্রাকৃতিক রত্নভাণ্ডার বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ তৎসঙ্গে কৃষি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরাও। তাই এখনই আমাদের এ বিষয় নিয়ে চিন্তা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময়।

আমাদের দেশে যেহেতু গ্রিনহাউজ কৃষি এখনো শুরু হয় নি, তাই কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটর উৎপাদনের প্রয়োজন এখনো জরুরি নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক পলিনেটরের উপস্থিতি অতি জরুরি। আমাদের ফল-মূলের জন্য কৃত্রিম পলিনেটর ব্যবহার না করলেও ফল-মূল উৎপাদন হচ্ছে। এর কারণ হলো প্রকৃতিতে অবস্থানকারী বিভিন্ন পলিনেটর আমাদের অজান্তেই এ বৃহৎ কর্মটি করে যাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মৌমাছির পরাগায়ন

বিশ্ব জুড়ে সবার কাছেই মৌমাছি খুব ভালোভাবেই পরিচিত। মৌমাছি নিয়ে বিশ্বের নানা দেশে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে মৌমাছির জীবনবৃত্তান্ত, স্বভাব এবং আচরণ ইত্যাদি অত্যন্ত ভালোভাবে জানা গেছে। মূলত এসব গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মানুষ এদের নিজেদের ইচ্ছেমতো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারছে। মৌমাছির উৎপাদিত অনেক পদার্থই (যেমন—মধু, মোম, প্রোপলিস ইত্যাদি) মানুষের কাছে মূল্যবান হলেও মানব সভ্যতায় মৌমাছিদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো এদের সাহায্যে সংগঠিত পরাগায়ন ক্রিয়া, যা মানুষের জন্যে আর্থিকভাবে অনেক বেশি লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে (সারণি ৩.১)।

পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় শুধু সামাজিক মৌমাছিই নয়, অন্যান্য মৌমাছিও (যেমন, স্বতন্ত্র মৌমাছি এবং বন্য মৌমাছি) সমভাবে অংশগ্রহণ করে (রঙিন চিত্র ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২)। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশবিরোধী কার্যকলাপের দরুণ বর্তমানে এদের সংখ্যা বহুলাংশে কমে গিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিবেশ থেকে বা কোনো কোনো স্থান থেকে এরা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে মারাত্মক ধরনের পরিবেশ দূষণের কারণে এর অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ রূপ ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিতে বন্য মৌমাছিদের দিয়ে পরাগায়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর তাই এসব পরাগায়ন ক্রিয়ার জন্যে সামাজিক মৌমাছিই হলো একমাত্র ভরসা। অবশ্য সামাজিক মৌমাছিদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিশেষজ্ঞদের মোটামুটি জানা থাকায় এবং এদের সাহায্যে পরাগায়ন কাজ পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়ায় এদের প্রতি মানুষের ভরসা এতো বেশি।

সামাজিক মৌমাছিদের মধ্যে *Apis mellifera* এবং *A. cerana*-ই পরাগায়নের কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে, এই দুটি মৌমাছির প্রায় ৮টি প্রজাতি এবং ৩০টিরও বেশি জাত এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। উপরের দুটি প্রজাতি নিম্নোক্ত কারণে পরাগায়নে ব্যবহার করা যায় :

১. এদের বাক্সে রাখা যায় এবং ব্যবস্থাপনার তেমন প্রয়োজন হয় না ;

২. প্রয়োজনে প্রচুর উৎপাদন করা যায় ;

৩. বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে পরাগায়ন করতে সক্ষম ;

৪. ফুলের নেকটার আহোরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে;

৫. আকর্ষক (attractant) বা বিতারক (repellent) দিয়ে এদের ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

সারণি ৩.১ শিংমুখো মৌমাছি (*Osmia cornifrons*) এবং ইউরোপীয় মৌমাছি (*A. mellifera*)-এর পরাগায়ন ক্ষমতার তুলনামূলক চিত্র (Macta, 1990)।

বিষয়	শিংমুখো মৌমাছি	ইউরোপীয় মৌমাছি
১. প্রতি মিনিটে ভ্রমণকৃত ফুলের সংখ্যা	১৫টি	৯টি
২. প্রতিবার ভ্রমণের সময়	৬ মিনিট	–
৩. প্রতিবার ভ্রমণকৃত ফুলের সংখ্যা	৯০টি	–
৪. প্রতিবার শূককীট / মূককীট প্রকোষ্ঠের জন্যে ভ্রমণ সংখ্যা	১৮ বার	–
৫. প্রতিদিন ব্রুড সেল তৈরির সংখ্যা	২৫টি	–
৬. প্রতিদিন ভ্রমণের সংখ্যা	৪৫ বার	–
৭. প্রতিদিন মোট ফুলে ভ্রমণের সংখ্যা	৪,০৫০টি	৭২০টি
৮. গর্ভমুণ্ড (stigma) স্পর্শ করা ফুলের অনুপাত	১০০%	২০৬%
৯. গর্ভমুণ্ড স্পর্শ করা মোট ফুলের সংখ্যা	৪,০৫০ টি	১৪৮টি
১০. ভালো ফল উৎপাদনের জন্যে ফুলে ভ্রমণের সংখ্যা	একবার	দুইবার
১১. ভ্রমণের ফলে ফল উৎপাদনের হার	৬০.৫%	৪০.৫%
১২. প্রতিদিন ভালো ফল উৎপাদনের সংখ্যা	২,৪৫০টি	৩০টি

• Free, 1970 থেকে উদ্ধৃত।

মৌমাছির ব্যবস্থাপনা

শস্য পরাগায়নের জন্যে মৌমাছির ব্যবস্থাপনা উন্নত দেশে নতুন কিছু নয়, বরং আজকাল মধু উৎপাদনের চেয়ে এ কাজেই এদের বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে এখনো এটি ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে না পৌছালেও কোনো কোনো স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একাজে বিশেষ করে *A. mellifera* এবং *A. cerana* এর ব্যবহারই বেশি হচ্ছে। এদের ব্যবস্থাপনা করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন :

চিত্র ৩.১ : *Apis florea* –এর একটি চাকের চিত্র

১. কলোনিতে নিষিক্ত (mated) নতুন রানি থাকা প্রয়োজন ;
২. প্রচুর পরিমাণে লার্ভা এবং পিউপা (brood cell) থাকা ;
৩. প্রচুর পরিমাণে খাদ্য মজুদ থাকা ;
৪. ফুলের অভাব হলে চিনির সিরাপ প্রয়োজনে পরাগ এদের বাক্সে সরবরাহ করা ;

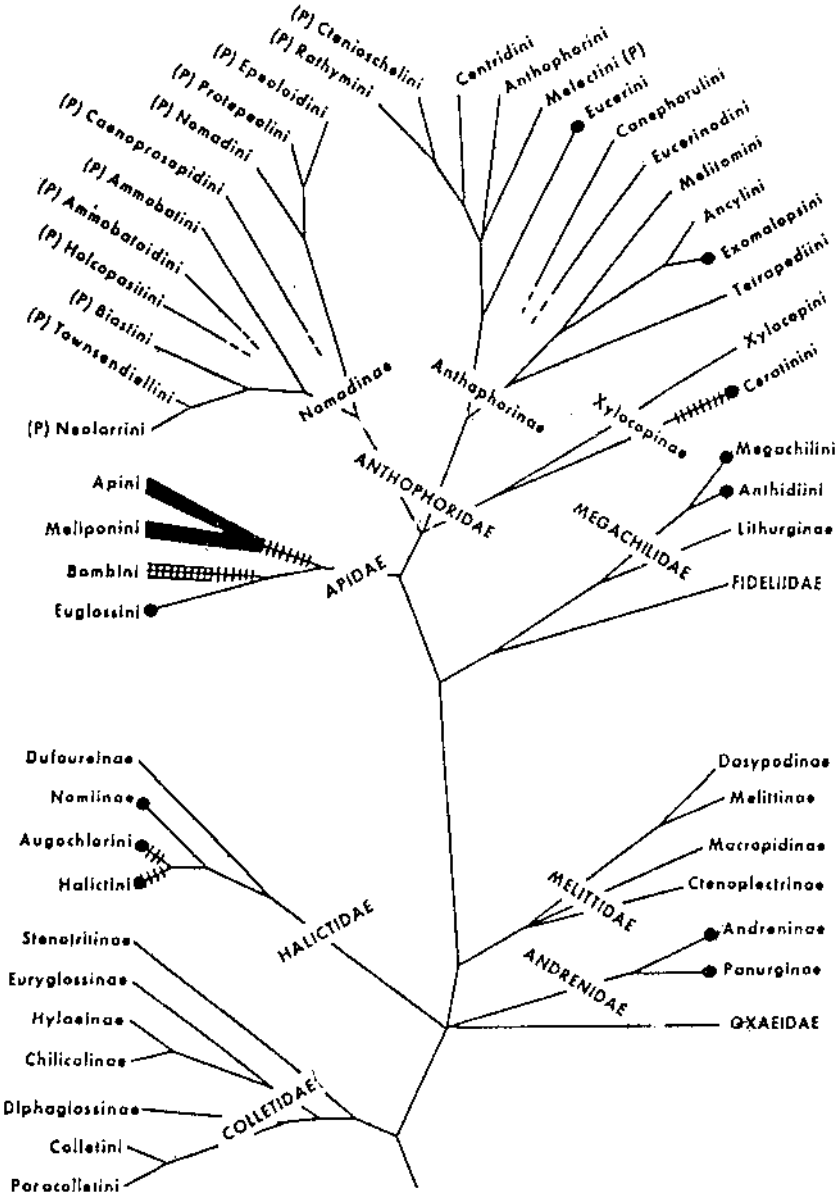
(P) Ctenioschelini
(P) Rathymini
(P) Epeoloidini
(P) Protepeolini
(P) Nomadini
(P) Caenoprosopidini
(P) Ammobatini
(P) Ammobatoidini
(P) Holcopasitini
(P) Biastini
(P) Townsendiellini
(P) Neolarrini
Nomadinae
Centridini
Anthophorini
Melectini (P)
Eucerini
Canephorulini
Eucerinodini
Melitomini
Ancylini
Exomalopsini
Tetrapediini
Xylocopini
Ceratinini
Anthophorinae
Xylocopinae
ANTHOPHORIDAE
Apini
Meliponini
Bombini
Euglossini
APIDAE
Megachilini
Anthidiini
Lithurginae
MEGACHILIDAE
FIDELIIDAE
Dufoureinae
Nomiinae
Augochlorini
Halictini
HALICTIDAE
Dasypodinae
Melittinae
Macropidinae
Ctenoplectrinae
MELITTIDAE
Andreninae
Panurginae
ANDRENIDAE
OXAEIDAE
Stenotritinae
Euryglossinae
Hylaeinae
Chilicolinae
Diphaglossinae
Colletini
Paracolletini
COLLETIDAE

৫. রোগ এবং অন্যান্য বালাই যাতে আক্রমণ না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা ;

৬. প্রয়োজনের সময় যাতে প্রচুর উৎপাদন করা যায় তার ব্যবস্থা রাখা।

মৌমাছির ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো রোগ–বালাই। সার্থকভাবে এর প্রতিকার করতে পারলে মৌমাছির ব্যবস্থাপনা সহজেই করা সম্ভব। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে এখনও বিপুল পরিমাণে মৌ চাষ হয় না বলে এর নানারকম অসুবিধার কথা তেমনভাবে শোনা যায় না। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মৌমাছির চাষ শুরু করার পূর্বে অবশ্যই মৌ চাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিপূর্ণ গবেষণার সুযোগ রাখা উচিত, নতুবা লোকসানের ঝুঁকি থেকে যাবে।

পরাগায়ন প্রক্রিয়া

সার্থক পরাগায়নের জন্য প্রতিটি ফুলে মৌমাছিদের ভ্রমণ আবশ্যক। গবেষণায় দেখা গেছে, *A. mellifera* এক মিনিটে প্রায় ৬টি ফুল ভ্রমণ করতে পারে, আর একটি *Brassica juncea* উদ্ভিদে প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০ মিলিয়ন ফুল থাকতে পারে এবং এ পরিমাণ ফুল পরাগায়নের জন্যে কি পরিমাণ মৌমাছির প্রয়োজন সেটা হিসাব করে কলোনি রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় কলোনির সংখ্যা, সময় এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১০–ফ্রেমের একটি কলোনিতে *(A. cerana)* সর্বোচ্চ ১০,০০০ মৌমাছি থাকতে পারে এবং এতে ৮০০ থেকে ১০০০ ভ্রমণকারী (forager) থাকে। *A. cerana* পরাগায়নের দিক থেকে *A. mellifera* এর চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ (FAO Bulletin, 1995)। তবে সময়, কাল, স্থান এবং কিভাবে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরও এদের পরাগায়নের কার্যকারিতা নির্ভর করে। একটি জমিতে যখন প্রায় ২৫% ফুল ফোটে সে সময়ে কলোনি সেখানে আনা উচিত। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, মৌমাছি উদ্দিষ্ট জমিতে না গিয়ে অন্যত্র চলে যায় পরাগ/নেকটার সংগ্রহ করতে। সেক্ষেত্রে সেরকম কিছু যাতে না ঘটে সেজন্য তাদের ব্যবস্থাপনার ধরন নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত কারণে, *A. cerana*, *A. mellifera*–এর চেয়ে পরাগায়ন করানোর জন্য ভালো :

১. *A. cerana*–এর কলোনি *A. mellifera* –এর চেয়ে ছোট ;

২. *A. cerana* –এর ভ্রমণের দূরত্ব কম ফলে এরা উদ্দিষ্ট শস্যেই বেশি থাকে ;

চিত্র ৩.২ : মৌমাছির বিভিন্ন গ্রুপের সম্পর্ক দেখানোর জন্য এ ডেন্ড্রোগ্রামটি প্রণীত হয়েছে। ডেন্ড্রোগ্রামে ডট দিয়ে যে লাইনগুলো শেষ হয়েছে, এদের কোনো কোনো প্রজাতি প্যারাসোস্যাল কলোনি তৈরি করে। ক্রস দাগওয়ালা লাইনের প্রজাতি প্রিমিটিভলি ইউসোস্যাল কলোনি তৈরি করে। ক্রস দাগওয়ালা লাইনের পাশে যখন আরও দুটি দাগ থাকে এরা ননপ্যারাসাইটিক প্রিমিটিভলি ইউসোস্যাল মৌমাছি। মোটা দাগওয়ালা লাইনের প্রজাতি হলো হাইলি ইউসোস্যাল মৌমাছি ; Michener, 1974 (মূল চিত্র : Barry Siler এবং C.D. Michener)

৩. *A. cerana*–এর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা বেশি (*Vespa*) ;

৪. এদের ভ্রমণ ক্ষমতা *A. mellifera* –এর চেয়ে বেশি।

সৌভাগ্যবশত *A. cerana* আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এরা পরাগায়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। মূলত এরা এখনও আমাদের দেশসহ অন্যান্য অনেক দেশে মধু তৈরির উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বতন্ত্র মৌমাছির পরাগায়ন

স্বতন্ত্র মৌমাছিদের ইংরেজিতে বলা হয় Solitary bee। এরা একাকি ও স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে পছন্দ করে। প্রতিটি স্ত্রী মৌমাছি নিজেদের বাসা নিজেরাই তৈরি করে, খাদ্য মজুত করে এবং সেখানে ডিম পাড়ে। এতে সেখানে অন্য কোনো অংশীদার থাকে না এবং সন্তানদের সঙ্গেও সাধারণত মায়ের দেখা হয় না। মা মৌমাছি বাসায় প্রচুর খাদ্য জমা করে রাখে, ফলে লার্ভার বেড়ে ওঠার জন্য এই জমানো খাবারই যথেষ্ট। সাধারণত ডিম পাড়ার পরে মা মৌমাছিটি বাসার সেলটি বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। সচরাচর সন্তান জন্মের পূর্বেই মা মৌমাছি মারা যায়। ফলে মা ও সন্তানের মধ্যে কখনোই দেখা হয় না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। বেশিরভাগ স্বতন্ত্র মৌমাছিরই কেবল একটি জেনারেশন থাকে, তবে কিছু আছে যাদের বছরে দুটি জেনারেশন থাকতে পারে (Michener, 1974)।

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে ৩০,০০০ প্রজাতির মৌমাছি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার বেশিরভাগই হলো স্বতন্ত্র ধরনের মৌমাছি (Torchio, 1987)। এদের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশেও অনেক প্রজাতির স্বতন্ত্র মৌমাছি রয়েছে, যার একটি তালিকা (inventory) এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। Alam (1967), Bhuiya ও Miah (1990) এবং Tadauchi ও Alam (1993) এদের একটি তালিকা প্রদান করেন যাতে প্রায় ৬৫ প্রকারের স্বতন্ত্র মৌমাছি রয়েছে। আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যায় এমন কয়েকটি হলো: *Xylocopa, Megachile, Nomada, Nomia, Andrena, Pithitis, Sphecodes, Lasioglossum,* ইত্যাদি।

এরা মাটিতে বা মাটির উপরে বিভিন্ন গাছের ডালে, বাঁশ, নলখাগড়া ইত্যাদির ভিতরে বাসা তৈরি করে। মাটিতে বাসা তৈরির ক্ষেত্রে এরা উঁচু জায়গাই বেশি পছন্দ করে, জলাভূমিতে সাধারণত এদের বাসা তৈরি করতে দেখা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে স্বতন্ত্র মৌমাছিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিনেটর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি বড় সমস্যা হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের সংখ্যা খুব বেশি বাড়ে কমে এক বছর থেকে অন্য বছরে। তাই ফসলের পরাগায়ন করার জন্য এদের প্রাকৃতিক উৎপাদনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব হলে সবসময়ই এদের কাছ থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

বহুকাল ধরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে। প্রকৃতিতে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য এদের বাসস্থানের ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। কারণ যেখানে এদের বাসা এবং খাদ্য তৈরির স্থান, সেখানেই এরা পরাগায়ন কার্য করতে বেশি উৎসাহী হয়। গবেষকরা প্রকৃতিতে এদের বাসযোগ্য পরিবেশে বাসার ব্যবস্থাপনা ছাড়াও কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন নলাকার উদ্ভিদ ব্যবহার করে এদের বাসা তৈরি করেছেন (কারণ এদের বেশিরভাগই নল বা সুড়ঙ্গে বাসা তৈরি করে)।

যেকোনো ফসলের পরাগায়নের জন্যে এসব স্বতন্ত্র মৌমাছিকে সংরক্ষণ এবং শীতনিদ্রার (incubation) পদ্ধতির উন্নয়ন করে ফুল ফোটার সময়ে এদের বের হওয়া (emergence) নিশ্চিত করা যায়। এ ব্যাপারে আলফালফার পরাগায়নের তথ্য দিয়েছেন Stephen (1962, 1981) এবং Richards (1982)।

Bohart ও Pedersen (1963) বলেন যে, *Megachile rotundata, Medicago sativa* নামক উদ্ভিদের পরাগায়নে জালের বেষ্টনি এবং গ্রিনহাউজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে সবসময়ই এদের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা এবং সূর্যালোক নিশ্চিত করা হয়েছিল। এসব মৌমাছি আবদ্ধ পরিবেশে বাসাও তৈরি করতে পারে। Heinrichs-ও ১৯৬৭ সালে একই কথা বলেন।

বর্তমানে *M. rotundata* কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করে ফল ও বীজ উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

Free (1993) তার বিখ্যাত বই *Insect Pollination of Crops* এ বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র মৌমাছির জীবন বৃত্তান্ত এবং পরাগায়ন ক্ষমতা বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি *Nomia melanderi* এবং *Osmia* এর কয়েকটি প্রজাতির পরাগায়ন ক্ষমতার কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন।

Osmia cornuta বিভিন্ন ফলের বাগানে পরাগায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। Krunic (1991) বলেন যে, একটি *O. cornuta* একটি সামাজিক মৌমাছির (honey bee) চেয়ে ১০০ গুণ বেশি কর্মক্ষম। Batra (1978) বলেন, ভারত থেকে আমেরিকাতে নেওয়া *Pithitis smaragdula* যা আলফালফা পরাগায়ন করে, গ্রিনহাউজে এরা পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলাদেশেও *Pithitis*-এর কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে, কিন্তু এখনো এদের সম্পূর্ণভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি এবং পরাগায়ন ক্ষমতা সম্পর্কেও জানা যায় নি। লেখকের নিজের সংগ্রহে *Pithitis*-এর বেশ কতকগুলো নমুনা রয়েছে। এছাড়াও স্বতন্ত্র মৌমাছির বিভিন্ন প্রজাতি, যেমন *Xylocopa, Anthophora* ইত্যাদি পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমাদের দেশে সন্দেহাতীতভাবেই আরও অনেক প্রজাতির স্বতন্ত্র মৌমাছি পাওয়া যেতে পারে এবং সম্ভবত সেগুলোও ফসল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এদের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে আনা গেলে সেটা হবে আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন।

পঞ্চম অধ্যায়

হুলবিহীন মৌমাছির পরাগায়ন

আমাদের দেশে বেশ কয়েক প্রজাতির হুলবিহীন মৌমাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এদের অনেকেই ক্ষুদে মাছিও বলে থাকে। ইংরেজিতে এদের Stingless bee অথবা Stingless honey bee নামে অভিহিত করা হয়। এদের উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকাতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শস্য পরাগায়নে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এদের কার্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। তবে মধু সংগ্রহকারীরা এদের সুরক্ষিত বাসার খোঁজ ঠিকই জানে এবং সেখান থেকে তারা মধুও সংগ্রহ করে থাকে।

বাসস্থান

সাধারণত হুলবিহীন মৌমাছিরা বন্য পরিবেশে থাকতেই পছন্দ করে, তবে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশেও (disturbed habitat) অনায়াসে খাপ খাওয়াতে পারে। যখনই এরা একটি সুবিধাজনক বাসস্থান (nesting habitat) পায়, খুব শীঘ্রই এদের কলোনি সংখ্যা এবং প্রজাতিভেদে আকারেও (colony size) বৃদ্ধি পায়। এরা সাধারণত গাছের কোটরে, বাঁশের সুড়ঙ্গ নলে, পুরোনো ভাঙা দালানের ফাটলে, এছাড়া যে কোনো ভাঙা পাথরের ফাটলের মধ্যে বাসা তৈরি করে।

দক্ষিণ মেক্সিকোর মায়া (Maya) এবং মধ্য আমেরিকার কিছু অতিলোভী মৌমাছি প্রতিপালনকারী, যারা প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের আশে-পাশে বসবাস করে, এরা হুলবিহীন মৌমাছিকে ব্যবস্থাপনার (management) পর্যায়ে নিয়ে আসেন এবং খুব সহজেই এদের পালন করতে সমর্থ হন। হুলবিহীন মৌমাছিরা প্রচুর পরিমাণে মধু উৎপন্ন করে এবং প্রতিবছরেই অন্তত একবার মধু সংগ্রহ করা যায়।

খাদ্যের উৎস

সাধারণত মৌমাছির খাদ্য হলো নেকটার এবং পরাগ। সামাজিক মৌমাছি এবং হুলবিহীন মৌমাছি নেকটারকে মধুতে পরিণত করে এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে তাদের মৌচাকে (hive) জমা রাখে। কর্মী মৌমাছিরা (worker) ফুলে ফুলে ঘুরে নেকটার ও পরাগ সংগ্রহ করে এবং মৌচাকে এনে মজুত করে।

পরাগ পরিবহনের জন্যে কর্মী মৌমাছিরা তাদের পেছনের পায়ে অবস্থিত পরাগ বাস্কেটে (scopa/corbicula) স্তূপ করে বাসায় নিয়ে আসে। Apidae গোত্রের মৌমাছিদের ক্ষেত্রে স্কুপা (Scopa) পেছনের পায়ের টিবিয়া (tibia)–এর বাইরের দিকে একটি অবতলাকার গর্তের সৃষ্টি করে করবিকিউলা বা পরাগ বাস্কেটে পরিণত হয়, যা অত্যন্ত মসৃণ এবং চকচকে। কয়েক প্রজাতির মৌমাছি আছে যাদের এ পরাগ বাস্কেট বা স্কুপ পায়ে না থেকে পেটের উপর (Ventral side of the body) থাকে (যেমন– Megachilidae গোত্রের প্রজাতিগুলোতে দেখা যায়) এবং সেখানেই তারা পরাগ জমা করে বহন করে বাসায় নিয়ে আসার জন্যে।

মৌমাছিদের পরাগ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রজাতিভেদে কিছুটা পৃথক। মৌমাছিরা সাধারণত পরাগ সরাসরি স্কুপাতে জমা করে না। এরা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে নেকটার/পরাগ দুই-ই সংগ্রহের সময় ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ ঝরে পড়ে এবং এদের গায়ের লোমে আটকে যায়, সেখান থেকে সামনের পায়ের বেসিটার্সি (basitarsi)–এর সাহায্যে ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরের মাধ্যমে পেছনের পায়ের করবিকিউলিতে নিয়ে আসে। এরূপে পরাগ সংগ্রহকালীন সময়ে তারা পরাগের সাথে সামান্য পরিমাণ নেকটার (regurgitated honey from honey crop) মিশিয়ে সংগৃহীত পরাগের একটি বলের মতো আকার দান করে, পরাগ লাম্প/পরাগ বল (pollen lump/pollen ball) বলা হয়ে থাকে। Hodges (1952) মৌমাছির (*Apis* sp.) পরাগ সংগ্রহের প্রক্রিয়া বিশদভাবে তাঁর গবেষণাপত্রে বর্ণনা করেছেন।

চিত্র ৫.১ : *Trigona pastica*–এর দুটি কর্মী পরিত্যক্ত একটি বাসা থেকে সেরুমেন সংগ্রহ করছে

মৌমাছির নেকটার সংগ্রহ প্রক্রিয়া আবার অন্যরকম, যেমন– মৌমাছিরা ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহ করে তাদের ক্রপে (honey crop) জমা রাখে। ক্রপে রাখার সময় তারা নেকটারের সাথে লালাগ্রন্থি (salivary gland) থেকে নিঃসৃত রস মিশ্রিত করে মধুতে পরিণত করে এবং মধু কুঠরিতে (honey pot) ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে জমা রাখে। মৌমাছির মতো হুলবিহীন মৌমাছিতেও খাদ্যের সন্ধানে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা (recruit system) রয়েছে।

বাসা তৈরি

বেশিরভাগ মৌমাছিই বাসা তৈরির সরঞ্জাম বাইরে থেকে সংগ্রহ করে না। তবে Apidae গোত্রের অনেক প্রজাতি বাসা তৈরির সরঞ্জাম বাইরে থেকে সংগ্রহ করে। *T. postica* এরা বাসা তৈরির জন্যে রেজিন বা সেরুমেন সংগ্রহ করে থাকে (চিত্র ৫.১)। *Trigona* এর বাসা বাটুমেন (Batumen plate–মাটি বা রেজিন বা এ দুয়ের মিশ্রণ) দিয়ে আবৃত থাকে, যা বাসার সুরক্ষা প্রদানে সহায়তা করে (চিত্র ৫.২)। বাসার দেওয়ালের বাটুমেন আবরণের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ছিদ্র থাকে যেখান দিয়ে বাতাস আদান–প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় বাসার ভিতরে ফ্যানিং (fanning) ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে (Nogueira-Neto, 1948)।

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

অন্যান্য মৌমাছির মতো হুলবিহীন মৌমাছির ক্ষেত্রেও ডিম পাড়ার কয়েক দিনের মধ্যে লার্ভার সৃষ্টি হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে শূককীট অতঃপর মূককীট/পিউপা এবং সবশেষে পরিপূর্ণ মৌমাছি হয়। কিছু কিছু প্রজাতি আছে যাদের কলোনি অনেক বড় হয় যেমন–*Trigona* গণের একটি কলোনিতে এদের সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০০ বা এর বেশি হতে পারে (Michener, 1974)।

এরা সমাজবদ্ধ (highly social) মৌমাছি। এদের (cast determination)–এর কারণ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনো জানা যায় নি, তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে, Cast determination–এর কারণ খাদ্যের গুণগত মান নয় (quality of food), যা *Apis* মৌমাছিতে রয়েছে,, বরং খাদ্যের পরিমাণই (quantity of food) মুখ্য। সাধারণত বড় সেল থেকে নতুন রানি এবং ছোট সেল থেকে পুরুষ অথবা কর্মী মৌমাছির জন্ম হয়। তবে এখনও তেমনভাবে জানা যায় নি, কেন কর্মী মৌমাছিরা একটিমাত্র লার্ভাকে বেশি বেশি খাবার দিয়ে ও সযত্নে লালন–পালন করে বড় করে তোলে। এই একটি লার্ভা ছাড়া অন্য লার্ভাগুলোকে খাবার কম দেওয়ার ফলে সেগুলো ছোট থেকে যায় যার থেকে পুরুষ বা কর্মী মৌমাছি উৎপন্ন হয়।

মৌমাছির মতো এদেরও division of labor অর্থাৎ task allocation রয়েছে। হুলবিহীন মৌমাছির Task allocation নিচের বহর এদের বয়সের উপর অর্থাৎ বয়স নির্ভর (Age linked or temporal task allocation) অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে এদের কাজের পরিবর্তন ঘটে থাকে, দৈহিক আকারের তারতম্যের (Size linked task allocation) উপর নয়।

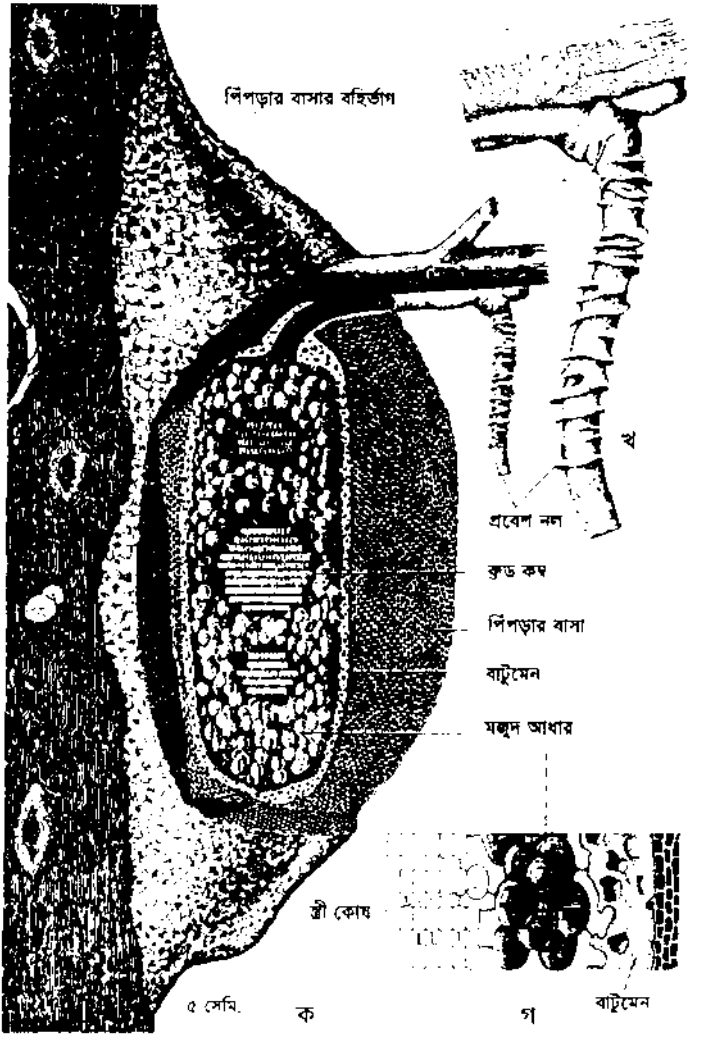

চিত্র ৫.২ : *Azteca* নামক পিঁপড়ার বাসায় *Trigona cilipes*-এর বাসা

কলোনি বিভাজন

Semi-social বা Primitively eusocial মৌমাছির ক্ষেত্রে কখনো কলোনি ভাগ হতে দেখা যায় না। তবে Highly eusocial মৌমাছির (যেমন– Honey bee, Stingless bee) ক্ষেত্রে কলোনি বিভাজন ঘটে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে এদের কলোনি উৎপাদনকে Meliponiculture বলা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এরা সাধারণত গাছের গর্ত, মাটির তলায় কোনো গর্ত, দালানের ফাটল বা সেরকম কোনো জায়গায় বাসা তৈরি করে। এরা বাসা তৈরির জন্যে নলাকার সুড়ঙ্গ (cylindrical cavity) পছন্দ করে। প্রজাতিভেদে বাসা তৈরির মধ্যে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এদের বাসা গাছের কোটর থেকে উদ্ধার করতে হলে গাছ কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পরীক্ষাগারে গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে এদের বাসার প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। স্থানান্তরের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেনো বাসায় কোনোভাবেই ঝাঁকুনি না লাগে এবং সেটা প্রাকৃতিক পরিবেশে যেভাবে ছিল, সেভাবেই থাকে। এদের বড় কাঠের গুঁড়ি বা বাক্সেও পালন করা যায়।

এদের কলোনি বিভাজনের জন্যে একটি মাতৃ কলোনি (parent colony) থেকে কিছু কর্মী অন্যত্র সরে গিয়ে নতুন একটি বাসার অবস্থান (nesting site) পছন্দ করে এবং সেখানে বাসা তৈরির কাজ শুরু করে। মাতৃকলোনি থেকে নতুন রানির জন্ম হওয়ার কিছুদিন পরই এরা সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসে। এ সময় অন্যান্য কলোনি থেকে বের হওয়া পুরুষ মৌমাছিরা এদের খুঁজে বের করে এবং উড্ডয়নরত অবস্থায় যৌন জনন সম্পন্ন করে। জননক্রিয়া সম্পন্ন হলে, নতুন রানি এক বা একাধিক নতুন বাসায় ঢুকে পড়ে। সাধারণত একটির বেশি রানি এক বাসায় থাকতে পারে না। বাসায় একটির বেশি রানি তৈরি হলে রানিরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, ফলে তাদের মধ্য থেকে একটি বাসায় অবস্থান করে এবং হেরে যাওয়া রানি বাসা ছেড়ে চলে যায়। কর্মীরাও একটির বেশি রানি নতুন বাসায় থাকতে দেয় না এবং অতিরিক্ত রানিদের তাড়িয়ে দিয়ে জয়ী রানিকে সাহায্য করে।

হুলবিহীন মৌমাছির কলোনি বিভাজনের পদ্ধতিটি একটি ক্রম-চলমান ঘটনা। তাই সাধারণত বিভাজনকালে মাতৃকলোনি থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া নতুন কলোনি পূর্ণতা পায় না এবং সঠিক স্থানান্তরের অভাবে কার্যকরও হয় না (Kerr, 1951; Kerr ও Laidlaw, 1956)।

এদের ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করতে গিয়ে কৃত্রিম উপায়ে কলোনি বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে কলোনি বিভাজনের সময় নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত :

১. একটি কলোনি বিভাজনের উপযোগী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো এদের কলোনি আকার যথেষ্ট বড় কি–না। যদি মাতৃকলোনিতে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহকারী না থাকে সে কলোনি কিছুতেই বিভাজনযোগ্য হবে না ;

২. মাতৃকলোনিকে সতর্কতার সাথে সমান দু'ভাগে ভাগ করতে হবে ; যেখানে থাকবে কর্মী, লার্ভা, পিউপা, পরাগ এবং সঞ্চিত মধু। এরপর নতুন কলোনিটিকে একটি

বাক্সে রাখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেনো মা-রানিটি আসল কলোনিতে থাকে। বাক্স দুটি পাশাপাশি কিছুদিন রাখতে হবে যেন খাদ্য সংগ্রহকারী কর্মীরা যে কোনো বাক্সে সহজেই ঢুকতে পারে ;

৩. মাতৃকলোনিটি রানিসহ ২০০ মিটার পরিমাণ দূরে সরিয়ে আসল স্থানে নতুন কলোনিটি রাখতে হবে ;

৪. মাতৃকলোনি থেকে নতুন কলোনিতে আরও কর্মী আসবে ;

৫. কিছুদিনের মধ্যেই মাতৃকলোনি থেকে নতুন রানির জন্ম হলে নতুন কলোনিতে আসবে (যদিও এ পদ্ধতি সবসময় কার্যকর হয় না)।

হুলবিহীন মৌমাছির শত্রু

হুলবিহীন মৌমাছির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শত্রু হলো পিঁপড়া, এক ধরনের মাছি, উঁইপোকা এবং অন্যান্য হুলবিহীন মৌমাছি *(Lestrimelitra, Cleptotrigona)*। বড় আকারের শত্রুর মধ্যে ভালুক, ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি। তবে সাধারণত বড় আক্রমণকারীরা এদের কলোনি আক্রমণ করে না। কৃত্রিম উপায়ে পালন করতে হলে অবশ্যই এদের কলোনি সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে।

পিঁপড়া সাধারণত রাতে এদের কলোনি আক্রমণ করে। কলোনিতে যাতে পিঁপড়া প্রবেশ করতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আক্রমণকারী বিভিন্ন ধরনের মাছি (Phorid, Stratomyid এবং Syrphid flies) যাতে বাসার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ মাছি একবার বাসায় ঢুকতে পারলে সাধারণত সে বাসার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ মাছি সেখানে ডিম পাড়ে এবং লার্ভা খুব দ্রুত বাসার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে। সেজন্য বাসার প্রবেশদ্বারটি এমন আকারে করতে হবে, যাতে মাছি সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

উঁইপোকা বাসার ভিতর প্রবেশ করতে পারলে সেখানে ওদের গ্যালারি তৈরি করে এবং অনেক সময় সঞ্চিত খাদ্যের উপরও আক্রমণ করে।

আত্মরক্ষা

কার্যক্ষম কোনো হুল না থাকার কারণে কলোনি রক্ষার সহজ কোনো উপায়ও এদের নেই। সঙ্গত কারণেই এদের আক্রমণকারী শত্রুর তালিকাটি বেশ বড়।

হুলবিহীন মৌমাছির কিছু কিছু প্রজাতি আছে যারা খুবই ভয়ানক। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো আগন্তুক বাসায় ঢুকে পড়লে বা আক্রমণ করলে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়ে আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হুল ফুটাতে পারে না ঠিকই, কিন্তু কামড়ে বা নাক, মুখ, কান দিয়ে আক্রমণকারীর দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। এদের অনেকের যেমন

Trigona, Oxytrigona–এর খুব বড় ধরনের ম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড (mandibular gland) আছে, সেখান থেকে নিঃসৃত রস এবং কামড় আক্রমণকারীর ত্বকে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে (Kerr ও Cruz,1961)। এর ব্যথা অনেক দিন পর্যন্ত অনুভূত হতে পারে (চিত্র ৫.৩)।

চিত্র ৫.৩ : স্যার এগিভিও (লিলো) ডায়াজ কোস্টারিকাতে অনেকগুলো হুলবিহীন মৌমাছির বাসা বের করেছেন। তাঁর হাতে মৌমাছির হুল ফোটানের দাগ দেখা যাচ্ছে (ফটো : আলভারো উইলি)

একটি বিষয় এখানে জানা অতি প্রয়োজন যে, এদের বাসা যতো বেশি সহজলভ্য হয় আক্রমণের দিক থেকে এরা সে পরিমাণ মারাত্মক হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এদের বাসার সাথেই পিঁপড়ার বাসা এবং পিঁপড়া এদের আক্রমণ করছে না। এর কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় যে এরা সম্ভবত কোনো রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে, যা পিঁপড়া বাসায় ঢুকতে বাধা প্রদান করে। শুধু তাই নয় পিঁপড়ার বাসার সাথে এদের বাসা থাকার ফলে সেখান থেকেও পরোক্ষভাবে একধরনের সুরক্ষা পায়। ফলে পিঁপড়া প্রতিহত করতে পারে এমন অনেক শত্রুর আক্রমণ থেকে এরা রক্ষা পায়। *Trigona (Scaura) latitarsis* সবসময় এদের বাসা এক ধরনের উইঁপোকার সক্রিয় বাসার ভিতরে তৈরি করে, অনুরূপভাবে *T. (Paratrigona) peltata* এবং *T. (Trigona) compressa* যথাক্রমে এদের বাসা তৈরি করে *Camponotus senex* এবং *Crematogaster stolli* নামক পিঁপড়ার বাসায় (Kempff, 1962)। এদের সবার বাসার সব প্রবেশদ্বারই খুব সুরক্ষিত থাকে, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো শত্রু ঢুকতে না পারে।

এগুলো ছাড়াও Kerr ও Lello (1962) কমপক্ষে বাসা সুরক্ষার ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেন, সেগুলো নিচে দেয়া হলো :

১. কিছু প্রজাতি আছে যারা কোনো আক্রমণকারী বাসায় ঢুকলে তার গায়ে রেজিন বা আঁঠালো পদার্থ (মোমমিশ্রিত) নিঃসৃত করে একেবারে লেপটে ফেলে;

২. *Trigona* এবং Sub genus *Trigona* কামড়ে ক্ষত সৃষ্টি করে;

৩. প্রতিরোধমূলক এক ধরনের দুর্গন্ধ ছড়ায়;

৪. একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ করে শত্রুর নাক, মুখ, কান ও চোখ দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং কামড়ে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে;

৫. বড় কলোনিতে সাধারণত উপরোক্ত সব ধরনের পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখা যায়;

৬. নিজেদের কর্মীরা শুধু চলাচল করতে পারে এমন মাপের প্রবেশদ্বার তৈরি করে;

৭. রাতে বা খারাপ আবহাওয়ার সময় প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখে;

৮. প্রবেশদ্বারের ভিতরে আঁঠালো রেজিন মেখে দিয়ে পিঁপড়া এবং উইপোকার চলাচল প্রতিহত করে;

৯. কিছু প্রজাতি আছে বড় এবং শক্তিশালী কোনো আক্রমণকারীর সংস্পর্শে এলে মৃতের মতো ভান করে;

১০. বাসা বা বাসার প্রবেশদ্বার লুকিয়ে রাখে;

১১. কিছু প্রজাতি প্রকৃতির রঙের সঙ্গে মিশিয়ে বাসা আক্রমণ থেকে প্রতিহত করে;

১২. আক্রমণকারীকে জ্বালা সৃষ্টিকারী পদার্থ নিঃসৃত করে;

১৩. অন্যান্য মৌমাছি আক্রমণ করলে তাদের গায়ে মধু নিক্ষেপ করে প্রতিহত করে।

আত্মরক্ষামূলক এসব পদ্ধতি সাধারণ মৌমাছির তুলনায় ভালো, কারণ এতে তাদের মৃত্যুর কোনো কারণ থাকে না। *Apis* মৌমাছি হুল ফুটানোর (১/২/৩ বার) পর সাধারণত বাঁচে না।

পরাগায়ন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বিভিন্ন ধরনের শস্য পরাগায়নে এরা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। হুলবিহীন মৌমাছি উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পলিনেটর হিসেবে পরিচিত (Nogueia-Neto,1970)।

উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষি (tropical agriculture) এখনো তেমন উন্নত নয় বলে এদের পরাগায়ন ক্ষমতা সম্পর্কে এখনো বিশদভাবে জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে দেখা গিয়েছে যে, এরা অত্যন্ত দক্ষ পলিনেটর। খাবারের উৎস ও বাসস্থান হ্রাস পাওয়ার ফলে এদের সংখ্যা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। তবে বনাঞ্চল এবং প্রাণীবিষয়ক উদ্যান (Zoological park) সংরক্ষণের মাধ্যমে এদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

একটি *Trigona*-এর বাসা থেকে ২ কেজি পরিমাণ মধু আহরণ করা যেতে পারে। উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকায় মধু আহরণকারীরা খাওয়ার জন্য এদের বাসা ভেঙে মধু, মোম,

এমনকি এদের লার্ভা পর্যন্ত নিয়ে যায় । অনেকে এদের বাক্স বা নলে পালনও করে থাকে। প্রজাতিভেদে এদের মধুর স্বাদের পার্থক্য রয়েছে। অত্যন্ত সুস্বাদু মধু উৎপাদনকারী একটি প্রজাতি হলো *Trigona jaty*.

পরাগায়নের জন্যে ব্যবস্থাপনা

কয়েক প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য এদের ব্যবস্থাপনা (management) খুব কার্যকর ফল দিতে পারে বলে অনুমান করা হয়। তবে ব্যবস্থাপনার পূর্বে এদের কলোনি কৃত্রিম পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিম্নলিখিত কারণে সব ধরনের হুলবিহীন মৌমাছিরই ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়।

১. কলোনির আকার খুব ছোট হলে ;

২. খুবই আত্মরক্ষাকারী কলোনি (*Trigona, Partamona, Oxytrigona*) ;

৩. বাসা তৈরির স্থান অত্যন্ত সীমিত, ফলে এদের কলোনি স্থানান্তর খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ;

৪. কিছু প্রজাতির নেকটার ছিনতাইয়ের (nectar robbing) অভ্যাস রয়েছে বলে তা ফসলের জন্য ক্ষতিকারক।

তবে যদি কলোনি আকার বড় হয়, শান্ত স্বভাবের হয়, উড্ডয়ন ক্ষমতা ভালো হয় এবং কৃত্রিম পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে তাহলে অনুরূপ প্রজাতির ব্যবস্থাপনা করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কিছু কিছু প্রজাতি রয়েছে যাদের উড্ডয়ন ক্ষমতা কম (৫০০ মিটারের বেশি নয়), কিন্তু খুব ভালো পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। এদের খুব সহজেই গ্রিনহাউজ পরাগায়নে ব্যবহার করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের মৌমাছি

যে মৌমাছি নিয়ে কবি কবিতা লিখেছেন, গান রচিত হয়েছে, এখন সেই মৌমাছি এবং এদের পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশের অনেক জায়গায় ঘুরে দেখা গিয়েছে যে, মশা আর মাছি ছাড়া কোনো পতঙ্গ সহজলভ্য নয়, মৌমাছিতো নয়ই !

আজ থেকে ২৫ থেকে ৩০ বছর পূর্বে আমাদের দেশে কত মৌচাক ছিল। এখন সে রকম কিছু ভাবাই যায় না। একটি মৌচাক বাঁধার পূর্বেই কেটে ফেলা হয় দু'ফোটা মধুর জন্যে। প্রাকৃতিক মধু অতিমাত্রায় আহরণ করা পেশা হওয়া উচিৎ নয়। সামান্য ১০০ থেকে ২০০ টাকার মধু আহরণের জন্যে হাজার–লক্ষ টাকার মূল্য দিত এমন মৌমাছি ধ্বংস করা হচ্ছে। শুধু মৌমাছিই নয় এদের অবাসস্থল এবং খাদ্যের উৎস বনজ বৃক্ষলতাও আমরা নির্বিচারে বিনষ্ট করে চলছি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মৌমাছি পালন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে যে, মৌমাছি পালনকারীরা অনেকাংশেই প্রকৃতি থেকে *A. creana*–এর কলোনি ধরে এনে বাক্সে রাখছে। ফলে কোনো কারণে যদি সে বাক্সটি বাড়তে না পারে অর্থাৎ রানি এবং পুরুষ জন্মাতে না পারে সেক্ষেত্রে ঐ কলোনিটির নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এতে প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা কমারও সম্ভাবনা রয়েছে।

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মৌমাছি বাড়লে শস্য উৎপাদনও বাড়বে অন্তত কিছু বিশেষ প্রজাতির শস্যের, যাদের পরাগায়ন করানো প্রয়োজন হয়। যেহেতু আমাদের দেশে মৌমাছির সংখ্যা কমে গিয়েছে আর তাই অনেক শস্য এবং ফল–মূলও কম উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই।

একসময় আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ময়ূর ছিল আজ ঢাকা চিড়িয়াখানা ছাড়া দেশের কোথাও ময়ূর আছে বলে শোনা যায় না। সর্বশেষ ময়ূর দেখা গিয়েছিল ঢাকা জেলার শ্রীপুরের বামরা শালবনে। এগুলো আমাদের দেশের শিকারিরা নিঃশেষ করে দিয়েছে, যেমনি এখনো করছে আমাদের অতি প্রিয় পাখি ময়নাকে।

আজ ২৫ থেকে ৩০ বছর পূর্বে গ্রামে গেলেই গাছে গাছে অনেক মৌচাক দেখা যেতো। এখন তা দেখা যায় না। প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা এ মৌমাছির প্রজাতিগুলোও আমাদের বর্বরতার কারণে লুপ্ত হয়ে যাবে এদেশ থেকে। দুঃখের কিছু নেই লুপ্ত হবে শুধু আমাদের দেশ থেকেই, দেখা যাবে ঠিকই পাশ্ববর্তী কোনো দেশে ওরা আশ্রয় নিয়েছে এবং স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে

গিয়েছে, কারণ তারা নির্বিচারে এদেরকে নিধন করে না। একটি উদাহরণ থেকেই তা বোঝা যায়, যেমন আমাদের দেশে ময়ূর নেই কিন্তু প্রতিবেশী একটি দেশে রাস্তায় রাস্তায় ময়ূর ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাদের হত্যা করে না বরং লোকালয়ে ঢুকে পড়লে লোকজন ধরে নিয়ে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। বন্য হাতির ক্ষেত্রেও ঠিক এরকম গল্প শোনা যায়।

প্রায় ৩০ বছর পূর্বে এক গ্রামে দেবদারু গাছে একটি মৌচাক হয়েছিল। সেটাকে ভাঙার জন্যে আগুন দিয়ে শত শত মৌমাছিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল সামান্য একটু মধু সংগ্রহ করার জন্য, এর পরে আজ পর্যন্ত সেখানে মৌচাক বসেছে বলে শোনা যায় নি।

আসলে আমরা ইচ্ছে করে কেউ কোনো প্রাণীকে ধ্বংস করি না, সে যতো নির্মম মানুষই হোক না কেন। নিজের অজ্ঞতার কারণে বা ঝোঁকের বসেই সাধারণত মানুষ প্রাণী নিধন করে থাকে। সাধারণ মানুষকে যদি এ কথাটা বুঝিয়ে দেয়া যায় যে, এদের নিধন করা উচিত নয়। তাহলে কেউ ইচ্ছে করে কোনো প্রাণী মারবে না। মৌমাছির ক্ষেত্রেও তাই একথা বলা যায় যে, সাধারণ জনগণ যদি জানতে পারেন মধুর চেয়ে এদের পরাগায়ন ক্রিয়া আমাদের শস্যের জন্যে অনেক লাভজনক, তাহলে এদের কোনো ক্ষতি করবেন না।

সাধারণত মানুষের বন্যপ্রাণী হননের পিছনে নিম্নলিখিত দুটো কারণ রয়েছে :

১. বন্য প্রাণীর প্রতি সাধারণ মানুষ সব সময়ই ভীত, কারণ তাদের দেখলেই মনে হয় আক্রমণ করবে (যদিও এটি অনেকক্ষেত্রেই সঠিক নয়)।

২. অনেকে এদের হত্যা করে একটু আনন্দ পেয়ে থাকে (যার কারণ ভয় থেকেও হতে পারে। অর্থাৎ একটি ডোরা সাপ বা গোখরা সাপ মারতে পারলে সবাই মনে করে যে, একটি মারাত্মক প্রাণী মারা হয়েছে। সেটাই একটি আনন্দের বিষয় মাত্র)।

বাংলাদেশ নদীবিধৌত পলিমাটির দেশ। এর প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে এখানে সব পরিবেশে সব ধরনের মৌমাছি না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে উঁচু এলাকায় যেমন পাহাড়ি অঞ্চলে সাধারণত মৌমাছির প্রাধান্য থাকে। বিভিন্ন গবেষণাপত্র থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০ প্রজাতির মৌমাছির (সামাজিক এবং স্বতন্ত্র) এবং ৯০ প্রজাতির বোলতার তথ্য পাওয়া গিয়েছে (Alam, 1967; Tadauchi ও Alam, 1993 এবং Bhuiya ও Miah, 1990)। সারণি ৬.১ ও ৬.২-এ এদের তালিকা প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশে মৌমাছিপালন

বাংলাদেশে মৌমাছিপালন (Apiculture) একটি অত্যন্ত নতুন উদ্যোগ যা মাত্র কয়েক দশক আগে শুরু হয়েছে (Hannan 2000, 2001)। এখানে বাণিজ্যিকভাবে মধু উৎপাদন এখনো শুরু হয় নি বলা চলে। হাতে গোণা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মধু উৎপাদন করে এবং তাদের নিজস্ব নামে তা বিক্রি করে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত মৌ-পদার্থ যেমন মধু, মোম ইত্যাদির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এসব পদার্থের উৎপাদন খুবই যৎসামান্য।

বিজ্ঞানের যে শাখায় মৌমাছিকে বাক্সে কিংবা অন্য যে কোনো কৃত্রিম পরিবেশে রেখে এদের বংশবৃদ্ধি এবং মধু, মোম ইত্যাদি উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা হয় তাই হলো মৌমাছি পালন। মৌমাছি পালনের প্রধান কার্যকরী এজেন্ট হলো মৌমাছি। সব মৌমাছিই এপিকালচারের জন্যে ব্যবহার করা হয় না, সাধারণত *A. cerana* এবং *A. mellifera*-ই ব্যবহার করা হয় এর উদ্দেশ্যে। এসব মৌমাছির বাক্স বিভিন্ন ফসলের কিংবা ফলের জন্যে যেমন— আম, লিচু, পেয়ারা, সরিষা ইত্যাদি শস্য পরাগায়নেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মৌমাছি পালনে কয়েকটি দেশ বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে যেগুলোর নাম না লিখলেই নয় যেমন—আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, চীন, ইংল্যান্ড, কানাডা, পোল্যান্ড ইত্যাদি। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশে মৌমাছি পালন সফলতা পায় নি এর কারণ হলো এ ব্যাপারে এখানে বিশেষ কোনো গবেষণা হয় নি এবং এর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ, কৃষক ও অন্য পেশার লোকজন কেউই তেমন কোনো তথ্য পান নি। বর্তমানে এ বিষয়ে অল্প পরিসরে হলেও কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে মৌমাছি পালনকে এদেশে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপার্জনের কর্মকাণ্ডে পরিণত করবে। এরই মধ্যে কৃষক ও সাধারণ জনগণের মাঝে মৌমাছি পালন সুফল পৌঁছতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মধু উৎপাদন এবং শস্য পরাগায়নে এর ভূমিকার জন্যে।

আজ মানুষ মৌমাছি পালন সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে দেশের সর্বস্তরের জনগণ মৌমাছি পালন করতে চায় এবং তারা এ সম্পর্কে তথ্য ও সাহায্য পেতে চায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মৌমাছি পালনের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। মৌমাছিপালনের শুরু হলে এর সঙ্গে যারা জড়িত সবাই আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

বাংলাদেশের মৌমাছি পালনের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত দুর্বল। কবে, কখন, কোথায় মৌমাছি পালন শুরু হয়েছিল তা বলা কঠিন। দক্ষিণ এশিয়ায় (বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান) একজন ইংরেজ মৌমাছি পালক (Bee keeper) নিউটন সর্বপ্রথম *A. cerana* নিয়ে কাজ করেন। তিনি এশীয় মৌমাছিপালন টেকনোলজির উন্নয়ন করেন এবং কলোনি ব্যবস্থাপনার জন্যে বাক্সে রাখেন। তখন থেকেই এ এলাকায় মৌমাছি বাক্সে পালন হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধীর অধীনে নোয়াখালী গান্ধী আশ্রমে সর্বপ্রথম মৌমাছি পালনের কথা জানা যায়। আবদুল লতিফ নামে একজন মৌমাছি পালক ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশে মৌমাছি পালন বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে। বর্তমানে কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন এলাকায় মৌ-চাষের জন্যে বিশেষ করে মধু উৎপাদনের জন্যে কাজ করছে। সারাদেশে বিসিক (BSCIC—Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation) এর ৪টি ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে তার মাধ্যমে এরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার কাজ হাতে নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আরও কিছু NGOও এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সারণি ৬.১ : বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন রকম মৌমাছির (সামাজিক এবং স্বতন্ত্র) তালিকা

প্রজাতি	গোত্র	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
Apis dorsata Fabricius	Apidae	সমগ্র বাংলাদেশ	বড় মৌমাছি (Giant honey bee)
Apis cerana Fabricius	Apidae	সমগ্র বাংলাদেশ*	এশিয়ান মৌমাছি/সেরানা মৌমাছি
Apis florea Fabricius	Apidae	সমগ্র বাংলাদেশ	বামন মৌমাছি (dwarf honey bee)
*A. mellifera***	Apidae	সমগ্র বাংলাদেশ	ইউরোপিয়ান মৌমাছি (common honey bee)
Andrena mollis	Andrenidae	সিলেট	—
Anthidium rasorium		সমগ্র বাংলাদেশ	—
Bombus montivagus N.	Apidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	ভ্রমর
Bombus eximius S.	Apidae	সিলেট	ভ্রমর
Ceratina hieroglyphica	Anthoridae	সিলেট	ছোট ছুতার মৌমাছি
Ceratina perforatrix	Anthophoridae	সিলেট	ছোট ছুতার মৌমাছি

* স্বাধীনতার পূর্ববর্তী নাম পূর্ব পাকিস্তান (M.Z. Alam, 1967)

** *A. mellifera* মূলত ইউরোপীয় প্রজাতি এখানে যদিও পাওয়া যায় এটা, হয়তো মৌমাছি পালনকারী অথবা অন্য কারোও মাধ্যমে এখানে এসেছে

প্রজাতি	গোত্র	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
Ceratina sexmaculata	Anthophoridae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	ছোট ছুতার মৌমাছি
Ceratina viridissima	Anthophoridae	সিলেট	ছোট ছুতার মৌমাছি
Coelioxys argentifrons	Anthophoridae	সমগ্র বাংলাদেশ	ছোট ছুতার মৌমাছি
Coelioxys basalis	Anthophoridae	সমগ্র বাংলাদেশ	ছোট ছুতার মৌমাছি
Coelioxys capitatus	Anthophoridae	সমগ্র বাংলাদেশ	ছোট ছুতার মৌমাছি
Coelioxys decipiens	Anthophoridae	সমগ্র বাংলাদেশ	ছোট ছুতার মৌমাছি
Crocisa histrio	Anthophoridae	সমগ্র বাংলাদেশ	ছোট ছুতার মৌমাছি
Ctenoplectra cornuta	Melittidae	সিলেট	—
Halictus ciris	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Halictus senescens	Halictidae	সিলেট	—
Halictus subopacus	Halictidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	—
Halictus viscinus	Halictidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	—
Halictus wroughtoni	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Heriades parvula Bingh	Megachilidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	—
Homalictus sp.	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—

প্রজাতি	গোত্র	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
Lasioglossum sp.	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum albescens	Malictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum massuricus	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum matheranenses	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum nasicenses	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum propinqua	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lasioglossum spp.	Halictidae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Lithurgus atratus	Megachilidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	—
Megachile (Eutricharea) dorsalis	Megachilidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile anthracina	Megachilidae	সমগ্র বাংলাদেশ	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile bicolor	Megachilidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile conjuncta	Megachilidae	সমগ্র বাংলাদেশ	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile disjuncta Lepel	Megachilidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile faceata Bingh	Megachilidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	পাতা কাটা মৌমাছি

প্রজাতি	গোত্র	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
Megachile gathela humida Cookerell	Megachilidae	দেশের পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	পাতা কাটা মৌমাছি
Megachile moticola	Megachilidae	সিলেট	পাতা কাটা মৌমাছি
Melecta himalayana Bingh	Anthophoridae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	—
Nomada adjusta	Anthophoridae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	—
Nomada lusca Smith	Anthophoridae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	—
Nomada subpetiolata Smith	Anthophoridae	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল	—
Nomia aurifrons	Halictidae	সিলেট	—
Nomia clypeata	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Nomia curvipes	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Nomia elliotii Smith	Halictidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	—
Nomia exbeloides	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Nomia westwoodi	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Pithitis binghami (Cokerell)	Anthophoridae	টাঙ্গাইল	—
Psithyrus bellardii	Apidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	—

প্রজাতি	গোত্র	প্রাপ্তিস্থান	মন্তব্য
Sphecodes crassicornis	Halictidae	যশোহর	—
Sphecodes fumipennis	Halictidae	সিলেট	—
Sphecodes matheranensis	Halictidae	কুমিল্লা	—
Steganomus nodicornis	Halictidae	সমগ্র বাংলাদেশ	—
Trigona fuscobaltiata	Apidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	ক্ষুদে মৌমাছি, হুলবিহীন মৌমাছি
Xylocopa acutipennis	Xylocopidae	সিলেট	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa aestuans	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa auripennis	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa basalis Smith	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa fenestrata Fabr	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa rufescens Smith	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa tenuiscopa	Xylocopidae	চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa verticalis F.	Xylocopidae	সিলেট	বাঁশের ভিতরে বাসা তৈরি করে
Xylocopa dissimilis Lepel	Xylocopidae	চট্টগ্রাম অঞ্চল	বড় ছুতার মৌমাছি
Xylocopa latipes L.	Xylocopidae	ময়মনসিংহ	কাঠের ভিতরে বাসা তৈরি করে

সারণি ৬.২ : বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রজাতির বোলতা যা পরাগায়নে সহায়তা করতে পারে

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Ammophila dimidiata S.	সমগ্র বাংলাদেশ*	Sphecidae
Ampulex compressa Fab	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Ampulex ruficornis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Aporus bengalensis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Aporus cotesi C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Aporus orientalis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Astata orientalis S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Bembex orientalis H.	সিলেট অঞ্চল	Sphecidae
Bembex pinguis H.	সিলেট অঞ্চল	Sphecidae
Cerceris bifasciata G.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Cerceris dentata C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Cerceris humbertiana F.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Cerceris rothneyi C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Chalybion bengalensis Dhal.	ঢাকা জেলা	Sphecidae

* স্বাধীনতার পূর্ববর্তী নাম পূর্ব পাকিস্তান (M. Z. Alam, 1967)

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Crabro ardens C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Crabro argentatus L.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Crabro buddha C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Crabro nitidus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Crabro odontophorus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Dasyproctus sp.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Eumenes arcuata Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Eumenes conica Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Eumenes esuriens Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Eumenes flavopicta B.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Eumenes gracilis Saussure	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Eumenes maxillorusconjicus Fb.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Eumenes petiolata Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Gastrosericus rothneyi C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Hemipepsis indiana Wahis	ঢাকা জেলা	Pompilidae
Larra fuscipennis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Larra similima S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Larra sp.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Notogonia subtessellata Smith	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Nysson erythropoda C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Nysson rugosus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Odynerus bipustulatus Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Odynerus fistulosus Saussure	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Odynerus ornatus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Odynerus punctum Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Odynerus sp.	ঢাকা জলা	Eumenidae
Oxybelus canescens C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Oxybelus flavipes C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Oxybelus fulvopilosus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Pison rothneyi C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Polistes herbraeus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Pompilus analis (Fabricius)	ঢাকা জেলা	Pompilidae

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Pompilus ariadne C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus incognitus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus lascivus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus orientalis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus rothneyi C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus vivax C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pompilus zeus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pseudagenia ariel C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pseudagenia atalanta S.	সিলেট জেলা	Pompilidae
Pseudagenia blanda Guerin	ঢাকা জেলা	Pompilidae
Pseudagenia deceptrix S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pseudagenia juno C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Pseudagenia sp.	ঢাকা জেলা	Pompilidae
Rhynchium bengalensis S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Rhynchium brunneum Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Rhynchium haemorrhoidale F.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Rhynchium nitidulum F.	সমগ্র বাংলাদেশ	Eumenidae
Salius anthracinus S.	সিলেট অঞ্চল	Pompilidae
Salius aureosericeus Cam.	ঢাকা জেলা	Pompilidae
Salius bellicosus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Salius electus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Pompilidae
Salius fenestratus S.	সিলেট অঞ্চল	Pompilidae
Salius ichneumoneus	সিলেট অঞ্চল	Pompilidae
Sceliphron eumenes C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Sceliphron madraspatanum Fab.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Sceliphron solieri Smith	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Sceliphron spinolae L.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Sphex lobatus Fab.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Sphex luteipennis M.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Sphex maia B.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Sphex nigellus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Sphex xanthopterus C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae

প্রজাতি	প্রাপ্তিস্থান	গোত্র
Stizus bidipeatus Christ	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Stizus melleus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Stizus vespiformis Fab.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Tachysphex bengalensis C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Tachytes connpicua S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Tachytes ornatipes C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Tachytes vicina C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Trypoxylon buddha C.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Trypoxylon geniculatum Cam.	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Trypoxylon pilcatum S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Sphecidae
Trypoxylon pileatum Smith	ঢাকা জেলা	Sphecidae
Vespa bicolor F.	সিলেট অঞ্চল	Vespidae
Vespa dorylloides S.	রংপুর অঞ্চল	Vespidae
Vespa ducalis S.	সিলেট অঞ্চল	Vespidae
Vespa magnifica S.	সিলেট অঞ্চল	Vespidae
Xenorhynchium nitidulum Fabricius	ঢাকা জেলা	Eumenidae
Zethus ceylonicus S.	সমগ্র বাংলাদেশ	Vespidae

বাংলাদেশে মৌমাছি পালন সম্পর্কে তথ্য তেমন পাওয়া যায় না। Hossain এবং সহকর্মীবৃন্দ (১৯৮৯) বলেন, এপ্রিল — মে মাসই হলো *A. cerana* এর কলোনিতে মধু উৎপাদনের জন্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় এবং ডিসেম্বর — ফেব্রুয়ারি হলো খারাপ সময়। তাঁদের হিসাব মতো সর্বোচ্চ সময়ে মাসে ৩—৫ কেজি মধু উৎপাদন সম্ভব। মৌমাছি পালনকে অর্থাৎ মৌ-শিল্পকে (Bee-keeping Industry) উন্নত করতে হলে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তা হলো সারা দেশের মৌ-উদ্ভিদের একটি তালিকা তৈরি করা ও পর্যায়ক্রমে এর পরিমাণ বাড়ানো।

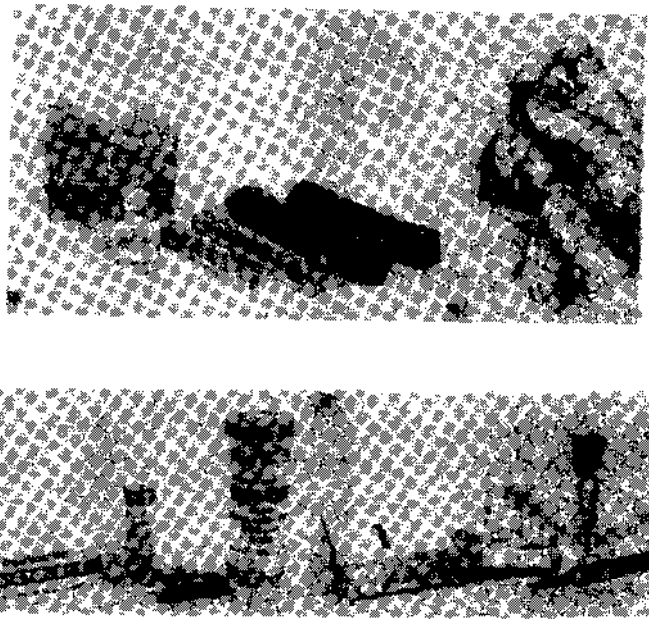

চিত্র ৬.১ : কৃত্রিম উপায়ে মধু সংরক্ষণ পদ্ধতি

একটি *A. cerana* -এর কলোনি থেকে মাসে ২—৬ কেজি মধু আহরণ করা যেতে পারে। সর্বোচ্চ মধু উৎপাদনের সময় একটি আট ফ্রেমের নিউটন হাইভ সপ্তাহে ২ কেজি মধু উৎপাদন করতে পারে। *A. mellifera* যদিও ইউরোপীয় মৌমাছি এটিও বাংলাদেশে অনেকে পালন করছে এবং মধু উৎপাদন করছে। শুধু তাই নয়, অনেকে একে শস্য পরাগায়নেও ব্যবহার করছে। মৌমাছি পালনকারী এবং উৎপাদনকারী সবাই বলেছে যে, এটি প্রচুর মধু উৎপাদনে সক্ষম। বাংলাদেশে এসব প্রজাতির কৃত্রিম উৎপাদন এখনো সম্ভব হয় নি। তবে

মাঠ পর্যায়ে কলোনি বিভাজন একটি অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। এ ব্যাপারে খুব কম সংস্থাই আছে যারা কাজ করছে এবং এদের সাফল্যও এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারলে একটি বাক্স থেকে বছরে ৮০ কেজি মধু উৎপাদন সম্ভব, যার মূল্য ১৬,০০০.০০ টাকা। এ পরিমাণ আয় করতে একজন গ্রাম্য দরিদ্র মহিলা কিংবা শিক্ষিত বেকার যুবকের কোনো কষ্টই হওয়ার কথা নয় বরং অন্যান্য সকল কাজ স্বাভাবিক রেখেই এর উৎপাদন সম্ভব। বিসিক এ ব্যাপারে সাহায্য করে চলেছে দেশের সর্বত্র।

মৌমাছি অনেকভাবে আমাদের উপকার করে থাকে যেমন— মধু, মোম, প্রোপলিস ইত্যাদি উৎপাদন করে। এছাড়া সবচেয়ে বড় যে সহায়তা পাওয়া যায় মৌমাছি থেকে তাহলো ফসলের পরাগায়ন। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক মৌ-পদার্থ দুভাবে সংগ্রহ করা হয়, যেমন—

১. চাক কেটে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়;

২. মৌমাছি অন্যত্র চলে গেলে মোমের কোম্বটি সংগ্রহ করা হয়।

উপরের দুপ্রকারের পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো কিছু সংগ্রহের কথা এখনো জানা যায় নি। দেশীয় পদ্ধতিতে মৌ-পদার্থ (Bee product) সংগ্রহ করার সময় মৌয়ালরা মৌমাছি তাড়ানোর জন্যে শুকনো খড়-কুটা এবং লতা-পাতা জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে, এতে প্রচুর মৌমাছি এবং লার্ভা মারা যায়। আমাদের দেশে মৌ-পদার্থের মধ্যে একমাত্র মধুই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। মধু সাধারণত অন্যান্য খাদ্যের সাথে বা সরাসারি খাওয়া হয়। বেশিরভাগ মানুষই এখনো পর্যন্ত রোগ-বালাইয়ের পথ্য হিসেবেই মধু ব্যবহার করে থাকে। মোম বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার হয় যেমন—মোমবাতি, ওয়াক্স পেপার, ফার্নিচার ইত্যাদি। অন্যান্য মৌ-পদার্থের ব্যবহার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, মৌমাছির বাক্স/চাক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের পদার্থ পাওয়া যায়।

মধু : বাংলাদেশে এখনো সিংহভাগ মধু আসে প্রাকৃতিক উৎস থেকেই। এগুলো দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমান মধু আসে সুন্দরবন থেকে। একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, ১৯৫৭—১৯৭১ পর্যন্ত সময়ে বছরে ১৩৩ টন মধু উৎপন্ন হয়। যদিও দেশে বাণিজ্যিকভাবে মধু উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু এর পরিমাণ খুবই নগণ্য। কিছু NGO এবং ব্যক্তি উদ্যোগে এর চাষ চলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। যেহেতু দেশে মধুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, সঙ্গত কারণেই বিদেশ থেকে প্রচুর মধু আসছে দেশের চাহিদা মিটাতে। আর তাই এখনই মৌচাষের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া উচিত, পর্যাপ্ত পরিমাণ মধু উৎপন্ন করার জন্যে।

মোম : মধুর মতো মোমও একইভাবে সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক চাক থেকেই। চাষ করা বাক্সে খুবই স্বল্প পরিমাণে মোম উৎপন্ন হয় ফলে সেখান থেকে এখনো অন্যান্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সাধারণত মোম আহরণ করা হয় না।

সারণি ৬.৩ : বিভিন্ন গোত্রের মৌমাছির ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করার পদ্ধতি

	পরাগ বহন করার অঙ্গ							পরাগ স্তূপের অবস্থা		
	পেছনের পা									
গোত্র	ট্রোকেন্টার	ফিমার	টিবিয়া	বেসিটার্সাস	প্রোপো-ডিয়াম	মেটাসোমা (স্টারনা)	অভ্যন্তরীণ (ক্রপ)	শুষ্ক	নেকটারযুক্ত	তৈলাক্ত
Stenotritidae (স্টেনোট্রাইটিডি)	কদাচিৎ	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়	কদাচিৎ					^	
Colletidae (কোলেটিডি)	সময়-সময়	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়			বেশ দেখা যায়	সব সময়	^	^	
Oxaeidae (অক্সিডি)	সময়-সময়	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়			কদাচিৎ		^		
Halictidae (হেলিকটিডি)	কদাচিৎ	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়	কদাচিৎ		কদাচিৎ		^		
Andrenidae (অ্যানড্রেনিডি)	সময়-সময়	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়		কদাচিৎ			^	^	
Melittidae (মেলিটিডি)			বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়				^	^	^
Ctenoplectridae (টেনোপ্লেক্টিডি)			বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়						^
Fideliidae (ফাইডেলিডি)						সব সময়		^		

	পরাগ বহন করার অঙ্গ							পরাগ স্তূপের অবস্থা		
	পেছনের পা									
গোত্র	ট্রোকেন্টার	ফিমার	টিবিয়া	বেসিটার্সাস	প্রোপো-ডিয়াম	মেসোসোমা (স্টারনাম)	অভ্যন্তরীণ (ক্রপ)	শুষ্ক	নেকটারযুক্ত	তৈলাক্ত
Megachilidae (মেগাকিলিডি)						সবসময়		^		
Anthophoridae (অ্যান্থোফোরিডি)		কদাচিৎ	বেশ দেখা যায়	বেশ দেখা যায়		কদাচিৎ		^		^
Apidae (এপিডি)			সবসময়				কদাচিৎ		^	^

* D.W Roubik থেকে পরিবর্তিত

প্রোপলিস : বাংলাদেশে প্রোপলিস আহরণের কথা এখনো জানা যায় নি। তবে এ পদার্থ মৌ-বাক্সে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বলে জানা গিয়েছে। এটি গাঢ়-লাল বা কালচে-লাল রঙের একধরনের আঠালো পদার্থ। *A. cerana* প্রজাতিটি প্রোপলিস সংগ্রহ ও জমা করে না।

রয়েল জেলি : নতুন রানির জন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এটি। বাংলাদেশে এখনো এর সংগ্রহের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

পরাগ : একটি মৌচাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরাগ। পরাগের উপর নির্ভর করে সে চাকে কি পরিমাণ কর্মী বা অন্যান্য মৌমাছির জন্ম হবে। বর্ধনশীল লার্ভার প্রধান খাদ্যই হলো পরাগ। বাংলাদেশে পরাগ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশই পরাগ বহুবিধ ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে।

পরাগায়ন : মৌমাছির প্রধানতম কাজ হলো উদ্ভিদের ক্রস পরাগায়ন করা। পরাগায়নের ফলে ফল/ফসলের উৎপাদন বাড়ে, স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং ফলের গঠন সুন্দর হয়। তাই আজকাল বাণিজ্যিকভাবে ফল/ফসল উৎপাদনের জন্য উন্নত দেশগুলোতে মৌমাছি ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে এর সম্পর্কে তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কৃষক এবং ফল চাষীরা পরাগায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তবে কিছু ফল বা ফসলের পরাগায়নের জন্যে কোথাও কোথাও পলিনেটর অপরিকল্পিতভাবে হলেও ব্যবহার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পটল, লাউ, মিষ্টি কুমড়া প্রভৃতির পরাগায়নের জন্যে কৃষকরা হস্ত পরাগায়ন করে থাকে।

মৌ-বিষ : সকল স্ত্রী মৌমাছির একটি বিষ থলি থাকে। কোনো পুরুষের তা থাকে না। এসব বিষ বিভিন্ন ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে এ মৌ-বিষ আহরণের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি।

বিভিন্ন এপিয়ারিতে তথ্য নিয়ে জানা গিয়েছে যে *A. cerana* -তে Thai Sac Brood নামে একপ্রকার ভাইরাস রোগ হয়ে থাকে যা হলে সে চাকের ধ্বংস অনিবার্য। এছাড়াও রয়েছে ভেরোয়া মাইট (*Varroa* mite) এবং মোম মথ (Wax moth) এদের আক্রমণও অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। ঠিকভাবে মৌমাছি পালন করতে পারলে আর্থিক সফলতা নিশ্চিত, এ কথা আজ অনেকেই মেনে নিয়েছেন।

মৌমাছি পালনে সমস্যা

মৌমাছি গৃহপালিত প্রাণী নয় তাই এদের পালনের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হতে হয়। এরা জীবনধারণ, বাসস্থান এবং প্রজননের জন্যে প্রধানত প্রাকৃতিক খাদ্য ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল । কৃত্রিম পরিবেশে আবদ্ধ করলেই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত কারণে এদের পালনে বিশেষভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হয় :

প্রোপলিস : বাংলাদেশে প্রোপলিস আহরণের কথা এখনো জানা যায় নি। তবে এ পদার্থ মৌ-বাক্সে স্বল্প পরিমাণে পাওয়া যায় বলে জানা গিয়েছে। এটি গাঢ়-লাল বা কালচে-লাল রঙের একধরনের আঠালো পদার্থ। *A. cerana* প্রজাতিটি প্রোপলিস সংগ্রহ ও জমা করে না।

রয়েল জেলি : নতুন রানির জন্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এটি। বাংলাদেশে এখনো এর সংগ্রহের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

পরাগ : একটি মৌচাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরাগ। পরাগের উপর নির্ভর করে সে চাকে কি পরিমাণ কর্মী বা অন্যান্য মৌমাছির জন্ম হবে। বর্ধনশীল লার্ভার প্রধান খাদ্যই হলো পরাগ। বাংলাদেশে পরাগ সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর অনেক দেশই পরাগ বহুবিধ ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে।

পরাগায়ন : মৌমাছির প্রধানতম কাজ হলো উদ্ভিদের ক্রস পরাগায়ন করা। পরাগায়নের ফলে ফল/ফসলের উৎপাদন বাড়ে, স্বাদ বৃদ্ধি পায় এবং ফলের গঠন সুন্দর হয়। তাই আজকাল বাণিজ্যিকভাবে ফল/ফসল উৎপাদনের জন্য উন্নত দেশগুলোতে মৌমাছি ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে এর সম্পর্কে তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কৃষক এবং ফল চাষীরা পরাগায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তবে কিছু ফল বা ফসলের পরাগায়নের জন্যে কোথাও কোথাও পলিনেটর অপরিকল্পিতভাবে হলেও ব্যবহার হচ্ছে: এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পটল, লাউ, মিষ্টি কুমড়া প্রভৃতির পরাগায়নের জন্যে কৃষকরা হস্ত পরাগায়ন করে থাকে।

মৌ-বিষ : সকল স্ত্রী মৌমাছির একটি বিষ থলি থাকে। কোনো পুরুষের তা থাকে না। এসব বিষ বিভিন্ন ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে এ মৌ-বিষ আহরণের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি।

বিভিন্ন এপিয়ারিতে তথ্য নিয়ে জানা গিয়েছে যে *A. cerana* -তে Thai Sac Brood নামে একপ্রকার ভাইরাস রোগ হয়ে থাকে যা হলে সে চাকের ধ্বংস অনিবার্য। এছাড়াও রয়েছে ভেরোয়া মাইট (*Varroa* mite) এবং মোম মথ (Wax moth) এদের আক্রমণও অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। ঠিকভাবে মৌমাছি পালন করতে পারলে আর্থিক সফলতা নিশ্চিত, এ কথা আজ অনেকেই মেনে নিয়েছেন।

মৌমাছি পালনে সমস্যা

মৌমাছি গৃহপালিত প্রাণী নয় তাই এদের পালনের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল হতে হয়। এরা জীবনধারণ, বাসস্থান এবং প্রজননের জন্যে প্রধানত প্রাকৃতিক খাদ্য ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কৃত্রিম পরিবেশে আবদ্ধ করলেই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত কারণে এদের পালনে বিশেষভাবে অসুবিধার সৃষ্টি হয় :

সারণি ৬.৪ : প্রধান প্রধান ফুলের ধরন এবং তাদের ভ্রমণকারীদের একটি সাধারণ চিত্র

কার্য	ফুলের ধরন							
	খোল আকার / বাটি আকার	ঘণ্টাকার	ব্রাশ আকার	পতাকা আকার	গলেট	ট্রাম্পেটাকার	টিউবাকার	ট্রাপাকার
প্রধান প্রচার দৃশ্যমান	দলমণ্ডল (পাঁপড়ি অথবা পুষ্পপুট)	দলমণ্ডল (পাঁপড়ি অথবা পুষ্পপুট)	স্ট্যামেন	স্ট্যান্ডার্ড পেটাল	লিপ	লাইম্ব এবং টিউব	করল টিউব	দলমণ্ডল অথবা পুষ্পপুট
অবতরণ স্থল	সম্পূর্ণ ফুলের যে কোনো অংশ	ফুলের ধার	যে কোনো অংশ	কিল	নিচের লিপ	ফুলের ধার	ফুলের ধার	ফুলের ধার
ধরার স্থান				প্রধানত পার্শ্ব পেটাল	–	–	–	–
গাইডিং মার্ক	নেই (প্রায়)	নেই (প্রায়)	নেই	সিমেট্রি এবং স্ট্যান্ডার্ড -এর উপর মার্ক	নেকটার গাইড	± নেকটার গাইড		রঙের ধরন
গাইডিং স্ট্রাকচার	–	–	–(?)	পুরো ফুলের গঠন	নেই বা লোম : পুরো ফুলের গঠন	পার্শ্ব গঠন, লোম, উঁচু রেখা	সরু নল, আঁশ, লোম	লোম
পরাগের অবস্থান	খোলা	আংশিক গুপ্ত ± মাঝামাঝি	খোলা	গুপ্ত (ভালোভাবে)	গুপ্ত (ভালোভাবে)	± গুপ্ত	ভালোভাবে গুপ্ত	গুপ্ত ভালোভাবে গুপ্ত
নেকটারের অবস্থান		± সুনির্দিষ্ট স্থানে	ছড়ানো	কেন্দ্রীভূত (যদি থাকে)	কেন্দ্রীভূত	কেন্দ্রীভূত	কেন্দ্রীভূত	—
উপহার পরাগ নেকটার	+ + + –	+ +	± +	+ +	+ +	± + +	± + + +	
প্রধান প্রধান পলিনেটর	বিটল, মৌমাছি (non specialized bees) এবং মাছি, মথ, প্রজাপতি	ছোট জিহ্বাযুক্ত মৌমাছি, কোলত, মাছি, মথ, পাখি, বাদুর	মৌমাছি, প্রজাপতি, বিটল, স্তনাপায়ী, পাখি	বড় জিহ্বাযুক্ত মৌমাছি, হক মথ, প্রজাপতি, পাখি	বড় জিহ্বাযুক্ত মৌমাছি, হক মথ, প্রজাপতি, পাখি	প্রজাপতি হক মথ, পাখি	হোভারিং বা পার্চিং মথ, প্রজাপতি, পাখি, লম্বা প্রোবসিসযুক্ত মাছি	ব্যারিওন মাছি, বিটল, ছোট Diptera, (অর্কিড) মৌমাছি

উৎস : Faegri & Pijl (1979)

১. কৃত্রিম পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পারা ;
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ;
৩. পালন পদ্ধতি সঠিক না হওয়া ;
৪. বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আক্রমণ হওয়া ;
৫. মৌ-পদার্থ সঠিকভাবে বিপণন করতে না পারা।

এসব সমস্যা বহুলাংশেই একটি নির্দিষ্ট দেশের না হয়ে একটি অঞ্চলের সমস্যা হিসেবেও দেখা দেয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো উন্নত দেশের উন্নত কৌশল বা পদ্ধতি সব দেশে পৌঁছে না, ফলে কোনো আবিষ্কৃত জ্ঞানসমূহ ব্যবহার হয় না। যতদিন পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান না হচ্ছে সে সময় পর্যন্ত মৌমাছি পালনের উন্নয়ন গতি মন্থর হবে এটিই স্বাভাবিক।

খাদ্যের অভাব ঘটলে এশিয়ার দেশগুলোতে *A. mellifera* এর পালন অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। কারণ এদের সঙ্গে দেশীয় প্রজাতির মৌমাছির খুবই জোরালো প্রতিযোগিতা হয়। এ প্রতিযোগিতায় এরা জয়ী হয় ফলে দেশী প্রজাতিগুলোর বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা উভয়ই উষ্ণমণ্ডলীয় মৌমাছির উৎপাদনকে ব্যহত করে ফলে উষ্ণমণ্ডলীয় এশিয়ার মধু উৎপাদন কম হয়, সে তুলনায় শীতপ্রধান এশিয়ার দেশগুলোতে মধুর উৎপাদন বেশ ভালো হয়, যদি অন্যান্য রোগবালাই আক্রমণ না করে। এ ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের উপদ্রব রয়েছে, যেমন জাপানে দেখা গিয়েছে যে, এখানে মৌমাছিগুলোকে *Vespa mandarinia* নামক বোলতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাংলাদেশে মৌমাছি পালকদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে ফিঙ্গে, বিইটার ইত্যাদি পাখি *A. cerana* এর কর্মীগুলোকে খেয়ে ফেলে। এছাড়া Thai Sac brood ও *A. cerana*-র জন্য হুমকিস্বরূপ।

Varroa jacobsoni যা *A. cerana* তে আক্রমণ করে এরা *A. mellifera*তে সংখ্যায় বেশি উৎপন্ন হয় তাই এদের আক্রমণ মৌমাছি পালনের জন্য এক বিরাট হুমকির কারণ। *Tropilaelapus clareae* হলো *A. dorsata* এর প্যারাসাইট কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে *A. mellifera* তেও যথেষ্ট আক্রমণ করে থাকে। মৌচাকে Sac brood এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এটি সাধারণভাবে *A. cerana*-র ক্ষতির কারণ হলেও এটি *A. mellifera* কে সহজেই সংক্রামিত করতে পারে।

মৌচাককে শক্তিশালী রাখতে হলে বিশেষ করে যখন প্রচুর পরিমাণে ফুল থাকে না সে সময় চিনির সিরাপ দেয়া বাঞ্চনীয়। আর যেহেতু চিনির মূল্য বেশি তাই মৌমাছিকে প্রচুর খাওয়ানো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে *A. cerana* পালনের যুৎসই পন্থা আবিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় (সারণি ৬.৫)। এদের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার, বালাইয়ের আক্রমণ রোধ ইত্যাদি

বিষয়গুলো দেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ সম্বন্ধে এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং তথ্যের অভাব রয়েছে, ফলে এখানে মৌমাছির পালন শুধু মৌমাছি পালকদের হাতে-কলমে লব্ধজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই অগ্রসর হচ্ছে, সঙ্গত কারণেই এখানের মৌমাছি পালনের কৌশল অত্যন্ত সেকেলে।

সারণি ৬.৫ : *A. cerana* মৌমাছি পালনে সমস্যা

বাহ্যিক কারণ	❑ এরা *A. mellifera*–এর সাথে খাদ্যের জন্যে প্রতিযোগিতা করে ; ❑ বিভিন্ন রোগে সহজেই আক্রান্ত হয় (Thai Sac brood, European foul brood, etc.) ; ❑ জননের সময় *A. mellifera* এর সাথে প্রতিযোগিতা করে ।
অভ্যন্তরীণ কারণ	❑ এদের কলোনি ছোট ; ❑ আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণে শারীরিক আকার ছোট–বড় হয় ; ❑ সামান্য নড়াচড়ায় ক্ষেপে যায় ; ❑ পালন কষ্টকর এবং কলোনি বিভাজন কষ্টকর ; ❑ খুব কম মোম উৎপন্ন করে।
উৎপাদিত পদার্থ	❑ রয়েল জেলি উৎপাদন সম্ভব নয় ; ❑ প্রোপলিস সংগ্রহ করে না ; ❑ মোমের অম্লত্ব (অ্যাসিডিটি) কম।

এককালে আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের তেলবীজ যেমন—সরিষা, তিল, তিষি ইত্যাদির চাষ করা হতো এখন তা আর সে পরিমাণে করা হয় না। এর পরিবর্তে এসেছে বিভিন্ন জাতের ধান, আলু এবং সবজি। তেলবীজের উদ্ভিদ মৌমাছির খাদ্য নেকটার এবং পরাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর চাষ এখন অত্যন্ত সীমিত পরিবেশেই হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাকৃতিক গাছপালা, লতা-গুল্ম অনেক কমে গিয়েছে। ফলে মৌমাছির খাদ্যের উৎস একেবারেই কমে গিয়েছে। যার কারণে মৌমাছির সংখ্যাও কমে গিয়েছে।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র চীন মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। *A. mellifera* –এর সাহায্যে মধু উৎপাদন হয়ে থাকে। সেখানে মৌমাছি পালনের সমস্ত উপকরণ অত্যন্ত সস্তা যার ফলে তারা অনায়াসে মধু উৎপাদন করতে পারে। আর যেহেতু কম দামে মধু বিক্রি করতে সক্ষম তাই এরা আন্তর্জাতিক বাজারেও বেশ ভালো একটা সুযোগ করে নিয়েছে। কিন্তু এদের মধুর মান কিছুটা নিম্ন। মধুর মান বাড়াতে হলে প্রয়োজন মৌ-চাষীদের কর্ম তৎপরতা বাড়ানো, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানো। এটা করতে পারলেই মৌ-পদার্থের মান উন্নয়ন সম্ভব

সপ্তম অধ্যায়

এশিয়ার মৌমাছি

মৌমাছি নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। কিছুদিন পূর্বেও মৌমাছির চারটি প্রজাতি রয়েছে বলে ধারণা করা হতো। কিন্তু আজ সে ধারণা বদলেছে, আবিষ্কৃত হয়েছে নয়টি প্রজাতির। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মৌমাছি পাওয়া যায় নেপালে। এটি *Apis* –এর সবচেয়ে বড় প্রজাতি *A. laboriosa* (সারণি ৯.১)। এসব মৌমাছির নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণের জন্য শুধু দৈহিক গঠনের উপর নির্ভর করা হয় নি, বরং এদের ব্যবহার এবং কৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করা হয়েছিলো। আর সে কারণেই *A. laboriosa* কে *A. dorsata* থেকে এবং *A. andreniformis* কে *A. florea* থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক একইভাবে *A. koschevnikovi* (লাল মৌমাছি) কে *A. cerana* থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে এ তিনটি প্রজাতি যুক্ত হয়ে গেলো *Apis* গণের সঙ্গে। এরপরে *A. nigrocincta* কেও আলাদা করা হলো *A. cerana* থেকে। এমনি করে *A. koshchevnikovi* যেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে *A. nuluensis* কে পাওয়া গেলো।

একটি মজার বিষয় হলো ৮টি *Apis* প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যাচ্ছে। কেবল একটি প্রজাতি পাওয়া যায় ইউরোপে। এই তথ্য থেকেই বোঝা যায় এশিয়ার মৌমাছি পালনের সুযোগ কতখানি ব্যাপক। কিন্তু এ পর্যন্ত যতগুলো প্রজাতির বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে তার একটিই সর্বাধিক সাফল্য পেয়েছে সেটা হলো *A. mellifera*। পৃথিবীর সকল দেশই এটিকে একটি বাণিজ্যিক প্রজাতি হিসেবে মধু উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করছে। বাংলাদেশেও এই মৌমাছিকে মৌমাছি পালনের প্রধান লক্ষ্য করে কাজ শুরু করেছে কিছু সংস্থা। নিচে বিভিন্ন প্রজাতির *Apis*–এর একটি বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. বড় মৌমাছি (*Apis dorsata*)

এটি একটি বড় আকারের মৌমাছি (Giant bee, Rock bee)। বাংলাদেশ, ভারত এবং অন্যান্য দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশে পাওয়া যায়। এরা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় গাছের ডাল, দালানের কার্নিশ, পানির ট্যাঙ্কের বিমের তলা প্রভৃতি স্থানে চাক বাঁধে। এরা একটিই কোম্ব তৈরি করে যেটা লম্বায় প্রায় ১.৫ মিটার এবং উচ্চতায় ০.৫ মিটার হতে পারে। অনেক সময়ই দেখা যায় একই অবস্থানে (যেমন একটি গাছে, ঘরে বা দালানে) অনেকগুলো চাক একসঙ্গে বেঁধেছে এবং এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বিবাদ বিতণ্ডা নেই। তবে ভীষণ রাগী এরা। কোনো কারণে রেগে গেলে এরা ভয়ানক হয়ে ওঠে। আজ পর্যন্ত এদের ব্যবস্থাপনা করা যায় নি। এদের থেকে মধু, মোম ইত্যাদি সবই সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক চাক থেকে। অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায় *A. dorsata* থেকে মধু আহরণ শুরু

হয়েছিলো আজ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬,০০০ বছর আগেই (Yoshida, 1999)। মধু কিভাবে সংগ্রহ করা হয় এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে শস্য পরাগায়নে *A. dorsata*-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেও এ ব্যাপারে এদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরা বিভিন্ন ফসল ও ফলের সার্থক পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে, যার সরাসরি কোনো তথ্য না থাকলেও এদের উপস্থিতি এবং শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দেখেই তা বোঝা যায়।

২. কালো বড় মৌমাছি (*Apis A. laboriosa*)

কিছুদিন পূর্বেও একে *A. dorsata* বলেই মনে করা হতো। প্রফেসর সাকাগামী সে সন্দেহ দূর করে প্রমাণ করেছেন যে, না এটি *A. dorsata* নয় বরং নতুন প্রজাতি। এর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটি ছিলো সেটা হলো এ দুটো প্রজাতির মধ্যে ইকোলোজিক্যাল পার্থক্য। এরা *A. dorsata* এর চেয়ে অনেক উঁচু পরিবেশে চাক বাঁধে, যেমন হিমালয় পর্বতের অতি উচ্চ স্থানে অর্থাৎ প্রায় ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ মিটার উচ্চতায় এদের পাওয়া যায় যেখানে *A. dorsata* সাধারণত যায় না। আর একটি পার্থক্য হলো এদের পেছনের অংশ (dorsal abdomen) বেশ কালো। এ পর্যন্ত নেপালেই এদের বেশি পাওয়া গিয়েছে। সুউচ্চ পাহাড়ের ঢালের নিচে এদের বিরাট আকৃতির একাধিক চাক একসঙ্গে থাকার চিত্র পাওয়া গিয়েছে। এরা অত্যন্ত ভয়ানক, খুব অল্পতেই রেগে যায়। নেপালের মৌয়ালরা প্রচুর মধু ও মোম এর থেকে সংগ্রহ করছে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত *Apis* প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া গিয়েছে এটিই সবচেয়ে আকারে বড় বলে জানা গিয়েছে।

৩. বামন মৌমাছি (*Apis florea*)

এত সুন্দর মৌমাছিটিকে কেন যে বামন মৌমাছি (dwarf honey bee) নাম দেয়া হলো সেটা আশ্চর্যের মনে হয়। চমৎকার দেখতে এর রং। শান্ত, ভদ্র এবং অত্যন্ত সুস্বাদু মধু উৎপন্ন করে। আজ থেকে ২-৩ দশক পূর্বে সারা বাংলাদেশ জুড়েই এদের পাওয়া যেতো। ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলেই এদের বাসা অহরহ দেখা যেত। এখন কদাচিত পাওয়া যায়। এদের শান্ত স্বভাবের কারণে অশান্ত মানুষেরা নির্বিচারে চাক ভেঙে এদের বিস্তার রোধ করে দিয়েছে। তদুপরি বৃক্ষ নিধন এবং এদের বাসস্থানের পরিবেশের অভাবের কারণেও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদের সংখ্যা। যে কেউ রাতের অন্ধকারে চাক ভেঙে মধু নিয়ে আসতে পারে। এরা ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়, আম গাছ ইত্যাদিতে চাক বাঁধে। চাকের আকার কিছুতেই একটি জাম্বুরা বা তালের চেয়ে বড় হয় না। তবে রেজিন এবং গাছের ডাল পাতা দিয়ে বেশ মজবুত করেই চাক তৈরি করে। পিপড়া বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে চাক রক্ষা করার জন্যে চাকের গোড়ায় আঠালো রেজিন মেখে রাখে।

A. dorsata যেসব দেশে পাওয়া যায় মোটামুটি সেসব দেশেই *A. florea* কে পাওয়া যায় তবে কিছু কিছু দেশে এদের কলোনির কৃত্রিম উৎপাদন করা হয় বিক্রির জন্যে, যেমন— থাইল্যান্ড, ভারত, ওমান প্রভৃতি দেশে। থাইল্যান্ডে এদের কলোনি বাঁশের ভিতর বড় করা

হয় এবং সেগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়। এরা গাছের গর্তে কিংবা পাথরের ফাটলে, দালানের ফাটলে ইত্যাদি অবস্থানে বাসা তৈরি করে। এদের চাকের উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে সম্ভব হয় নি।

৪. কালো ছোট মৌমাছি *(Apis andreniformis)*

এদেরকে ১৯৮৭ সালে চীনের একটি অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিলো। এছাড়া থাইল্যান্ডেও এদের পাওয়া গিয়েছে। *Apis* মৌমাছির মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের মৌমাছি এটাই। এদের রং কালো হয় এবং এরা একটি কোল্পেই মধু জমা করে। এখন পর্যন্ত এপিকালচার সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে এদের এখনো পাওয়া যায় নি।

৫. এশিয়ান মৌমাছি *(Apis cerana)*

বাংলাদেশ, ভারত, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে এশীয় মৌমাছি পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে Sub-speciesটি রয়েছে তার নাম হলো *A. cerana indica*। এ ছাড়াও এর নিচের Sub-species গুলো রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাওয়া যায়।

১. *A. c. cerana* চীনে পাওয়া যায়;

২. *A. c. japonica* জাপানে পাওয়া যায়;

৩. *A. c. himalaya* হিমালয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

A. cerana বাণিজ্যিকভাবে একটি লাভজনক প্রজাতি। এর বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্ভব। তবে লাভের পরিমাণ *A. mellifera* এর চেয়ে কম। এরা গাছের কোটরে, মাটির গর্তে, দালানের ফাটলে ইত্যাদি পরিবেশে বদ্ধ কোষবিশিষ্ট চাক তৈরি করে এবং বাক্সেও রাখা যায়। মধু উৎপাদন *A. mellifera* এর চেয়ে কিছু কম। শস্য পরাগায়নে এদের ভূমিকা অনন্য। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পরিবেশে এখনো এদের অনেক চাক পাওয়া যায়। কৃত্রিম প্রজনন এখনো হয় নি এখানে, ফলে মৌমাছি পালনের উদ্দেশ্যেও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে চাক বাক্সে রাখা হয়। একটি সমস্যা হয়েছে এই যে, এর চাকে নানা ধরনের রোগবালাই আক্রমণ করে এবং সেটা এর উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (যেমন, Thai Sac Brood, *Varroa jacobsoni)*।

A. cerana পালনের ইতিহাস জানা গিয়েছে চীনে ১৫৬ - ১৬৭ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশে এর সূচনা হয়েছে মাত্র দুই দশক আগে, কিন্তু এখনো তেমন প্রসার লাভ করে নি তবে জনমনে এরই মধ্যে এর ধনাত্মক প্রভাব পড়েছে।

৬. লাল মৌমাছি *(Apis koschevnikovi)*

এটি *A. cerana*-এর চেয়ে একটু বড় আকৃতির। শরীর লাল তামাটে রঙের। ১৯৮৮ সালে পূর্ব মালয়েশিয়ার সাবায় এদেরকে পাওয়া গিয়েছিলো। মালয়েশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও এর পাওয়ার কথা এখনো জানা যায় নি। আর মৌমাছি পালনে এর গুরুত্ব কতটুকু তাও এখনো জানা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে এর কোনো সন্ধান এখনো মেলে নি।

৭. নাইগ্রোসিঙ্কটা মৌমাছি *(A. nigrocincta)*

এটি ১৯৯৮ সালে সুলাওয়েসি দ্বীপে (Sulawesi Island) পাওয়া গিয়েছে। *A. cerana* এর সঙ্গে এর অনেকটা মিল রয়েছে তবে জনন উড্ডয়ন (mating flight) এবং জনন প্রক্রিয়া আলাদা হওয়ার কারণে এটিকে একটি নতুন প্রজাতি বলে গণ্য করা হয়।

৮. নুলুয়েনসিস মৌমাছি *(A. nuluensis)*

এটিও অনেকটা *A. cerana* এর মতোই তবে জনন প্রক্রিয়া আলাদা হওয়া এবং অন্যান্য কৌলিক (genetic) বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্যেই এটিকে আলাদা প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে পাওয়া যায় পূর্ব মালয়েশিয়ার সাবাহ নামক অঞ্চলে এর বিস্তার খুবই নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ।

এশীয়ান মৌমাছির বাস্তব্যতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য

সারা পৃথিবীতেই মৌমাছি পালন একটি অতি সমাদৃত গবেষণা যার থেকে বিপুল অর্থনৈতিক সহায়তা পাওয়া যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে বিশেষ উন্নয়ন সাধন করেছে। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলো এ ব্যাপারে কাজ করার চেষ্টা করছে। কারণ একটিই, তাহলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি যে প্রজাতিটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেটি হলো *A. mellifera*। সারা পৃথিবীতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এপিকালচারের উদ্দেশ্যে যদিও এর উৎপত্তি ইউরোপে। সমস্যা হয়েছে একটি, তাহলো অনেক দেশেই এটি প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে (naturalized) এবং প্রাকৃতিকভাবে বংশবৃদ্ধি শুরু করেছে (Saski, 1999)। যার ফলে খাদ্য ও বাসস্থান (food & habitat) ভাগাভাগি করার কারণে প্রকৃতির অন্যান্য মৌমাছি/কীটপতঙ্গের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাগাভাগি অনেক সময় স্থানীয় প্রজাতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এমনও হতে পারে সেসব প্রাণীর বিলুপ্তি পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই প্রত্যেকটি দেশের উচিত স্ব-স্ব দেশের প্রজাতিকে ব্যবস্থাপনা করার চেষ্টা করা।

সময়, খাদ্যের প্রাচুর্য এবং নিরাপদ পরিবেশ কম উৎপাদনশীল *A. cerana* কেও অনেক সমৃদ্ধশালী এবং অধিক উৎপাদনশীল করতে পারে। তা অনেক সমীক্ষা থেকেই দেখা গিয়েছে। যেমন, একটি এশীয়ান মৌমাছির কলোনি ঠিক ফুলের মৌসুমে অধিক মধু আহরণ করে। এক্ষেত্রে জানা গিয়েছে যে, তা কিছুতেই ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ নয়। শুধু তাই নয় সব দিক ঠিক থাকলে এদের কর্মী সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।

সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো এশীয়ান মৌমাছিরা ফুলের ব্যাপারে অত্যন্ত খেয়ালি। এদের পছন্দের তালিকা অনেক বড় এবং যে কোনো ফুলে ভ্রমণে এরা পছন্দ করে, যা *A. mellifera* ও করে থাকে। তবে *A. mellifera* বাগানের ফুলে এবং রোপণ করা উদ্ভিদে বেশি ভ্রমণ করে আর *A. cerana* বন্য ফুলে বেশি যায়। এদের ভ্রমণ দূরত্ব (foraging range) *A. mellifera*-এর চেয়ে কম। যেসব কারণে মৌমাছি পালকরা *A. cerana*-এর পরিবর্তে *A. mellifera* কে পছন্দ করে সেগুলো নিম্নরূপ :

১. এদের বিভিন্ন রোগের আক্রমণ খুব বেশি (Thai Sac Brood, ইউরোপিয়ান ফাউল ব্রুড ইত্যাদি) ;
২. কলোনি ছোট ;
৩. অল্প নাড়া-চাড়াতেই রেগে ওঠে ;
৪. শারীরিক আকার ছোট ;
৫. পলায়ন করার (swarming and absconding) প্রবণতা বেশি ;
৬. পালনে জটিলতা বিশেষ করে রানি সংযোজনে ;
৭. কম মোম উৎপাদন ;
৮. কৃত্রিম প্রজনন কঠিন ;
৯. কর্মীদের ডিম পাড়ার প্রবণতা ;
১০. মধু খেয়ে ফেলা ;
১১. মধু সংগ্রহের দূরত্ব কম (foraging range short);
১২. কম রানি উৎপাদন ;
১৩. প্রোপালিস সংগ্রহ করে না ;
১৪. রয়েল জেলি উৎপাদন অপ্রতুল এবং মোমের অম্লত্ব বা অ্যাসিডিটি কম (ফলে মোমের মান নিম্ন হয়ে থাকে)।

বাস্তব্যতন্ত্রে (Ecosystem) বিদেশি প্রজাতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় কাশ্মীরে। কাশ্মীরে *A. mellifera* ব্যবহার করার কারণে সেখান থেকে *A. cerana* বিলীন হওয়ার পথে। বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু প্রতিষ্ঠান *A. mellifera* মৌমাছি পালনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি স্থানীয় *A. cerana* এর ভাগ্যে কি রাখতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অতএব, এ ব্যাপারে যেকোনো কাজই হোক খুব চিন্তা করেই করতে হবে।

রয়েল জেলি

রয়েল জেলি হলো কনিষ্ঠ কর্মীদের (Young nurse worker) মাথায় অবস্থিত দুটি গ্রন্থি– হাইপোফ্যারিঞ্জিয়াল গ্রন্থি ও ম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (hypopharyngeal glands and mandibular glands) থেকে নিঃসৃত রস। যেসব লার্ভাকে প্রচুর পরিমাণে রয়েল জেলি খাওয়ানো হয় এরাই পরবর্তীতে নতুন রানিতে পরিণত হয়। একটি কলোনিতে রয়েল জেলি প্রস্তুত করা যায় এক ধরনের কুইনসেল সৃষ্টি করে (প্লাস্টিক কাপ)। সেখানে লার্ভাকে স্থানান্তর করলে সেসব কাপে কর্মী মৌমাছিরা রয়েল জেলি জমা করে যা পরবর্তীতে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েল জেলি একধরনের স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে খাওয়া হয়, যার রয়েছে মধুর সমপরিমাণ চাহিদা। রয়েল জেলি উৎপাদনে কয়েকটি দেশ বেশ এগিয়ে আছে যেমন—জাপান, চীন, তাইওয়ান ইত্যাদি।

রয়েল জেলিতে আছে প্রোটিন এবং ১০ হাইড্রোক্সিডেসেনোয়িক অ্যাসিড (protein and 10 hydroxydecenoic acid)।

অষ্টম অধ্যায়

আফ্রিকান মৌমাছি

অনেকেই মৌমাছিকে সোনালি পতঙ্গ (golden insect) বলে থাকে। একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া সারা পৃথিবী জুড়েই মৌমাছি রয়েছে। আফ্রিকাতে রয়েছে প্রচুর মৌমাছি এবং অমৌমাছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রাকৃতিক মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়। আফ্রিকাতে মৌমাছি পালনের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথমেই বলতে হয় মিশরের কথা। শুধু আফ্রিকাই নয় এ ইতিহাস সারা পৃথিবীর ইতিহাসও বটে। এছাড়া রয়েছে কেনিয়া এবং তানজানিয়া। অন্যান্য অনেক দেশেই মৌমাছি পালনের উদ্দেশ্যে নানান ধরনের পরিকল্পনার প্রচেষ্টা চলছে। তবে তেমন উন্নয়ন ঘটাতে পারে নি। কারণ এ সম্পর্কে ভালো কোনো তথ্য নেই সেসব দেশে এবং এদের প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়েছে।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো এসব দেশে মধু সংগ্রহ করা হয় আগুন ও ধুয়া দিয়ে। ফলে সেখানে মারা পড়ে অজস্র মৌমাছি, বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম আফ্রিকাতে যেভাবে মধু সংগ্রহ করা হয় সেটা নিঃসন্দেহে অমানবিক বলা যায়। এরা পুড়িয়ে সমস্ত চাকটি শেষ করে দেয়। কোনো কোনো আদিবাসীরা আবার কোশ্বের ভিতরের লার্ভাগুলোও খেয়ে থাকে। যেটা এশিয়ার অনেক দেশেই জানা নেই। এ পোড়ানোর ফলে সর্বদাই কলোনির কেন্দ্রবিন্দু নতুন রানি এবং মা উভয়েই মারা যায় ; ফলে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক মৌচাকের সংখ্যা কমছে। এ ধরনের মৌমাছির মধু সংগ্রহ করাকে তুলনা করা চলে, সেই কৃষকের সাথে যে বেশি সোনার ডিম পাওয়ার জন্যে তার সোনার হাঁসের পেট কেটে ফেলেছিল।

মধু সংগ্রহকারীরা সম্পূর্ণ কোশ্বটিকে গরম করে গলিয়ে ফেলে এবং পরে এগুলোকে ঠাণ্ডা করে মধু রেখে দিয়ে মোমগুলো ফেলে দেয়। ফলে সেসব দেশ এবং মধু সংগ্রহকারীরা উভয়েই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুঃখজনক হলেও এ ধরনের কাজ এখনো চলছে।

আরও একটি মারাত্মক ব্যাপার হলো মধু সংগ্রহকারীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করার সময় যে মোচায় আগুন ধরায় সেটা বনের ভিতরে যেখানে সেখানে ফেলে দেয়। বাতাসে এবং গরমে সে আগুন তেতে উঠে আস্তে আস্তে নিকটবর্তী শুকনো পাতায় ধরে যায়। একপর্যায়ে সমস্ত বনের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে এমনি করে আগুন ছড়িয়ে অনেক সময় মাইলের পর মাইল বন পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এতে বিরাট ক্ষতি হতে পারে প্রকৃতির এবং জীববৈচিত্র্যের। এভাবে বৃক্ষের ক্ষতির ফলে সেখানে এমনি করে মরুভূমিরও সৃষ্টি হতে পারে। কারণ সে এলাকা এমনিতেই গরম এবং মরুভূমির নিকটস্থ তাই সে ছোয়া লেগেই যায়। এসব কর্মগুলো মৌমাছি সংগ্রহকারীরাই করছে অথচ সেখানকার সরকার এখনোও এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ তৈরি করে নি (পশ্চিম

আফ্রিকা)। এখানকার দেশগুলো মৌচাষের জন্যে অতি উপযোগী হওয়ার পরেও সরকাররা মৌচাষের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এখানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মধু এবং মোম দুটোই পাওয়া যায় এর সঙ্গে আরও রয়েছে প্রোপলিস।

মৌচাক পুড়িয়ে মধু সংগ্রহের ইতিহাস অতি প্রাচীন। অনেকের মতে কয়েক হাজার বছর পূর্বের এ অভ্যাস (FAO, 1990)। এ ধরনের কিছু তথ্য ড. ইভা ক্রেনের *Book of Honey* (1980) নামক গ্রন্থে আছে। আজ পর্যন্তও এ ধারা বয়ে চলেছে সেটা আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। পৃথিবী কোথায় এগিয়ে এসেছে, আর এমনি এক কল্যাণময় বিষয় প্রাচীনতম সভ্যতায় পড়ে রয়েছে। এ ধরনের নির্মম কর্মকাণ্ড বন্ধ করা প্রয়োজন। আধুনিক মানুষ আধুনিক উপায়ে মৌচাষ করবে প্রকৃতির কোনোরকম ক্ষতি না হয় সেটাই স্বাভাবিক।

আফ্রিকাতে মৌমাছি পালনের প্রয়োজনীয়তা

বস্তুত মধু আর মৌমাছি অর্থের যোগান দেয় এবং প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি করে। উদ্ভিদের বিবর্তনে মৌমাছির অবদান দু'এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। শস্য উৎপাদনে মৌমাছি কি ভূমিকা রাখে তার উপলব্ধি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো করেছে এবং এর সুফল তারা ভোগ করছে। এতো হলো অর্থ এবং প্রকৃতির কথা। মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? মৌমাছি মানুষকে দিচ্ছে সুস্বাদু, অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য মধু আর রোগ নিরাময়ে ওষুধ তৈরির সামগ্রী। অনেক প্রাণীও এ সুযোগ নিচ্ছে। মানুষ তার পুষ্টিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে মৌমাছি চাষ করে। মধু আর মোম ছাড়াও বিভিন্ন রকমের উপকার মৌমাছি থেকে পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

১. মৌমাছিকে পালনের জন্য কৃত্রিম খাবার দিতে হয় না;

২. উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে ফুল উৎপন্ন করে। সেখানে থাকে অফুরন্ত নেকটার আর পরাগ যেগুলো মৌমাছি ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। আর মৌমাছি সে নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো পদার্থগুলো সযতনে সংগ্রহ করে অর্থ উপার্জনে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে;

৩. মৌমাছি ব্যবহৃত হলে মহিলা, বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সংঘ অর্থ উপার্জনের ভিন্ন পথ সৃষ্টি করতে পারবে।

৪. দেশীয় সরঞ্জামেই মৌমাছি পালন করা সম্ভব এবং স্থানীয় মানুষদের এ প্রযুক্তি স্থানীয়ভাবে জানা আছে বিধায় সামান্য চিন্তা এবং পরিশ্রমে এর উন্নয়ন করা যায়;

৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি মৌমাছি করে, তাহলো উদ্ভিদের প্রজননে (reproduction) সাহায্য করা—পরিবেশতন্ত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে;

৬. মৌমাছি থেকে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলো সবই প্রাকৃতিকভাবেই অত্যন্ত সুরক্ষিত;

৭. মৌমাছির মাধ্যমে পরাগায়ন না হলে অনেক উদ্ভিদের ফলন ব্যাহত হয় বা কম হয়।

৮. মৌমাছি পালনের জন্য কোনো অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না, শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করলেই চলে।

মৌ-পদার্থ এবং ব্যবহার

মধু : ভালো এবং পরিপক্ব (mature) মধু সাধারণত বন্ধ কুঠুরির (sealed combs) মধ্যে থাকে, যা দীর্ঘ দিন ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। খোলা কুঠুরির (unsealed honey) মধু সাধারণত পরিপক্ব হয় না ফলে সংগ্রহ করার পর তাতে গাজন (fermented) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মোম : মোম প্রকৃতপক্ষে মৌমাছির দেহ নিঃসৃত পদার্থ যা দিনে গরমের সময় বের হয়। মৌমাছিরা এই মোম তাদের চাক বানাতে ব্যবহার করে। এক কেজি মোম তৈরি করতে মৌমাছিদের ৮—১৫ কেজি মধু খেতে হয় (FAO, ১৯৯০)। পৃথিবীর অনেক দেশই কিভাবে মোম সংগ্রহ করতে হয় তা জানে না। পশ্চিম আফ্রিকাতে মউয়ালেরা মধু সংগ্রহ করার পর মোম ফেলে দেয়। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো মোম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে খুব সামান্যই মোম উৎপাদিত হয় তাই তারা উষ্ণমণ্ডলীয় দেশ থেকে মোম আমদানি করে। মোমের ১২০ প্রকার শিল্প ব্যবহার আছে। এর চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে ইথিওপিয়া, কেনিয়া এবং তানজানিয়া বেশিরভাগ মোম রপ্তানি করে।

প্রোপলিস : আফ্রিকান মৌমাছিরা প্রোপলিস সংগ্রহ করে, যেগুলোর রং সবুজাভ কালো এবং আঠালো ধরনের। মৌমাছিরা নিম্নোক্ত কারণে প্রোপলিস ব্যবহার করে :

১. মৌচাকে কোনো ফাটল ধরলে ;
২. প্রবেশ পথ সরু করতে ;
৩. চাককে পানি নিরোধক করতে ;
৪. চাক যেখানে ঝুলে আছে সে অবস্থানকে আরও মজবুত করতে ;
৫. মৌ-কুঠুরির পাতলা ধারগুলোকে মজবুত করতে ;
৬. বড় আকারের যেসব প্রাণীকে চাক থেকে সরাতে পারে না, তাদের দেহ আবৃত করতে।

প্রোপলিসের নানান রকমের ব্যবহার রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো যেমন বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে এবং ওষুধ প্রস্তুত করতে (Hannan, 1998)।

পরাগ : ফুলের পরাগ সংগ্রহ মৌমাছির এক অন্যতম কাজ এদের বর্ধনশীল লার্ভার জন্যে যা এরা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে সংগ্রহ করে আনে এবং মৌ-কুঠুরির বিভিন্ন কোষে জমা করে রাখে।

মৌমাছি পালকরা মৌমাছির কারবিকিউলি থেকে এ পরাগ সংগ্রহ করে খুব সহজেই ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে রাখতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের ব্যবহার্য ওষুধ তৈরিতে পরাগের ব্যবহারের কথা জানা যায়।

রয়েল জেলি : এটাকে মৌমাছির দুধ (Bee milk) ও বলা হয়। সাধারণত রয়েল জেলি খাওয়ানো হয় রানিকেই। আর খাওয়ানো হয় সকল লার্ভাকে যখন এদের বয়স ১-৩ দিনের

মধ্যে থাকে। কিন্তু ৩ দিনের পর আর কোনো সাধারণ লার্ভাকেই খাওয়ানো হয় না। শুধু রানি হবে যে লার্ভা সেটাকে খাওয়ানো হয়। রয়েল জেলি পাওয়া যায় কর্মীদের দেহ থেকে। ৫—১৫ দিন বয়সের কর্মী মৌমাছির মাথায় অবস্থিত একটি গ্রন্থি থেকে এ জেলি নিঃসৃত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে রয়েল জেলিতে প্রচুর ভিটামিন বি রয়েছে। পরাগের মতো রয়েল জেলিরও প্রচুর ঔষধি গুণ আছে, ফলে বিভিন্ন ওষুধ তৈরিতে এর ব্যবহার রয়েছে। এ বিষয়ে যতদূর জানা গিয়েছে যে শুধু চীনেই ১০০ টন রয়েল জেলি মানুষ খেয়ে থাকে। চাইনিজরা রয়েল জেলি দিয়ে চকলেট, ক্যান্ডি এবং মদ তৈরি করে। এছাড়া লোশন, টনিক এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসায়ও ব্যবহার করে।

মৌ-বিষ : বিষ মৌমাছিরা ব্যবহার করে শুধু আত্মরক্ষার এবং তাদের চাককে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য। মজার ব্যাপার হলো এ বিষ পুরুষের নেই রয়েছে শুধু রানি এবং কর্মীর। বিষ জমা থাকে একটি বিষ থলিতে, যা একটি হুলের সাথে সংযুক্ত। বিষ না থাকলে মৌমাছিরা অন্যান্য প্রাণীর হাত থেকে হয়তো কষ্টার্জিত এ মধু রক্ষা করতে পারত না। বাংলাদেশে *Apis* এর যে কয়টি প্রজাতি রয়েছে তার মধ্যে *A. dorsata* মৌমাছিটিই সবচেয়ে রাগী, *A. cerana*টি মোটেও সমস্যা নয় আর *A. florea* তো নয়ই। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ানক মৌমাছি হলো আফ্রিকান মৌমাছি। এদের হুলের আঘাতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মৌ-বিষের প্রধান দুটি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে : কোনো স্থান অবশ করার কাজে, যারা মৌ-বিষে খুব বেশি কাতর হয় তাদের জন্য এটা বেশ ভালো কাজ করে এবং বাতজনিত রোগের চিকিৎসায়।

পরাগায়ন : আজকাল মৌমাছি পালনের উদ্দেশ্য অনেকটা পাল্টেছে। উন্নত বিশ্বে অনেকেই মৌমাছি পালন করেন মধু এবং মোম তৈরির উদ্দেশ্যে নয় বরং পরাগায়নের উদ্দেশ্যে। অনেক ফল/ফসল আছে যেগুলো মৌমাছির পরাগায়ন ছাড়া উৎপাদিত হয় না বা কম হয়। Hambleton (১৯৫৪) বলেছেন মৌমাছির পরাগায়ন করালে উৎপাদন ১০-২০ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে মাইগ্রেটরি বি কিপিং (migratory bee keeping)। বাংলাদেশের কিছু প্রতিষ্ঠান এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আমেরিকার কিছু কিছু মৌমাছি পালক আছে যারা বাক্স ২৫০০ কি. মি. এর বেশি দূরে বহন করে নিয়ে যায় পরাগায়ন কাজের জন্যে এবং এ জন্য এরা প্রচুর অর্থও নিয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকাতে মৌমাছির বিনাশ সবচেয়ে বেশি। সেখানে প্রকৃতিতে বন্য মৌমাছি পাওয়া মুশকিল। সাধারণ মানুষ মৌমাছি সম্পর্কে নির্বিকার তবে কেউ কেউ উপলব্ধি করছে যে, মৌমাছি পালন করলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে।

মৌমাছি পালনের স্থান

আফ্রিকাতে বাণিজ্যিক উপায়ে মধু ও মোম উৎপাদনের জন্যে সাভানা (Savannah) এবং সেমি-অ্যারিড ল্যান্ড (Semi-arid lands) ব্যবহার করা হয়। এ সকল এলাকায় খুব কমই বৃষ্টিপাত হয় (১২৫-১২৫০ মিমি.)। উষ্ণমণ্ডলীয় পাতাঝরা অরণ্যও মৌমাছি পালনের জন্য

সহায়ক, যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১২৭৫–১৮৭৫ মিমি.। এখানকার যেসব উদ্ভিদের মৌমাছির পরাগায়ন দরকার সেগুলো হলো কফি, কোলা, পাম অয়েল এবং নারকেল। সেখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২০০০–১০,০০০ মিমি., বিষুব রেখার চিরসবুজ বাদল অরণ্য মধু উৎপাদন সুবিধাজনক নয়।

আফ্রিকান মৌমাছি পালন

১৯৬০–এর দশকে ঘানাতে প্রথম মৌমাছি পালন প্রকল্প শুরু হয় Caucasian এবং Italian গুন সম্পন্ন মৌমাছি দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল ভয়ানক উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকার মৌমাছিকে সরিয়ে একে ব্যবহার করা, যদিও সে প্রকল্প সার্থক হতে পারে নি। সরকারি পর্যায়ে মৌমাছি পালন সেখানেই থেমে গিয়েছিল, কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আবার মৌমাছি পালন প্রকল্প চালু করেছে বিশেষত, উষ্ণমণ্ডলীয় মৌমাছি *A. mellifera adansonii* দিয়ে। যেটা আফ্রিকার প্রতিবেশ সাপেক্ষে উপযুক্ত হতে পারে। এটাও আক্রমণাত্মক কিন্তু একটা বিশেষ গুণ হলো এরা প্রচুর মধু জমা করে ফলে এদেরকে শীতমণ্ডলীয় মৌমাছির মতো কৃত্রিম খাবার দিতে হয় না। সত্যি বলতে সব মৌমাছিই হুল ফুটায়, তবে আফ্রিকান মৌমাছিরা অধিকতর আক্রমণাত্মক। এ কারণে এদের পালন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আফ্রিকান মৌমাছি *A. m. adansonii* এবং ইউরোপীয় মৌমাছি *A. m. mellifera*–এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

১. ইউরোপীয় মৌমাছি আফ্রিকান মৌমাছির চেয়ে কিছুটা বড় তাই এদের চাকের পরিধিও কিছুটা বড়;

২. ইউরোপীয় মৌমাছির চেয়ে আফ্রিকান মৌমাছির ড্রোন (drone) উৎপাদন করার প্রবণতা খুব বেশি;

৩. ইউরোপীয় মৌমাছিদের ব্যবস্থাপনা খুব সহজেই করা যায়। তবে আফ্রিকান মৌমাছিদের ব্যবস্থাপনা খুব সহজে করা যায় না। তবে কোনো কোনো চাক যদিও রাখা যায়, সামান্য অসুবিধে হলেই তা ত্যাগ করে চলে যায় ;

৪. দিনে গরমের সময় আফ্রিকান মৌমাছি খুবই আক্রমণাত্মক হয়ে থাকে। যত গরম হয় ততই মারাত্মক হয়। অন্যদিকে ইউরোপীয় মৌমাছির ক্ষেত্রে গরম কোনো সমস্যাই নয় বরং তাপমাত্রা কমে গেলেই ওরা হুল ফুটাতে চায়;

৫. ইউরোপীয় মৌমাছিকে শান্ত করতে খুব অল্প ধোয়া ব্যবহার করলেই চলে কিন্তু আফ্রিকান মৌমাছিকে শান্ত করার জন্য প্রচুর ধোয়া ব্যবহার করতে হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার প্রয়োগ করতে হয়;

৬. কোনো কারণে কোম্ব কেটে ফেললে আফ্রিকান মৌমাছিরা বাসা ছেড়ে বের হয়ে যায় এবং এলোমেলোভাবে উড়তে শুরু করে হুল ফোটানোর জন্যে;

৭. আফ্রিকান মৌমাছিরা শব্দ খুব অপছন্দ করে। সেজন্য মৌমাছি পালকদের বলা হয় যখন দিনে চাকের কাছে কাজ করে কথা বলা বা শব্দ না করার জন্যে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় মৌমাছির ক্ষেত্রে এগুলো কোনো সমস্যাই নয়। শুধু এদের বাক্সে আঘাত করলে বা নাড়ালেই রাগ করে। এছাড়া কোনো সমস্যা হয় না ;

৮. উষ্ণমণ্ডলীয় মৌমাছির সতর্কীকরণ ফেরোমন (alarm pheromone) ইউরোপীয় মৌমাছির চেয়ে অনেক শক্তিশালী। কোনো আফ্রিকান মৌমাছি যখন কাউকে ফুল ফোটায় সে স্থানে অনেক মৌমাছি জড় হয়ে এক সঙ্গে হুল ফুটাতে শুরু করে এবং সে ব্যক্তি যদি স্থান ত্যাগ না করে কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত শরীর মৌমাছিতে ঢেকে যায়।

৯. কোনো ব্যক্তির আঘাতের ফলে যদি কোনো কর্মী মৌমাছি চাকের পার্শ্বে পিষে মারা পড়ে আফ্রিকার মৌমাছিরা সঙ্গে সঙ্গে সে লোককে আক্রমণ করে কিন্তু ইউরোপীয় মৌমাছিরা সে রকম কোনো ঘটনা তেমন খেয়াল করে না ;

১০. আফ্রিকার মৌমাছি কোনো শত্রু পেলে ৪০০ মিটারের বেশি পর্যন্ত ধাওয়া করে আর ইউরোপীয় মৌমাছি তা করলে ৫০ মিটারের বেশি যায় না।

মধু উৎপাদন

অনেকেই মনে করেন ইউরোপীয় মৌমাছি বেশি মধু উৎপন্ন করে। এ ধারণাটি প্রকৃত পক্ষে সঠিক নয়। এ ধরনের বক্তব্য প্রদানকারীরা সার্বিক ব্যাপার চিন্তা না করেই তা বলেন। ইউরোপীয় মৌমাছির জন্যে যে চিনির সরবত এবং অন্যান্য খরচ করা হয় যা আফ্রিকান মৌমাছির জন্যে করা হয় না সেগুলো হিসেব করলে দেখা যাবে যে আফ্রিকার মৌমাছিও কম মধু উৎপন্ন করে না। আফ্রিকান মৌমাছিদের ফুলের উৎস খুবই কম তা নাহলে এরাও বেশি মধু উৎপাদন করতে সক্ষম হতো। তাছাড়া আফ্রিকার মৌ-চাষীরা মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপতি ব্যবহার করে মধু সংগ্রহ করতে, সেখানেও মধুর সংগ্রহ কম হয়। প্রতিবার সংগ্রহের পর মধু ও মোম রেখে কোম্বটি নষ্ট করে ফেলে। সেক্ষেত্রে মৌমাছিদের আবার নতুন করে কোম্ব তৈরি করতে হয়। আর এক কেজি ওজনের একটি কোম্ব তৈরি করতে মৌমাছিদের প্রায় ৮–১৪ কেজি মধুর প্রয়োজন হয়। আফ্রিকাতে একটি ভালো মৌমাছির কলোনি বছরে ১০০ কেজি মধু উৎপন্ন করতে পারে।

মৌমাছি পালক

আফ্রিকাতে মৌমাছি পালন করে বয়স্ক লোকেরা, যুবকরা সাধারণত এ কাজে যায় না। তবে সে দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। মৌমাছি পালনের উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রয়োজন মৌমাছিদের সংঘ তৈরি করা ; সেটা হবে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের। একবার এটা সার্থকভাবে চালু হলে সেদেশের মানুষেরা আর্থিকভাবে উন্নত হবে পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে বিভিন্ন ফসলের।

এটা পরিষ্কার যে, আফ্রিকাতে পালন করা মৌমাছি প্রাকৃতিক চাকের চেয়ে বেশি মধু উৎপাদন করতে সক্ষম। এর কারণ হলো খোলা কলোনিতে শত্রুর আক্রমণ থাকে এবং

কলোনি সুরক্ষার জন্য থাকে প্রচুর কর্মী যেগুলো সংগৃহীত মজুদ রসদ খায়। আরও যা রয়েছে সেটি হলো গরমের সময় কলোনি ঠাণ্ডা করার জন্যে এবং শীতের সময় কলোনি গরম রাখার জন্যে যে শক্তি প্রয়োজন তা এই সংগৃহীত মধু থেকেই আসে। অধিকন্তু খাদ্য সংগ্রহ করার মতো কর্মীর সংখ্যাও কলোনিতে কমে যায়। যার ফলে খোলা কলোনিতে সঞ্চিত খাদ্য এমনিতেই কমে যায়।

যেখানে এসব মৌমাছি থাকে সেখানের তাপমাত্রা খুব বেশি পরিবর্তনশীল। এদিকে মৌ-পদার্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম উপায়ে মৌ-চাষের দরকার হয়ে পড়েছে আফ্রিকার দেশগুলোতে।

স্থানীয় কলোনি

আফ্রিকাতে যদিও মৌমাছি পালন তেমন উন্নত নয়, কিন্তু এর শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বেই বিশেষ করে সাহেল অঞ্চলে। এখানে বড় কাণ্ডল উদ্ভিদের অভাবহেতু ঘাস বা মাটির তৈরি বাক্সেই মৌমাছি পালন করা হতো। আরও যত ধরনের মৌবাক্স পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে নিচে বর্ণনা করা হলো :

ঘাসের বাক্স : শুকনো ঘাস বুনিয়ে বাক্স বা ফাঁপা চোঙা তৈরি করা হয়, যার দুপাশেই খোলা থাকে। এগুলোকে গাছের উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মৌমাছি এখানে চাক বাঁধলে একটি মৌসুম শেষ হওয়ার পর কেটে এনে মধু সংগ্রহ করে পরের মৌসুমের জন্য সাধারণত তারা নতুন আর একটি এরকম বাক্স/চোঙা বানায়।

কুমড়ো/লাউয়ের বাক্স : শুকনো কুমড়ো/লাউয়ের খোল/বাওঁশ আফ্রিকার মৌমাছি পালকরা ব্যবহার করে মৌমাছি পালনের জন্য। তবে লাউয়ের আকার ছোট বলে এ দিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় আর সবসময়ই মধু সংগ্রহের জন্য সমস্ত খোলকটি ভেঙে ফেলতে হয়। এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে সেটা হলো মধুর পরিমাণ বোঝার কোনো জো নেই আর যারা এ ধরনের মৌমাছি পালন করে এরা মধু তো খায়ই সঙ্গে লার্ভা পর্যন্ত খেয়ে থাকে।

কাঠের বাক্স : দু'ধরনের কাঠের বাক্স পাওয়া যায় পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি দেশে (ঘানা, গিনি বিসাউ)। একটি হলো সিবা (Ciba) এবং অন্যটি হলো *Borassus flabellifer*। এগুলোর ভিতরের কাঠ ফেলে দিয়ে খোলকটি ব্যবহার করা হয় বাক্স হিসেবে। অনেক সময় এই খোলকটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়। কোনো গাছ মরে গেলে মৌমাছি পালকরা অপেক্ষা করে যেন উইপোকা এর ভিতরের নরম কাণ্ডল অংশ খেয়ে নেয়, যখনই এ কাজটি হয়ে যায় এরা সেটাকে নির্দিষ্ট আকার মতো কেটে কাজে লাগিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় পূর্ব আফ্রিকাতে (কেনিয়া, তানজানিয়া)। এক্ষেত্রে বড় গাছকে সাইজ মতো কেটে ভিতরের কাণ্ডল অংশ খুদে বের করে বাক্স তৈরি করা হয়।

দু'ধরনের বাক্স তৈরিই অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কাজের দিক থেকে অনুন্নত মানের।

ব্যারেল বাক্স : পশ্চিম আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে ধাতব বা কাঠের ব্যারেল ব্যবহার করা হয় মৌমাছি পালনের উদ্দেশ্যে।

মাটির পাত্র : পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর সাভানা অঞ্চলে মাটির পাত্র ব্যবহার করা হয় মৌমাছি পালনের জন্য। সাধারণত পানি রাখার পাত্রকেই একটু পরিবর্তন করে তারা মৌমাছির বাক্স হিসেবে এটাকে ব্যবহার করে। তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং ব্যবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক।

এ পাত্র তারা নিজেরাই তৈরি করে। একটু আলাদা হওয়ার কারণ হলো ভিতরের দিকে মৌমাছির আকর্ষণের জন্য গোবরের প্রলেপ বা অন্য কোনো এ ধরনের বস্তুর প্রলেপ দিয়ে ভূমিতে বা গাছের ডালে রেখে দেয়া হয়।

উপরে উল্লেখিত স্থানীয়ভাবে তৈরি বাক্সের কোনোটি স্থায়ী পদ্ধতি নয়। এতে সম্পদ প্রচুর বিনষ্ট হয়ে থাকে। তদুপরি মধুর মান নিয়ন্ত্রণ হয় না। আর এটা লাভজনক করা ব্যবসায়িকভাবে খুবই দূরূহ ব্যাপার।

আধুনিক বাক্স : এখনকার আমলের মৌ-বাক্সগুলোর সবগুলোই তৈরি হচ্ছে Langstroth-এর বাক্সের উপর ভিত্তি করে। এর ফলে মৌমাছি পালন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। যত ধরনের বাক্সই তৈরি হয়ে থাকুক না কেন সবগুলোই Langstroth-এর নিয়মকে সামনে রেখেই করে। যদিও এর বিভিন্ন নাম থাকতে পারে এবং আরও থাকতে পারে ফ্রেমের সংখ্যার পার্থক্য।

ঝুলন্ত বাক্স : ঝুলন্ত বাক্স তৈরি করতে মূলত Langstroth-এর বাক্সের পরিবর্তন ঘটিয়েই করা হয়। এখানে কোম্বগুলো বাক্সের চার দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত হয় যেমনটি থাকে Langstroth-এর বাক্সে। যেহেতু কোম্বগুলো উপরের বারের সাথে লাগানো থাকে তাই প্রয়োজনের সময় বাক্স খুলে খুব সহজেই পরীক্ষা করা যায়।

আজকাল তিন ধরনের টপ-বার-বাক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদের নাম হলো ভি-আকার টপ-বার বাক্স, গ্রুভ (groove) টপ-বার বাক্স, এবং পয়েন্টেড স্টার্টার (Pointed starter).

এছাড়া রয়েছে কেনিয়া টপ-বার বাক্স (KTBH), আয়তাকার বাক্স (Rectangular hive), তানজানিয়ার ট্রানজিশনাল লম্বা বাক্স (Tanzanian transitional long hive).

মৌ-বাক্স ব্যবস্থাপনা

মৌমাছির বাক্স তৈরি করার সময় বাক্সের আকৃতির দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কিছুতেই যেনো এটি ছোট বা বড় না হয়। বাক্সের ভিতর খুব মসৃণ হওয়া প্রয়োজন কারণ মৌমাছিরা মসৃণ বাসায় থাকতে পছন্দ করে। এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, দেয়ালের গায়ে অমসৃণ কোনো পদার্থ থাকলে কর্মীরা তা যতোক্ষণ পরিষ্কার না হয় সেখানে সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাই একটি বাক্স কেনার আগে ভালো করে দেখে নিতে হবে যেন সেটা সঠিকভাবে তৈরি হয়েছে কি-না। কলোনির যেখানে সেখানে যেন কোনো ছিদ্র না থাকে যা দিয়ে অন্য কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের ছিদ্র থাকলে কলোনি স্থানান্তর করার সময় কর্মী মৌমাছিরা সব বেরিয়ে যেতে পারে।

মৌমাছির কর্ম তৎপরতার জন্যে পর্যাপ্ত উষ্ণতা প্রয়োজন কিন্তু অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া এদের কলোনিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেজন্যে দুটি ছিদ্র (প্রায় ২ সেমি চওড়া) থাকা উচিত। তবে অবশ্যই তারের জালের সাহায্যে সেটা আটকে রাখা প্রয়োজন যেন সেখান দিয়ে মৌমাছি বাইরে যেতে না পারে। তাছাড়া সাদা রং দিয়ে বাক্সগুলো রং করা এবং ছায়া ঘেরা স্থানে রাখা ভালো।

এপিয়ারি তৈরির স্থান

এপিয়ারি হলো এমনই একটি স্থান যেখানে মৌমাছির কলোনি রাখা হয়। একটি এপিয়ারিতে অনেকগুলো কলোনি থাকতে পারে (যেমন আমেরিকা ও কানাডাতে একটি এপিয়ারিতে ১০০-এর মতো কলোনি থাকে) এবং এখান থেকে মৌমাছিরা অনায়াসে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে কোনো রকম অসুবিধে ছাড়াই। আফ্রিকাতে যেখানে মৌমাছি পালন এখনো তেমন উন্নত নয় সেখানে একটি এপিয়ারিতে ১০টি পর্যন্ত কলোনি থাকতে পারে এবং এর বিস্তৃতি হতে পারে ১ বর্গ কিলোমিটার। এধরনের এপিয়ারি করার জন্য সরকারি বন হতে পারে উত্তম স্থান। ঘানাতে সরকার অত্যন্ত আনন্দের সাথে সরকারি বন মৌমাছি পালকদের ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছে এবং তারা মৌমাছি পালকদের অনেক সময় উৎসাহ দিয়ে থাকে এরূপ কর্মের জন্যে।

যেহেতু আফ্রিকান মৌমাছি খুব আক্রমণাত্মক তাই এদেরকে যেকোনো কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানে রাখা উচিত নয় বরং কিছুটা দূরে যেমন ১০০–২০০ মিটার দূরে রাখা ভালো। আরও বেশি খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ধরনের কলোনিকে একটি কৃষিক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো স্থানে না রেখে একটু দুর্বল অবস্থানে রাখা হয় যেখানে কৃষকের কম যেতে হয়। এধরনের ব্যবস্থা না নিলে কৃষকদের সেখানে সবসময়ই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। যদি কলোনি কর্মস্থান থেকে ১৫০ মিটার দূরে থাকে সেক্ষেত্রে ঝুঁকি কম থাকে। এধরনের মৌমাছিরা খাদ্যের অন্বেষণে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত যেতে পারে।

একটি আদর্শ এপিয়ারির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকে :

১. এপিয়ারির অবস্থান যেকোনো খেলাধূলার স্থান থেকে দূরে এবং কোলাহলপূর্ণ বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকার বাইরে হওয়া উচিত ;

২. সেখানে প্রচুর সুপেয় পানির আধার থাকা প্রয়োজন ;

৩. সেখানে প্রচুর খাদ্যের উৎস বিভিন্ন মৌ-উদ্ভিদ থাকতে হবে (যেমন—লেবুজাতীয় গাছ, নারকেল, তাল, নিম ইত্যাদি) ;

৪. ভালো শুকনো এলাকায়, কারণ জলমগ্ন এলাকার মধুতে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হওয়ার জন্য মধু ছত্রাকে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে ;

৫. যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ;

মৌমাছির কর্ম তৎপরতার জন্যে পর্যাপ্ত উষ্ণতা প্রয়োজন কিন্তু অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া এদের কলোনিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেজন্যে দুটি ছিদ্র (প্রায় ২ সেমি চওড়া) থাকা উচিত। তবে অবশ্যই তারের জালের সাহায্যে সেটা আটকে রাখা প্রয়োজন যেন সেখান দিয়ে মৌমাছি বাইরে যেতে না পারে। তাছাড়া সাদা রং দিয়ে বাক্সগুলো রং করা এবং ছায়া ঘেরা স্থানে রাখা ভালো।

এপিয়ারি তৈরির স্থান

এপিয়ারি হলো এমনই একটি স্থান যেখানে মৌমাছির কলোনি রাখা হয়। একটি এপিয়ারিতে অনেকগুলো কলোনি থাকতে পারে (যেমন আমেরিকা ও কানাডাতে একটি এপিয়ারিতে ১০০-এর মতো কলোনি থাকে) এবং এখান থেকে মৌমাছিরা অনায়াসে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে কোনো রকম অসুবিধে ছাড়াই। আফ্রিকাতে যেখানে মৌমাছি পালন এখনো তেমন উন্নত নয় সেখানে একটি এপিয়ারিতে ১০টি পর্যন্ত কলোনি থাকতে পারে এবং এর বিস্তৃতি হতে পারে ১ বর্গ কিলোমিটার। এধরনের এপিয়ারি করার জন্য সরকারি বন হতে পারে উত্তম স্থান। ঘানাতে সরকার অত্যন্ত আনন্দের সাথে সরকারি বন মৌমাছি পালকদের ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হয়েছে এবং তারা মৌমাছি পালকদের অনেক সময় উৎসাহ দিয়ে থাকে এরূপ কর্মের জন্যে।

যেহেতু আফ্রিকান মৌমাছি খুব আক্রমণাত্মক তাই এদেরকে যেকোনো কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানে রাখা উচিত নয় বরং কিছুটা দূরে যেমন ১০০-২০০ মিটার দূরে রাখা ভালো। আরও বেশি খেয়াল রাখতে হবে যেন এই ধরনের কলোনিকে একটি কৃষিক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো স্থানে না রেখে একটু দুর্বল অবস্থানে রাখা হয় যেখানে কৃষকের কম যেতে হয়। এধরনের ব্যবস্থা না নিলে কৃষকদের সেখানে সবসময়ই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। যদি কলোনি কর্মস্থান থেকে ১৫০ মিটার দূরে থাকে সেক্ষেত্রে ঝুঁকি কম থাকে। এধরনের মৌমাছিরা খাদ্যের অন্বেষণে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত যেতে পারে।

একটি আদর্শ এপিয়ারির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকে :

১. এপিয়ারির অবস্থান যেকোনো খেলাধূলার স্থান থেকে দূরে এবং কোলাহলপূর্ণ বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকার বাইরে হওয়া উচিত ;

২. সেখানে প্রচুর সুপেয় পানির আধার থাকা প্রয়োজন ;

৩. সেখানে প্রচুর খাদ্যের উৎস বিভিন্ন মৌ-উদ্ভিদ থাকতে হবে (যেমন—লেবুজাতীয় গাছ, নারকেল, তাল, নিম ইত্যাদি) ;

৪. ভালো শুকনো এলাকায়, কারণ জলমগ্ন এলাকার মধুতে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হওয়ার জন্য মধু ছত্রাকে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে ;

৫. যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ;

৬. যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না (১২৫০ মিমি. বছরে) ;

৭. আগুন বা ধোয়া সৃষ্টি হয় না ও ইচ্ছা করে কেউ কলোনির ক্ষতি করে না এমন স্থানে এপিয়ারির অবস্থান হওয়া উচিত।

বাক্স তৈরির পদ্ধতি

আফ্রিকাতে প্রাকৃতিক কলোনিকে আকর্ষণ করার জন্যে বাক্স তৈরি করা হয়। বাক্সটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেনো সেটি সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং অন্য কোনো প্রাণী সহজে যেনো বাসা তৈরি করতে না পারে। টোপ ব্যবহার করে। বিভিন্ন ধরনের টোপ আছে যেগুলো প্রাকৃতিক মৌমাছিকে আকর্ষণ করে একটি নতুন বাক্সের ভিতর আসতে উদ্বুদ্ধ করে। টোপগুলো হলো মোম, ঘন সিরাপ, চিনি, সুগন্ধি, লেমন গ্রাস, লাইম (Lime), গোবর, এবং পানি ইত্যাদি।

মৌমাছির চাকের উৎস

প্রত্যেক ঋতুতেই মৌমাছির চাকে বেশ কিছু নতুন রানি, ড্রোন এবং কর্মী তৈরি হয়। এ রানি এক পর্যায়ে কিছু কর্মীকে নিয়ে নতুন চাক তৈরি করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বেশিরভাগ যা ঘটে, তা হলো চাক যখন বেশ বড় হয়ে যায় পুরোনো রানি তখন কিছু ড্রোন আর কর্মী নিয়ে অন্যত্র উড়ে চলে যায় এবং নতুন স্থানে চাক তৈরি করে। ঘটনাটি ঘটার সময় উড্ডয়নরত মৌমাছিরা কোথাও কোনো গাছের ডালে বসে। আর অনুসন্ধানকারী মৌমাছিরা উপযুক্ত চাক তৈরির স্থানের খোঁজে বের হয়। যখনই তারা উপযুক্ত কোনো স্থান খুঁজে পায় তখন এসে সম্পূর্ণ কলোনিতে খবর দেয় এবং সবাইকে নিয়ে নতুন স্থানে এসে চাক তৈরির কাজ শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে যদি অনুসন্ধানকারী কোনো তৈরি বাক্স পেয়ে যায় এবং মৌমাছি পালনকারীরা যদি তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে তাহলে সে বাক্সটিই হতে পারে মৌমাছির নতুন আশ্রয়স্থল। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা ভালো যে আফ্রিকাতে মৌমাছির জন্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে উপযুক্ত স্থান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার তাই তৈরি স্থান পেলে এরা খুব সহজেই গ্রহণ করে নেয়।

যেকোনো কলোনিতে প্রথম ঝাঁকটি তৈরি হয় পুরোনো রানি এবং কিছু পুরোনো কর্মীকে নিয়ে। এসময় মৌমাছিরা তাদের পুরোনো চাকের সকল মধু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে যায়। যাতে করে নতুন স্থানে গিয়ে খুব শীঘ্রই কোম্ব তৈরি করতে পারে এবং রানি ডিম পাড়তে পারে।

প্রথম ঝাঁকের পরে যেকোনো ঝাঁকই হলো অতিরিক্ত ঝাঁক। এক্ষেত্রে থাকে নতুন রানি, কর্মী এবং ড্রোন এরা সবাই কম বয়েসের। এ নতুন ঝাঁকের কলোনিগুলো খুব দুর্বল হয়। এ ধরনের কলোনি সংগ্রহ করা হলে এদেরকে অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ করতে হয়, তাতে কলোনি সাইজ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে।

কলোনি ধরার পদ্ধতি

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টোপ হলো মৌমাছির মোম। এ মোম মৌবাক্সের ভিতর যেখানে কোম্ব তৈরি করবে সে জায়গায় মেখে গেঁথে রাখলে মৌমাছিরা যদি জানতে পারে তাহলে সেখানে এসে কোম্ব তৈরির কাজ শুরু করে। মোম ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি এতটা ফলপ্রসূ হয় না।

মিষ্টি গাঢ় সিরাপও ব্যবহার করা যায় টোপ হিসেবে। এছাড়া অন্যান্য পদার্থ যা উপরে লেখা হয়েছে সবগুলোই ব্যবহার করা যায়। কার্যকারিতার দিক থেকে মৌমাছির মোমই হলো সবচেয়ে উত্তম।

কলোনি সংগ্রহ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আফ্রিকাতে সম্পূর্ণ কলোনি কিনতে পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে তাদেরকে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে যা ঘটে তা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। মৌমাছি পালকদের প্রাকৃতিক কলোনিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উড়িয়ে এনে তাদের তৈরি বাক্সে ঢোকানো হয় যা একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টকর কাজ।

সাধারণত কলোনি টোপ ব্যবহার করেই ধরা হয় এবং বাক্সে রাখা হয়। এ মৌমাছি পালনকারীরা টোপ ব্যবহার করে একটি মৌমাছির ঝাঁককে বাক্সে বন্দি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। একবার বাক্সে ঢুকলে সেটা তাদের অধিনে চলে আসে এবং সে চাকের ব্যবস্থাপনা তারা করতে পারে। এবিষয়টি করতে সময়ের যথেষ্ট পার্থক্য হতে পারে। সবচেয়ে কম সময় হতে পারে ২০ মিনিটে। তবে সবক্ষেত্রেই মৌমাছির খাবারের উৎসটি একটি বড় বিবেচ্য বিষয়। কারণ যেখানে ফুল বেশি অর্থাৎ খাদ্য বেশি সেখানে এ কাজ করতে খুব কম সময় লাগে। আবার যেখানে কম যেমন শহর অঞ্চলে এবং ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে অনেক বেশি সময় লাগে। নিচে মৌমাছির ঝাঁকের সংগ্রহ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

১. প্রথমেই ঝাঁকটি দেখে আন্দাজ করে নিতে হয় কি কি সরঞ্জাম লাগতে পারে। যেমন মই, বাক্স, কাপড়ের বা পাটের জালিকাকার ব্যাগ, ম্যাচ বাক্স ইত্যাদি ;

২. মৌমাছিরা কোনো গাছের ডালে বসলে সে ডালসহ চাকটি কেটে এনে বাক্সে রেখে দেয়া যায় ;

৩. যদি গাছের খুব উঁচু ডালে মৌমাছিরা বাসা বাঁধে সেক্ষেত্রে একটি মই দিয়ে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সর্বাগ্রে রানিটিকে ধরে ফেলতে পারলে ভালো, পরে অন্যগুলো একটি ব্যাগে করে বাক্সে এনে ছেড়ে দিতে হয় ;

৪. সম্ভব হলে পুরোনো কোনো চাক থেকে একটি বড় কোম্ব নতুন বাক্সে রাখলে ভালো হয় সেখানে রানি একটু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে এবং রানি স্বাভাবিক হলে সেখানে অন্যান্য কর্মীদেরকে ছেড়ে দিলে সম্পূর্ণ চাকটি শান্ত থাকবে ;

৫. কলোনিকে খাবার সরবরাহ করতে হবে (সিরাপ)। এরকম সংগ্রহ করা মৌমাছিকে ২৪ ঘন্টার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ সেক্ষেত্রে সমগ্র চাকটি আবার উড়ে চলে যেতে পারে ;

৬. খেয়াল রাখতে হবে যেন বাক্স অতিরিক্ত গরম না হয় ;

৭. চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার পর মৌমাছিদের বাইরে ভ্রমণের জন্যে যেতে দেয়া যায় সেক্ষেত্রে সময় হওয়া উচিত বিকেল ৫টার পর কারণ এ সময় এবং এর পরে রানি এবং পুরুষরা আর বাইরে যায় না। যদি কর্মী মৌমাছিকে চাকে পরাগ আনতে দেখা যায় তখন বুঝতে হবে এরা মোটামুটি স্থির হয়েছে। তখন কিছুতেই এদের বিরক্ত করা উচিত নয়।

এপিয়ারি ব্যবস্থাপনা

কেউ যদি কলোনি সংগ্রহ করতে পারে এটা ধরে নেয়া যায় যে সে প্রচুর মধু আহরণ করতে পারবে তবে এক্ষেত্রে ভুললে চলবে না যে, কলোনি ভাল ব্যবস্থাপনা মধু উৎপাদনের পূর্ব শর্ত। এছাড়া প্রাকৃতিক অন্যান্য কারণ তো রয়েছেই (যেমন জলবায়ুর ধরণ এবং ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা)। আর একটি বিষয় হলো খাদ্যের উৎস, যেখানে কলোনি থাকবে সেখানে থাকতে হবে প্রচুর মৌ-উদ্ভিদ তবেই মৌমাছিরা বেশি মধু সংগ্রহ করতে পারবে।

মৌমাছি পালনকারীদের মাঝে মাঝে কলোনি পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। এটা করতে হয় কলোনির গঠন, মধুর মজুদ এবং রোগ-বালাই দেখার জন্যে। সাধারণত কলোনি দেখা এবং মধু সংগ্রহ একই নিয়মে করা হয়ে থাকে :

১. প্রয়োজনীয় কাপড় পরিধান করা ;

২. দুজন একসঙ্গে কাজ করা এদের একজন শুধু ধোঁয়া নির্গমণ করবে অন্যজন কলোনির অন্যান্য কাজ করবে ;

৩. ধোঁয়া নির্গমণ যন্ত্র খুব ভালো হতে হবে এবং সেটি যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে ;

৪. তারপর একে একে কোম্বগুলো পরীক্ষা করতে হবে। যদি ১০টির অধিক কোম্ব থাকে সেক্ষেত্রে অতিরিক্তগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। কারণ কলোনি বেশি বড় হয়ে গেলে নানান ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন মধু কমে যেতে পারে। অতিরিক্তগুলো অন্য দুর্বল কলোনিতে যোগ করলে সেটা আরও ভালো হবে।

মধু সংগ্রহ

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মধু সংগ্রহের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে হয়, কারণ এখানের আবহাওয়া এতই প্রতিকূল যে সময় সময় যখন মৌমাছিরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না তখন সঞ্চিত মধু খেয়ে ফেলে, ফলে মধুর পরিমাণ কমে যায়।

পশ্চিম আফ্রিকাতে মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো শুষ্ক মৌসুম এবং সেটা ঠিক শুষ্ক বায়ুর (harmatan) প্রবাহের পূর্বে। পশ্চিম আফ্রিকাতে মৌ-চাষীরা অক্টোবরের শেষ থেকে মধু সংগ্রহ করে। আবার যখন কলোনি ঝাঁক বাধবে ঠিক তার আগেও মধু সংগ্রহ করে। যখন

কলোনি মধুতে পূর্ণ থাকে মৌমাছিরা খুব উগ্র হয়। রাতে খুব শব্দ (বাজিং এবং ভেন্টিনেশন) করে। এ সময় কলোনির মৌমাছিরা অপেক্ষা করতে থাকে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য কারণ বাতাস দিয়ে তারা কুলাতে পারে না। এগুলো থেকেই বোঝা যায় কলোনিতে সর্বোচ্চ মধু আছে এবং চাকটি উড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কলোনিকে ওজন করেও বোঝা যায় কি পরিমাণ মধু আছে।

কিভাবে সংগ্রহ করা হয় সে সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা বলা হয়েছে তা হলো অবশ্যই সুরক্ষিত বস্ত্র, হাত মোজা, ধারাল ছুরি, মধু রাখার পাত্র ইত্যাদি সঙ্গে রাখতে হবে। তারপর একে একে কোম্ব বের করতে হবে। সে কোম্বের মধু সংগ্রহ করা হবে যেটাতে শুধু মধুই রয়েছে এবং সবগুলিই ঢাকনা দিয়ে রক্ষিত (capped honey)। খালি কোম্ব, ব্রুড কোম্ব এবং যেটায় দুটোই রয়েছে এমন কোম্বের মধু সংগ্রহ করা যাবে না। সুরক্ষিত মধু (ripe honey) সমৃদ্ধ কোম্বটির মৌমাছিগুলো তাড়িয়ে দিয়ে উপরের ফ্রেমের এক সেন্টিমিটার পরিমাণ রেখে কেটে নিতে হবে যাতে তার নিচে আবার নতুন কোম্ব তৈরি করতে পারে।

কিছু কোম্ব পাওয়া যাবে যেগুলো জোড়া লেগে আছে, এক্ষেত্রে ছুরি ব্যবহার করে আলাদা করা যাবে। এ রকমটি ঘটে কারণ যদি দুটি পাশাপাশি উপরের ফ্রেমে ফাকা জায়গা থাকে। মধু সাধারণত প্রবেশদ্বারে দু'পাশের কোম্বগুলিতেই বেশি জমাতে দেখা যায়।

আফ্রিকার মৌমাছির মধু দিনের আলোয় সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এটা বিকেলে, রাতে কিংবা খুব ভোরে করা সম্ভব। ঘানায় একটি ঘটনা ঘটেছিল যে, স্থানীয় মৌমাছি পালনকারীরা সকল ১০টার দিকে বাক্স খুলেছিল (অবশ্যই সুরক্ষিত কাপড় পরে) যার ফলে সে কলোনির মৌমাছি ক্ষেপে গিয়েছিল এবং বের হয়ে সমস্ত গ্রামের লোকজনকে প্রায় ১ কিলোমিটারে দূর পর্যন্ত তাড়া করেছিল। এ ঘটনার উপশম ঘটে বিকেল ৫টার পরে। এর থেকে বোঝা যায় এসকল মৌমাছির ক্ষেত্রে রাতে মধু সংগ্রহ করাই ভাল। তবে রাতে মধু সংগ্রহ করার অনেক বিড়ম্বনাও আছে তা হলো আলো মৌমাছিদের আকর্ষণ করে ফলে কাজে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

স্থানীয় পদ্ধতিতে মধু এবং মোম সংগ্রহ একটি অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার। এটা করা হয় হাত দিয়ে চিপড়িয়ে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা মধুর সাথে মিশতে পারে।

সাধারণত মৌমাছি পালনকারীরা সংগৃহীত কোম্বগুলোকে একটি তারের জালের উপর রেখে উত্তপ্ত অ্যাম্বার (Live amber)-এর সাহায্যে গলিয়ে ফেলে। গলিত মোম আর মধু একটি পাত্রে পরে। সবশেষে হয়ে গেলে প্রায় ১২ ঘন্টা পরে সেটা দেখা হয়। ততক্ষণে দেখা যায় গলিত মোম আবার মধুর উপর জমা হয়ে শক্ত আবরণ তৈরি করেছে। পরে এটাকে উপর থেকে আলাদা করে নিলেই সেখানে নিচে মধু পাওয়া যায়। তবে এ মধুতে ধোয়াটে গন্ধ থাকে আর নিম্ন মানের হয়ে থাকে, ফলে আর্থিক লাভ খুবই কম হওয়ার সম্ভাবনা। উপরের পদ্ধতি ছাড়াও আফ্রিকাতে নিম্নোক্ত অনেক ধরনের পদ্ধতিতে মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয় :

১. সৌর মোম গলক পদ্ধতি (Solar wax melter) ;

২. গরম স্নান পদ্ধতি (Hot bath method) ;
৩. অক্লোজ পদ্ধতি (Ocloo's method)।

মধুর প্রকার

বৃক্ষের ওপর নির্ভর করে মধু কেমন হবে, যেমন কমলার ফুল থেকে সংগ্রহ করা মধুর ঘ্রাণ এবং ধনত্বের একটি নির্দিষ্ট ধরন আছে আবার তেমনি নিম ও নারকেল থেকে সংগৃহিত মধুরও একটি আলাদা ধরন আছে। পাতলা মধু সংরক্ষণ ঝামেলার কাজ কারণ তাতে পানির ভাগ বেশি। মধু থেকে পানি না সরাতে পারলে সে মধু সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশগুলোতে (harmatan) গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বায়ু প্রবাহের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বাতাস যখন পশ্চিম আফ্রিকাতে প্রবাহিত হয় (ডিসেম্বর এবং মার্চে) সে সময়ের সংগৃহীত মধু বেশ গাঢ় থাকে।

মধুর ব্যবহার

১. মানুষের খাদ্য হিসেবে
২. মদ্য তৈরিতে
৩. চিনির বিকল্প
৪. ক্রীড়াবিদদের খাওয়াতে
৫. ক্রীড়াবিদদের খাবার
৬. ডায়াবেটিস রোগীদের খাদ্য।

ওষুধ তৈরিতে

১. হে ফেভার (hay fewer) এর ওষুধ তৈরিতে
২. কাশির সিরাপ তৈরিতে
৩. বিভিন্ন ওষুধের মিষ্টন্নতার জন্য, বিশেষ করে শিশুদের ওষুধে।

পশু খাদ্য

১. গরুকে খাওয়াতে (গরুর দুধ বৃদ্ধি পায়)
২. গাধা এবং দৌড়ের ঘোড়াকে খাওয়াতে
৩. পোল্ট্রি এবং মাছের খাবারের সাথে।

পশু ওষুধ

অ্যাসিটোনেমিয়া (Acetonemia)—এর চিকিৎসায় (গরুর অসুখ) :

প্রসাধনি তৈরিতে

মুখাবয়ব সুন্দর ও পরিষ্কার করতে।

ইঁদুর দমনে

ইঁদুর ও বাইট্রা ইঁদুরের রিপেলেন্ট (repellant) তৈরি করতে মধু ব্যবহার করা হয়।

পরাগায়ন ব্যবহার

পরাগায়ন মৌমাছির ব্যবহার আফ্রিকাতে একটি নতুন বিষয়। শুধু কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হচ্ছে যদিও আফ্রিকার কৃষির ও আর্থিক উন্নয়নে শস্য পরাগায়ন বিষয়টি অতীব জরুরি। অনেক শস্যই আছে আফ্রিকাতে যেগুলোর পরাগায়ন প্রয়োজন নেই আবার অনেকগুলোই আছে যাদের পতঙ্গ পরাগায়ন প্রয়োজন। সেগুলোর ক্ষেত্রে মৌমাছি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বাক্স স্থানান্তর পদ্ধতি

প্রথমেই মৌমাছি পালকদের মৌমাছির মেজাজ বুঝে বাক্স স্থানান্তরের চিন্তা করতে হবে। কারণ ক্ষিপ্ত অবস্থায় মৌমাছি স্থানান্তর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কখনই মাথায় করে মৌবাক্স স্থানান্তর উচিত নয়। একটি ঝাঁকুনিবিহীন গাড়িতে করে স্থানান্তর করাই উত্তম। যদি কলোনিতে মধুপূর্ণ (capped honey) কোম্ব থাকে সেগুলো সরিয়ে স্থানান্তর করা ভালো তাতে বাক্সের ওজন কমে যায়। তবে বাহন চলাকালে মৌমাছিরা সাধারণত একত্র হয়ে এক জায়গায় জড় হয়ে থাকে যতোক্ষণ গাড়ি না থামে। রাতে স্থানান্তর সুবিধাজনক। বাক্স স্থানান্তরের পূর্বের দিন সন্ধ্যায় সব কর্মী মৌমাছি ফিরে আসার পর কলোনি আটকে ফেলতে হবে। প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করে দিতে হবে, কলোনিতে ভেন্টিলেশনের (ventilation) ব্যবস্থা রেখে একটির উপর একটি বাক্স রাখা যাবে, কিছুতেই যাতে পড়ে না যায় (turtle down) এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে সোজা করে রাখতে হবে। আর স্থানান্তরের পর মৌমাছিকে খুব প্রত্যুষে খাদ্য সংগ্রহের জন্য খুলে দিতে হবে।

রাতে কাজ করলে সবসময় লাল আলোর নিচে মৌমাছির পর্যবেক্ষণ করা উচিত (red bulb or bulb covered with red cellophane) কারণ মৌমাছিরা লাল আলোতে দেখতে পায় না এবং শান্ত থাকে।

পরাগায়ন প্রোগ্রাম

ফল উৎপাদনকারীদের এটা বোঝাতে হবে যে পরাগায়ন করালে ফসলের উৎপাদন বাড়ে। তখনই তারা মৌমাছি ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে মৌমাছি পালনকারীদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেসব কলোনি পরাগায়নের জন্য রাখা হবে তাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. কলোনিতে রানি থাকতে হবে সাথে কমপক্ষে চারটি ব্রুড কোম্ব ;

২. যে দিন কলোনি রাখা হবে এবং সরিয়ে নেওয়া হবে তার তারিখ নির্দিষ্ট থাকবে ;

৩. কলোনির বিন্যাস কিরূপ হবে তা ঠিক করা থাকবে ;

৪. কে মধু পাবে তা ঠিক করা থাকবে (সাধারণত মৌমাছি পালকই মধু পেয়ে থাকে);

৫. কলোনিটি খুব গোল হতে হবে। আর ভালো কলোনির একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রতি মিনিটে যদি ১০০ কর্মী উপঢৌকন নিয়ে ফিরে আসে ;

৬. কীটনাশক বা অন্য যে কোনো ক্ষতিকর (toxic) পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না। সেটা কলোনি আনার আগে থেকেই সাবধান হতে হবে;

৭. কিছুতেই এদের উত্তেজিত করা যাবে না।

মৌমাছির শত্রু

মৌমাছির ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রাকৃতিক তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৌমাছিকে গ্রীষ্মকালের পাখি (summer bird) ও বলা হয় কারণ যথেষ্ট তাপমাত্রা না হলে এরা উড়তে পারে না, যেমন খুব ভাল উড়তে পারে প্রায় ৩৫° সে তাপমাত্রায়। অন্যদিকে কর্মক্ষমতা কমতে থাকে যদি তাপমাত্রা ২০° এর নিচে নেমে যায়। আর ৮° সে. নিচে তো ওরা ওড়েই না। কম তাপমাত্রায় এদের কোম্ব তৈরিও বন্ধ হয়ে যায়। এরা বাসার ভিতরে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় আর তাদের শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার চেষ্টা করে। তাই এসময় এরা বসে বসে কলোনির জমা মধু খায়। এমনটি এরা বৃষ্টির সময়ও করে থাকে। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা হলো যদি মৌমাছিরা তেমন একটি দুর্যোগময় দিনে কলোনিতে আটকে পড়ে; সেসময় এরা একদিনে ১.৪ কেজি মধু খেয়ে নিতে পারে।

শুধু কম তাপমাত্রাতেই নয় যদি তাপমাত্রা ৩৭° সেন্টিগ্রেড এর উপরে হয় সেক্ষেত্রেও এরা কাজ করতে পারে না। অতি তাপমাত্রায় (৩৭° সেন্টিগ্রেড) কোম্ব গলে যেতে পারে। আবার যেখানে বেশি গাছ-পালা আছে যেমন বিষুবীয় অঞ্চলের বাদল অরণ্যে (equatorial evergreen rain forest) যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেখানেও মৌমাছির বেঁচে থাকা কষ্টকর। নতুন রানির ওড়ার জন্য প্রায় ২৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন, আর পুরুষের জন্য ২১° সেন্টিগ্রেড। এর অন্যথায় তাদের মিলন হবে না। আবার যদি ১ সপ্তাহের মধ্যে নতুন রানি মিলন না করে কর্মীরা তাকে হয় তাড়িয়ে দেয় বা মেরে ফেলে, সে আরেক সমস্যা। তাকে যদি থাকতেও দেয়া হয় এর পরে সে অনিষিক্ত ডিম পাড়তে শুরু করে আর একবার নতুন রানি যদি ডিম পাড়তে শুরু করে সে আর মিলন করে না সেক্ষেত্রে সে কলোনি শেষ হয়ে যায়। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে মৌমাছির পালন সুবিধা না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো এখানের বড় বড় বৃক্ষ। মৌমাছিরা অতি উচু বৃক্ষের উপর পর্যন্ত যেতে চায় না। এর কারণও আছে, সেখানে ফুল খুবই কম থাকে। আবার এ অরণ্যের ভূমি পর্যন্ত আলো এসে কমই পৌছায়, সেখানেও মৌমাছির অসুবিধা রয়েছে কারণ এখানে তাপমাত্রা কম, সূর্যের আলো কম। আর সেখানে রয়েছে উচ্চ আর্দ্রতা যেটা কীটপতঙ্গের জন্য অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং রোগের কারণ। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বন্য জন্তুর আধিক্য তো রয়েছেই।

আফ্রিকার সাভানা বনাঞ্চল মৌচাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী কারণ সেখানে প্রচুর ফুলের সমারোহ রয়েছে। সেখানে যদি সমস্যা থেকে থাকে তা হলো দুটি, একটি হলো পর্যাপ্ত পানির অভাব এবং অন্যটি শুষ্ক বাতাস। আর সে কারণেই কলোনিগুলো সেস্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যায়। একে এ অঞ্চলে গাছপালা কম, যাও ছিল মানুষ কেটে সব সাফ করে দিয়েছে এবং উন্নয়নমূলক কাজের নামে পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে দিয়েছে ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মৌমাছিরা।

মৌয়াল : মৌয়ালরাই হলো মৌমাছির সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক; কারণ তারা মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মধু সংগ্রহ করে এর ফলে যেমন মধুর গুণগত মান নষ্ট হয় সঙ্গে সঙ্গে মারাও যায় অনেক মৌমাছি। যেহেতু এরা মৌমাছির প্রাকৃতিক বাসস্থান যেমন— বৃক্ষের খোড়ল কেটে বেড় করে আনে এতে করে সে গাছটিও শেষ হয় সঙ্গে তো প্রাকৃতিক বাসাটি হয়ই। মৌয়ালদের এ কর্মকাণ্ড রোধকল্পে অচিরেই সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।

দাবানল : আফ্রিকাতে দাবানল হলো মৌমাছিদের উপর একটি বিরাট হুমকি স্বরুপ। সেখানে বিবিধ কারণে দাবানল লেগে থাকে যেমন মানুষ কৃষি ক্ষেত করার জন্য বনে আগুন লাগিয়ে দেয়, আরেকটি হলো সহজে শিকার করার জন্য। এ ধরনের একটি আগুনে সেখানে একবারে প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা পুড়ে যেতে পারে এবং হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় ১২৫ মিলিয়ন মৌমাছি মারা যেতে পারে।

মৌচাকে অগ্নি সংযোগ : আফ্রিকাতে মৌচাকে অগ্নিসংযোগ কোনো নতুন ঘটনা নয়। সেখানে পানির যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে পানি নিয়ে মানুষের সাথে মৌমাছির দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। মৌমাছিরা তিন কিলোমিটার দূরত্বের বেশি যেতে পারে না। কিন্তু মানুষ তারও অনেক দূরে গিয়ে পানি সংগ্রহ করে আনে। আর সে পানি মৌমাছিরা যদি খেয়ে নেয় মানুষদের ক্ষেপে যাওয়ার কথা। এমতাবস্থায় সেখানের মানুষেরা মৌমাছিদের আগুন লাগিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এতে মারা যায় অনেক অনেক মৌমাছি।

তালের রসের প্রতিক্রিয়া : আফ্রিকার দেশগুলোতে পানির অভাব থাকায় সেখানে মৌমাছিরা যে কোনো তরল পদার্থ পেলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটু পানি সংগ্রহের জন্য। আর এরই প্রতিফলন ঘটে তালের রসের উপর। তালের রসের মৌসুমে রস নেওয়ার জন্য খুব ভোরে গাছি আসার আগেই তারা রস খেয়ে বসে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হলো তালের রসের প্রতিক্রিয়া। এর প্রতিক্রিয়া ঠিক মানুষের মধ্যে যে নেশার উদ্রেক করে মৌমাছির মধ্যেও একই কাজ করে, ফলে যে মৌমাছিটি রস সংগ্রহ করে ফেলেছে সেটা আর উড়তে পারে না, নড়তেও পারে না। মানুষের মতই মাতলামি শুরু করে এবং অনেকগুলোই হাড়ির ভিতর পড়ে যায়, কিছু মারা যায় আর কিছু গাছি এসে যখন দেখে রাগান্বিত হয়ে ফেলে দেয়। ভাগ্য ভাল হলে নেশা কেটে গেলে বাঁচতেও পারে অথবা মারাও যেতে পারে, তবে যে কর্মীটি সাধারণত অথর্ব হয়ে যায় সে আর কাজ করতে পারে না।

কীটনাশক : কীটনাশক মৌমাছির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক একটি বস্তু যা এদের পুরো কর্মকাণ্ডকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। কোন ফসলের জমিতে বিশেষ করে ফুলেল ফসলের জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করলে সেটা মৌমাছির জন্য বিরাট হুমকির কারণ। যদি মৌমাছিরা সে জমিতে পরাগ এবং নেকটার সংগ্রহ করতে আসে বা করে সেটা তাদের জন্য হুমকি আর যদি বাসায় নিয়ে মওজুদ করে এবং বাড়ন্ত ব্রুডদের খাওয়ায় সেগুলোর জন্যও হুমকি। এরূপ অবস্থায় মৌমাছির কলোনি টেকানো দুষ্কর ব্যাপার।

প্রাকৃতিক শত্রু : পিপড়া হলো মৌমাছির একটি বড় রকমের শত্রু। একবার পিপড়া কলোনিতে ঢুকে পড়লে সে কলোনি শেষ। কারণ পিপড়া কলোনির সব কিছুই খায়, যেমন— মধু, পরাগ, এমনকি মৌমাছি পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় করে দেয়।

মোম মথ : এটা হল আরেক সমস্যা। দু'ধরনের মোম মথের তথ্য রয়েছে আফ্রিকাতে একটি বড় অন্যটি ছোট। সাধারণত গরমের সময় এদের আক্রমণ হয়। বড় কলোনিগুলো এদেরকে প্রতিহত করতে পারে কিন্তু ছোট দুর্বল কলোনি তা পারে না। এদের বয়স্করা সাধারণত কলোনির কোনো ক্ষতি করে না তবে ডিম ফুটে যখন লার্ভা বের হয় এরা মোম খাওয়া শুরু করে এবং ভিতরে তাদের সুরক্ষিত সুরঙ্গ তৈরি করে এবং এমনি করে সমগ্র কোম্বগুলোকে এরা নিঃশেষ করে দিতে পারে। এরা যখন পিউপায় পরিণত হয় বাক্সের গায়ের কাঠে ছিদ্র করে তার ভিতর লুকিয়ে কোকুন তৈরি করে, এতে তারা বাক্সেরও যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মৌমাছি পালককে খুব সচেতন থাকতে হয় এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হয়। শক্তিশালী কলোনিতে এরা আক্রমণ করে না। *Acherontia atropos* নামক একটি মথও মৌমাছির ওপর আক্রমণ করে। তারা যা করে সেটা হলো মৌমাছির কলোনির কাছে গিয়ে (জুন–নভেম্বর) এক ধরনের শব্দ করে যার ফলে মৌমাছিরা নিথর হয়ে পড়ে (Paralized) সে সুযোগে কলোনিতে ঢুকে পেট পুরে মধু খেয়ে বের হয়ে যায়।

সরীসৃপ : আফ্রিকাতে সরীসৃপ (প্রায় ২৫ সেমি.) মৌমাছিদের জন্য একটি সমস্যা। এরা জীবিত বা মৃত সবধরনের মৌমাছিই খায় বলে জানা গিয়েছে।

বিভিন্ন কীটপতঙ্গ : কীটপঙ্গের মধ্যে রয়েছে একধরনের বোলতা, ম্যানাটিস, মাকড়সা, যেগুলো মৌমাছিদের খেতে খুব পছন্দ করে।

পাখি : আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলোতে আলপাইন সুইফট নামের একটি পাখি মৌমাছির যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে।

অন্যান্য প্রাণী : চাকের বিটল *(Aethina tumida)* যা মৌমাছির কলোনিতে পাওয়া যায় এদের সংখ্যা মধু উৎপাদনের সময়ে দ্রুত বাড়ে। এরা কিভাবে কলোনির ক্ষতি করে সে ব্যাপারে জানা যায়নি তবে এদের উপস্থিতির ফলে মধুর উৎপাদন কমে যায়। এছাড়া আরও রয়েছে *Pseudoscorpion* এবং *Braula*।

মৌমাছির বন্ধু

কিছু প্রাণী আছে মৌমাছির কলোনির ভিতরে বা আশে পাশে থাকে তবে কলোনির কোন ক্ষতি করে না। যেমন ছোট সবুজ সরীসৃপ, গেকো, ছোট ছোট ব্যাঙ এবং তেলাপোকা। এসকল প্রাণী অন্যান্য ক্ষতিকর পোকামাকড় যেমন— মোম, মথ, মাছি এবং মশা খেয়ে থাকে তবে তেলাপোকা কতটুকু বন্ধুসুলভ সে ব্যাপার জানার প্রয়োজন আছে।

মৌমাছির অসুখ

অন্যান্য প্রাণীর মতো মৌমাছিরও নানা রকম রোগ দেখা দেয়। এদের কোন কোনোটি এতই মারাত্মক যে, সব কলোনি নিমেষেই ধ্বংস করে দিতে পারে, তেমনি কতগুলি রোগের নাম এবং কারণ নিচে দেয়া হলো :

অসুখ	কারণ	লক্ষণ
১. American Foul Brood (AFB)	*Bacillus bacteria*	ব্রুড (Prepupa) মরে যায়
২. European Foul Brood (EFB)	*Melissococcus pluton* *Bacterium eurydice*	লার্ভা মরে যায়
৩. Stone brood	*Aspergillus*	লার্ভা মরে যায়
৪. Chalk brood	*Ascophaera apis* ছত্রাক	প্রি-পিউপা মরে যায়
৫. Sac brood	এক ধরনের ভাইরাস	লার্ভা মরে যায়
৬. Chilled brood	অতিরিক্ত ঠাণ্ডা	লার্ভা মরে যায়
৭. Bald brood	মোম মথ দিয়ে ছড়ায়	পিউমা মরে যেতে পারে, বিকলাঙ্গ মৌমাছির জন্ম হতে পারে
৮. Nosema	*Nosema apis* এক ধরনের এককোষী জীব	কর্মীর আয়ুষ্কাল কমে যায়, কর্মক্ষমতা হারায়
৯. Acarina disease	*Acarapis woodii*	মৌমাছির শ্বসনক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং একসময় মরে যায়

রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া

রোগ হলে মৌমাছি পালনকারীদের খুব সর্তক থাকতে হয় কারণ একটু অসতর্কতার দরুণ এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে প্রথমে একটি কলোনিতে, সেখান থেকে অন্যটিতে এবং এমনি করে এপিয়ারি থেকে অন্য এপিয়ারিতে। এ ব্যাপারটি ঘটে যখন মৌমাছিরা একটি আক্রান্ত মৃত লার্ভার দেহ (যেখানে ব্যাক্টেরিয়ার জীবাণু রয়েছে) সেল থেকে ফেলে দেয়ার জন্যে বের করে। মৌমাছির পালকরা এক কলোনি থেকে অন্য কলোনিতে কোম্ব বদলানোর সময় নতুন কলোনিকে আক্রান্ত করে। এভাবে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। আক্রান্ত অথবা দূষিত মধু সুস্থ কলোনিকে খাওয়ালেও এ রোগ ছড়াতে পারে। তাই যে কোনো রোগের প্রতিরোধ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হয় :

১. এপিয়ারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ;

২. যেখানে সেখানে আক্রান্ত কলোনির বর্জ্য না ফেলা। আক্রান্ত কোম্ব স্থানান্তর না করা ;

৩. যে কোনো যন্ত্রপাতি এবং কলোনির অংশ অন্যত্র থেকে আনা হলে ভাল করে শোধন করে নিতে হবে ;

৪. মৌমাছির অসুখ শুরু হলে নতুন কলোনি খুব সাবধানে এপিয়ারিতে আনতে হবে ;

৫. মৌমাছিগুলোকে কখনো দূষিত মধু খাওয়ানো উচিত হবে না ;

৬. আক্রান্ত কলোনির কোনো কিছুই যেন যেকোনো উপায়ে হলেও অন্য কোনো কলোনিতে/এপিয়ারিতে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত কলোনির রোগের কারণ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে ;

৭. সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো প্রতিনিয়ত কলোনিকে চোখের নজরে রাখতে হবে, কোনো অসুবিধে হলো কি-না তা দেখার জন্য ;

৮. বাক্সগুলি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে যেন খুব কাছাকাছি না হয়ে যায়, যার ফলে কর্মীদের নিজ নিজ কলোনি খুঁজে বের করতে সুবিধা হয় ।

নবম অধ্যায়

ইউরোপের মৌমাছি

মৌমাছি সম্পর্কিত গবেষণায় ইউরোপের কয়েকটি দেশ সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে, এগুলো হলো বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি। এসব দেশগুলোতে মৌমাছি নিয়ে উন্নতমানের গবেষণা হচ্ছে এবং তারা তাদের মৌমাছিকে খুব স্বার্থকতার সাথে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। Apidae গোত্রের একটি প্রজাতিই সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেটি হলো *Apis mellifera*। এটি শুধু ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মধু উৎপাদন এবং পরাগায়নের জন্য। এর বিস্তৃতি বাংলাদেশের মতো একটি নবীন এপিকালচারের দেশেও এসে পড়েছে। অতি সাম্প্রতিককালে *A. mellifera* বাংলাদেশে পালনের পরিকল্পনা চলছে। যদিও এর পরিবেশগত কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি অর্থাৎ এদেশের বাস্তব্যতন্ত্রে এর কি ফল হতে পারে তা ভাবা হয়নি। এরই মধ্যে দেশের প্রায় সর্বত্রই যারা মৌমাছি পালন করে তাদের দিয়ে *A. mellifera* এর চাষ চলছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে *A. mellifera* এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। অবশ্য এ আলাদা নামের কারণও রয়েছে। যা ওদের রঙ, ব্যবহার, শারীরিক গঠনের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।

জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডে *A. mellifera*-এর পরিচিতি *A. m. lehzeni* হিসেবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে যেসব *Apis* মৌমাছি পাওয়া যায় সেগুলো হলো : *A. m. iberica* এটি পাওয়া যায় ইবেরিয়ান পেনিনসুলায় (Iberian Peninsula) এবং উত্তর পশ্চিম স্পেনে (Santiago *et al.*, 1986)।

A. m. mellifera এ মৌমাছিটিকে ইউরোপীয় কালো মৌমাছি বলা হয়। পাওয়া যায় ফ্রান্স, বৃটিশ দ্বীপগুলোতে সঙ্গে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডেও। এছাড়া মধ্য ইউরোপ, উত্তর পোল্যান্ড এবং রাশিয়ার উড়াল পর্বতের পূর্বে।

A. m. ligustica.–এটি পাওয়া যায় ইটালিতে। *A. mellifera.*–এর এ উপপ্রজাতিটি সারা পৃথিবী জুড়েই এপিকালচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়ে থাকে। কারণ এরা যে কোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাছাড়া শান্ত স্বভাবের এবং প্রচুর মধু উৎপাদন করতে সক্ষম। নিজেদের প্রয়োজনে এরা খুবই অল্প মধু ব্যবহার করে। আর এদের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পলায়নের প্রবণতাও কম।

A. m. sicula–একে পাওয়া যায় বুলগেরিয়া এবং উত্তর গ্রিসে।

A. m. cecropia–এটি পাওয়া যায় দক্ষিণ গ্রিসে।

A. m. macedonica–এটি পাওয়া যায় বুলগেরিয়া এবং উত্তর গ্রিসে।

A. m. carnica–এটি পাওয়া যায় অস্ট্রিয়া, বর্তমান রাশিয়ার সম্মিলিত দেশগুলোতে (CSSR), হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া।

জানা গিয়েছে, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ উপ-প্রজাতির *A. mellifera* আছে (Rutner, 1988)। এটি দেখতে *A. cerana*-এর মতোই তবে অন্যান্য পার্থক্যের সাথে একটি বড় পার্থক্য হলো এর আকার। আকারে *A. mellifera* একটু বড় *A. cerana* থেকে। এরাও *A. cerana* এর মতো একটি কলোনিতে অনেক কোম্ব তৈরি করে। *A. mellifera* খুব সহজেই বাক্সে রেখে পালন করা যায়, কারণ এরা শান্ত স্বভাবের এবং বাক্সে স্বচ্ছন্দ্যে প্রচুর মধু উৎপন্ন করতে সক্ষম। যেসব কারণে এদের মৌমাছি পালনে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যবহার করা হয় তার প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. প্রচুর মধু এবং মোম উৎপন্ন করতে সক্ষম ;
২. কষ্ট-সহিষ্ণু এবং খাদ্যের অন্বেষণে অনেক দূরত্বেও এরা যায় ;
৩. মৌচাকের বর্ধন খুবই দ্রুত ;
৪. কলোনির আকার বড় হয় ;
৫. রানি প্রচুর ডিম দিতে সক্ষম ;
৬. স্বভাব খুবই শান্ত ;
৭. প্রোপলিস সংগ্রহ করে ;
৮. মধু সংরক্ষণ করে এবং নিজেরা কম ব্যবহার করে ;
৯. পলায়ন করার প্রবণতা কম ;
১০. কৃত্রিম প্রজনন সহজ ;
১১. ফল ও ফসলের পরাগায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সারা ইউরোপের প্রায় সব দেশেই মৌমাছির চাষ হয়ে থাকে মধু উৎপাদন, পরাগায়ন এবং অন্যান্য মৌপদার্থ উৎপাদনের জন্য, যেমন— মোম, প্রোপলিস, মৌবিষ এবং রয়েল জেলি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মৌমাছি পালনে ইউরোপের দেশগুলো অনেক অনেক এগিয়ে আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায়। মৌমাছির রোগ-বালাই, কৃত্রিম পরিবেশে উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনা এখন ইউরোপের দেশগুলো সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

ইউরোপের দেশগুলো মৌমাছি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালন করছে। সেখানে এখন মৌমাছি পালন একটি অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপে মৌমাছি পালন যে যে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তার অন্যতম হলো ফসলের পরাগায়ন। মৌমাছি অনেক ফল ও ফসলের জন্য অতীব জরুরি এবং সেখানে পলিনেটর ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয় বা লাভজনক নয়। এর প্রধান একটি কারণ হলো সেসব

দেশগুলোতে অনেক ফসলেরই চাষ হয় গ্রিনহাউজে যেখানে প্রাকৃতিক পলিনেটর ঢুকতে পারে না।

সারণি ৯.১ : বিভিন্ন প্রজাতির *Apis* মৌমাছির দৈহিক আকারের তুলনামূলক ফলাফল Ruttner থেকে উদ্ধৃত।

প্রজাতি	কর্মী মাথা (mm)	পাখনা (mm)	রানি মাথা (mm)	পাখনা (mm)	ড্রোন মাথা (mm)	পাখনা (mm)
A. florea	2.60±0.03	6.25±0.10	3.19	8.49	3.70±0.04	9.23±0.13
A. cerana	3.38±0.06	7.54±0.14	3.65	9.41	3.60±0.04	9.01±0.11
A. mellifera	3.77±0.04	9.32±0.10	3.75	9.92	4.52±0.07	12.24±0.51
A. dorsata	4.71±0.09	12.34±0.34	4.81	12.78	4.60±0.07	13.35±0.26

মৌমাছি পালন ইউরোপে বিশেষ জরুরি এ কারণে প্রকৃতিতে প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যা অনেক কম। কারণ হিসেবে আরও বলা হয়েছে যে, সেখানে পরাগায়ন করা প্রয়োজন তেমন ফসলের চাষ অনেক বেড়েছে এবং বাসস্থান বিনষ্ট হওয়ার ফলে প্রকৃতিতে মৌমাছির সংখ্যা কমে গিয়েছে।

ইউরোপে প্রাকৃতিক পরিবেশে Apidae গোত্রের ভ্রমর (Bumble bee) পাওয়া। এ ভ্রমর *(Bombus)* এতই উপকারী যে, ইউরোপের পরাগায়নের একটি বিরাট অংশ এরাই সমাধান করে থাকে। সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হলো *Bombus terrestris,* যা এখন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ফল/ফসলের পরাগায়নের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, *B. terrestris* বেশি ব্যবহার হচ্ছে টমেটো-এর পরাগায়নে। ইউরোপে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি বন্য মৌমাছি হলো *Megachile rotundata, B. lucorum, B. ruderatus, B. hortorum, B. pascuorum* ইত্যাদি।

এখানে একটি তথ্য দেয়া জরুরি যে, উনিশ শতকের পূর্বে নরওয়েতে কোনো মৌচাষ হতো না ; বর্তমানে সেখানে অর্থনৈতিক মুনাফার জন্য মৌচাষ করা হয়। রাশিয়ার অনেক এলাকাই এখন মৌমাছির জন্য খুব সুন্দর স্থান। বাশকিরিয়া (Bashkiria) এবং দক্ষিণ উড়ালের লাইম ফরেস্ট (Lime Forest) এ প্রচুর বন্য কলোনি রয়েছে। যদিও সেখানে শীতকালের তাপমাত্রা ৪৫° সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে।

দশম অধ্যায়

কৃষিকাজে পলিনেটরের ভূমিকা

পলিনেটরের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী খুব কমই অবগত। শস্য পরাগায়নে পলিনেটরের ব্যবহার আমাদের দেশে একটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা, যা মূলত শুরু হয়েছে সামাজিক মৌমাছির ব্যবহারের মাধ্যমে। যদিও অন্য আর একটি বিশাল গ্রুপ রয়েছে যারা পরাগায়ন ক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তাদেরকে বলা হয় বন্য মৌমাছি বা অমৌমাছি। পরাগায়ন প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে হলে আমাদেরকে এ দু'ধরনের পলিনেটরকেই উন্নত করা প্রয়োজন।

পরাগায়ন সম্পর্কে জানতে হলে এ বিষয়টি আরও গভীরভাবে আমাদেরকে জানতে হবে অর্থাৎ পরাগায়ন কি, কিভাবে সংঘঠিত হয় এবং কত প্রকার ইত্যাদি।

পরাগায়ন ও এর প্রকারভেদ

পরাগায়ন হলো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ফুলের পুংগ্যামেট এবং স্ত্রীগ্যামেট মিলিত হয়ে বীজের সৃষ্টি করে।

পরাগায়ন দুপ্রকার ; স্বপরাগায়ন ও পরপরাগায়ন। নিচে এদের বর্ণনা করা হলো :

১. **স্বপরাগায়ন** (Selfing or self- pollination) : স্বপরাগায়ন একই ফুলের মধ্যে ঘটে থাকে (চিত্র ১০.১)। এ ধরনের পরাগায়নের ইকোলজিক্যাল এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই গৌণ। এতে জিনের পুনঃবিন্যাস (gene recombination) এর কোনো সম্ভাবনাই নেই ফলে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ঘটার বিষয়টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় এর ফলে অনেক ধরনের বন্য উদ্ভিদ ও চাষ করা উদ্ভিদে উৎপাদন এবং বৃদ্ধি এ দুইই অপ্রতুল হতে পারে।

২. **পরপরাগায়ন** (Out crossing or cross- pollination) : এটি একই প্রজাতির ভিন্ন গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে ঘটে (চিত্র ১০.১)। এর মাধ্যমে জিনের পুনঃবিন্যাস (gene recombination) ঘটতে পারে এবং উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতা (variability increase) বাড়তে পারে যার ফলে নতুন জাত (varieties) ও গুণের (retrains) উদ্ভিদের উৎপত্তি এমনকি নতুন প্রজাতিরও সৃষ্টি হতে পারে।

উদ্ভিদের পরপরাগায়ন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরাগ এক ফুল থেকে অন্য ফুলে স্থানান্তরিত হতে হলে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ কোনো না কোনো পলিনেটরের বা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। নিচে তার বর্ণনা দেয়া হলো।

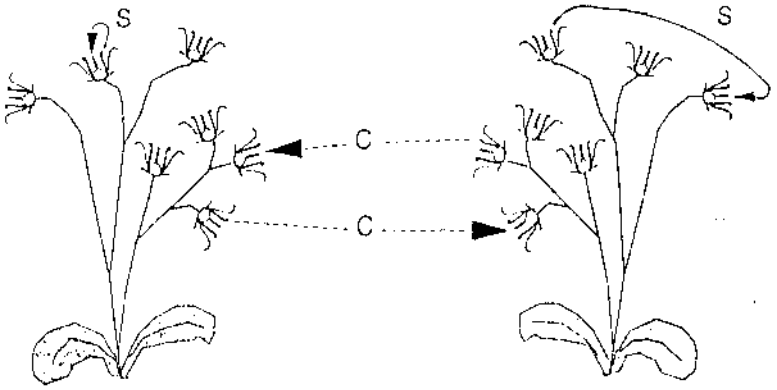

চিত্র ১০.১ : স্বপরাগায়ন এবং পরপরাগায়নের চিত্র

১. অজৈব মাধ্যমে (gravity-pollination বা মাধ্যাকর্ষণজনিত পরাগায়ন, পানিবাহিত পরাগায়ন, বায়বীয় পরাগায়ন) ;

২. জৈব মাধ্যম (কীটপতঙ্গ যেমন— বিটল, মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ, ইত্যাদি ; অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন— শামুক, Slugs; মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন— পাখি, বাদুর ইত্যাদি (রঙিন চিত্র ২০, ২১)।

মূলত বায়ু, পানি এবং মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে পর পরাগায়ন খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর কার্যকারীতা প্রায় অনিশ্চিত। কিন্তু কীট-পতঙ্গ তথা মৌমাছির দ্বারা পরাগায়ন (পরপরাগায়ন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা উদ্ভিদে বিবর্তন (evolution) ঘটাতে সাহায্য করে থাকে।

বিভিন্ন প্রজাতির এবং বিভিন্ন গ্রুপের পতঙ্গের পরাগায়ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, তার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত পরাগায়ন ক্রিয়ার অস্তিত্ব পাওয়া যায় :

১. কীটপতঙ্গ দিয়ে পরাগায়ন (Entomophily) :
২. বিটল দিয়ে পরাগায়ন (Cantharophily) ;
৩. মাছির পরাগায়ন (Myophily) ;
৪. মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন (Melittophily) ;
৫. প্রজাতির পরাগায়ন (Psychophily) ;
৬. মথ দিয়ে পরাগায়ন (Phalaenophily) ;
৭. শামুক এবং slugs দিয়ে পরাগায়ন (Malacophily) ;

৮. বাতাস দিয়ে পরাগায়ন (Anemophily) ;
৯. পাখি দিয়ে পরাগায়ন (Ornithophily) ;
১০. বাদুর দিয়ে পরাগায়ন (Chiropterophily) ;
১১. প্রাণী দিয়ে পরাগায়ন (Zoophily)।

সব ধরনের পলিনেটর সব ধরনের উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটাতে সক্ষম নয় (এ বিষয়ে ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। একটি নির্দিষ্ট পলিনেটর যে কোনো বিশেষ কারণে একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটায়। যেমন ছোট জিহ্বাযুক্ত (Short tongued bee) মৌমাছিরা বড় ফুলের নেকটার নিতে পারে না বলে তারা ওসব ফুলে পরাগায়ন ঘটাতে পারে না এবং সাধারণত সেখানে ভ্রমণও করে না। যদিও ভ্রমণ করে থাকে এদের কেউ কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করে বসে, সেটা হলো ঐসব মৌমাছিরা ফুলের দলমণ্ডলের (corolla) গোড়ায় ছিদ্র করে সেখান থেকে নেকটার সংগ্রহ করে নেয় ফলে পরাগায়নক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ ঘটনাকে নেকটার ছিনতাই বা নেকটার লুণ্ঠন (nectar robbing) বলা হয়।

অন্যদিকে বড় জিহ্বাযুক্ত মৌমাছিরা (long tongued bee) কখনো ছোট ফুলের মধু খেতে যায় না। আসলে এ ব্যাপারগুলো প্রাকৃতিকভাবে পলিনেটরেরা ঠিক করে নিয়েছে এবং এর ফলে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বাস্তব্যতন্ত্রে (ecosystem) পলিনেটরের মধ্যে খাদ্যের অন্বেষণে প্রতিযোগিতা নেই বললেই চলে। বিপর্যয় ঘটে তখনই যখন কোনো বিদেশি (exotic/alien species) বা অন্যত্র থেকে কোনো প্রজাতি হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হয়। সেক্ষেত্রে সেখানে স্থানীয় প্রজাতির সঙ্গে খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পলিনেটরের সংরক্ষণ

আমাদের জন্য পলিনেটর সংরক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বাগ্রে যে কারণটি বলতে হয় সেটি হচ্ছে, উদ্ভিদের যৌনজনন প্রক্রিয়া (cross fertilization) যা প্রধানত কীট-পতঙ্গ তথা মৌমাছির সাহায্যেই হয়ে থাকে। একটি জীবের সার্থকতাই হলো যৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা এবং যেহেতু এ মুখ্য কাজটির দায়িত্ব বৃহদাংশে পালন করে থাকে পলিনেটর তাই এদের সংরক্ষণ অতীব জরুরি। আমরা যদি পলিনেটর সংরক্ষণ করি তাহলে উদ্ভিদ বাড়বে, আর উদ্ভিদ বাড়লে পলিনেটরও বাড়বে। পলিনেটর এবং উদ্ভিদ সংরক্ষিত হলে আমাদের বাস্তব্যতন্ত্রে (ecosystem) প্রজাতির বৈচিত্র্যও বেড়ে যাবে। আর তাই পলিনেটর এবং তাদের ব্যবহৃত উদ্ভিদের সংরক্ষণের মানেই হলো বাস্তব্যতন্ত্রের (ecosystem) সংরক্ষণ।

পলিনেটরের গুরুত্ব

পলিনেটরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এখন আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। কারণ পলিনেটর ব্যবহার করলে ফসলের ফলন বাড়ে, ফসল সুন্দর হয়, এমন আরও অনেক ধরনের সুফল পাওয়া যায়। কোনো কোনো উদ্ভিদ আছে যাদের ক্রস পরাগায়ন ছাড়া কখনই ফল এবং বীজ হয় না। আর হলেও অর্থনৈতিকভাবে খুবই লোকসানের কারণ হয়, যেমন—ডুমুর,

নাসপাতি, টমেটো ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদে একটি নির্দিষ্ট রকমের পলিনেটর ছাড়া পরাগায়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না।

মানুষ যতই বাড়ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদাও বাড়ছে যেমন—কৃষিপণ্য, বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি। আর তাই বীজের ফলন, মান এবং এর উর্বরতা বাড়াতে পলিনেটরদের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি রূপ ধারণ করেছে। ফলে উন্নত দেশগুলোতে এদের যথেষ্ট ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগায়নের জন্যে সামাজিক মৌমাছি এবং কিছু স্বতন্ত্র মৌমাছি ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্বপরাগায়নের ফলে জিনের পুনর্বিন্যাস (gene recombination) হয় না। এক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যের (homozygosity) কারণে প্রজাতির বৈচিত্র্য (variability) ঘটে না। আর তাই উদ্ভিদের নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে যায়। হোমোজাইগাস (homozygous) উদ্ভিদ খর্বাকায় হতে পারে এবং তাদের ফলনও কম হয়।

অন্যদিকে পর-পরাগায়ন আলাদা বৈশিষ্ট্যের (heterozygosity) উদ্ভব ঘটায় এবং জিনের পুনর্বিন্যাস (gene recombinatio)-এর সুযোগ থাকে, এর ফলে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য (variability) বাড়ে এবং নতুন প্রকার (new varieties), গুণ (strains) এমনকি নতুন প্রজাতি পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। বাতাস, পানি এবং মধ্যাকার্ষণের মাধ্যমে পর-পরাগায়ন, জীবের সাহায্যে পর-পরাগায়নের চেয়ে গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ। কিন্তু কীট-পতঙ্গের সাহায্যে বিশেষ করে মৌমাছির পর-পরাগায়ন অত্যন্ত কার্যকরী এবং উদ্ভিদের বিবর্তনে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মৌমাছিদের পরাগায়নের ফলে যেকোনো ধরনের উদ্ভিদে বীজের আধিক্য ঘটে। তাই উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হলে বাস্তব্যতন্ত্রের (ecosystem) পরাগায়ন প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখতে হবে আর সঙ্গত কারণেই আমাদেরকে প্রাকৃতিক পলিনেটরদের সংরক্ষণ করতে হবে।

কৃষিতে পলিনেটরের ভূমিকা

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের পলিনেটর সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত কম। আর সঙ্গত কারণেই এরা জানেন না কি করে এদের রক্ষা করা যায়, যার কারণেই এদের উপকার থেকেও বঞ্চিত হন এ দেশের কৃষকরা। পলিনেটরদের ব্যবহার আমাদের দেশে অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা যার শুরু হয়েছে প্রধানত সামাজিক মৌমাছি (honey bee) দিয়ে (Hannan, 2001)। যদিও অন্য একটি বিরাট পলিনেটর গ্রুপ রয়েছে যাদেরকে বলা হয় বন্য মৌমাছি (wild bee) অথবা অমৌমাছি (non-honey bee); এরাও অনেক ফসলের অত্যন্ত সার্থকভাবে পরাগায়ন ঘটাতে সক্ষম। আমাদের কৃষির উন্নতি করতে হলে এসব পলিনেটরের (সামাজিক মৌমাছি এবং অমৌমাছি) অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে নচেৎ কোনো অবস্থাতেই এর অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

পলিনেটরের ব্যবহার করতে হলে আমাদের জানতে হবে এদের জীবনবৃত্তান্ত, পরাগায়ন ক্ষমতা, কোন ফুলে কোনটি পরাগায়নে সমর্থ এবং পরাগায়নের আরও অনেক কথা (যেমন পরাগায়ন কিভাবে, কেন, কখন সংঘটিত হয়, কতো প্রকারে পরাগায়ন হতে পারে ইত্যাদি)।

পরাগায়ন ছাড়া ফসলের উন্নয়ন এবং উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, আর সে পরিমাণ উন্নতও করেছে তাদের কৃষিকে। আমাদের কৃষির উন্নতি করতে হলে আমাদের দেশেও এ ধরনের গবেষণা হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে পলিনেটর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি (পলিনেটরের ব্যবস্থাপনা এবং পতঙ্গ উৎপাদনের শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। যদি পলিনেটরের ব্যবস্থাপনা সার্থক করা যায়, সেক্ষেত্রে নিম্নরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব :

১. শস্যের মান উন্নয়ন ;
২. নিয়মিত মধু আহরণ ;
৩. কর্ম সংস্থানের নতুন আর এক পথের উদ্ভাবন।

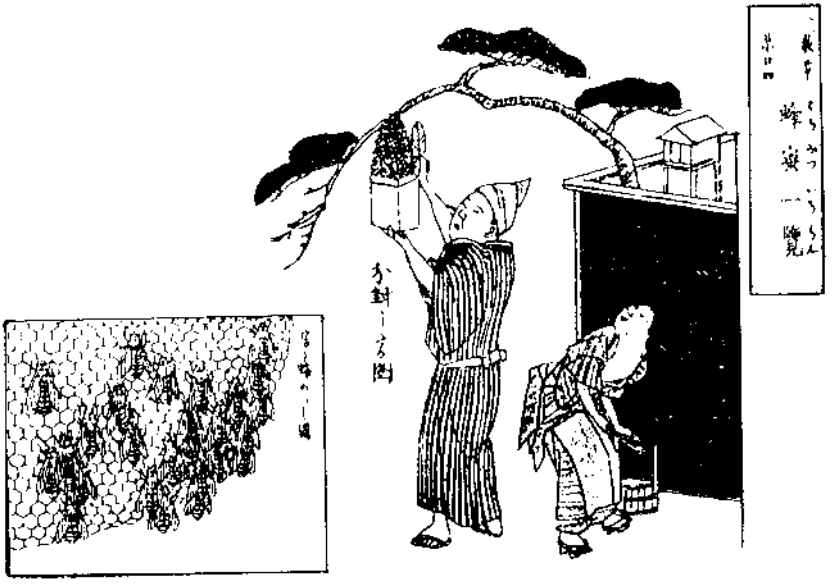

চিত্র ১০.২ : প্রাচীন জাপানে মৌবাক্স সংরক্ষণ ও মৌমাছি পালনের একটি চিত্র

গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, পলিনেটরের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আসে। বিশেষ করে যেসব ফসলে পর-পরাগায়ন প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে পলিনেটর ব্যবহার করা না হলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দেখা যায় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭১ সালে মৌমাছিদের পরাগায়নের ফলে উৎপাদিত শস্য থেকে আয় হয়েছিল ৯.৫ বিলিয়ন ডলার যা ১৯৮৩-তে এসে উন্নিত হয়েছিল ১৮.৯ বিলিয়ন ডলারে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোনো পরিসংখ্যান

নেই, তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যদি আমরাও আমাদের কৃষিতে পলিনেটর ব্যবহার করতে শুরু করি এবং দিনে দিনে অবস্থার উন্নতি করতে পারি তাহলে আমাদের দেশেও এর আর্থিকভাবে উন্নয়ন সম্ভব।

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে শস্য চাষিরা মৌমাছির কলোনি ব্যবহার করছে। তারা বলেছে যে, মৌমাছি ব্যবহারের ফলে ফলন বেড়েছে। শুধু তাই নয় এই মৌমাছির কলোনি জমিতে রাখার ফলে এদের মধু উৎপাদনের পরিমাণও বেড়েছে। তারা বলেছে উৎপাদন মৌসুমে প্রতি কলোনিতে সপ্তাহে ১০ কেজি পরিমাণ মধু আহরণ করা সম্ভব এবং এর থেকে অতিরিক্ত ২৫০০.০০ টাকা উৎপাদন করতে সক্ষম। এর থেকে বোঝা যায় মৌমাছি ব্যবহার করে আমাদের ফসল উৎপাদনে নিম্নোক্ত ধরনের সুবিধা অর্জন সম্ভব :

১. অধিক ফসল ;
২. উন্নত মানের ফসল ;
৩. অধিক অর্থ উপার্জন।

পলিনেটরের অবদান আমাদের কৃষিতে অনন্য। যদিও অনেক ধরনের পলিনেটর রয়েছে তারপরেও নিম্নোক্ত কারণে মৌমাছির (সামাজিক ও স্বতন্ত্র) পরাগায়নে অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ :

১. বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ;
২. শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ;
৩. ফলের স্বাদ বাড়ে ;
৪. ফলের আকার বৃদ্ধি পায় ;
৫. ফলের আকারের বিকৃতি রোধ করে ;
৬. ফল দেখতে সুন্দর হয় যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে সামর্থ হয়।

মৌমাছিরা (সামাজিক মৌমাছি) শুধু মধুই উৎপাদন করে না সাথে সাথে উৎপন্ন করে মোম এবং প্রোপলিস, যা প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনে খুবই জরুরি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকার পদার্থ। তাই বহুবিধ কারণেই আমাদেরকে এ মৌমাছিদের সংরক্ষণ করতে হবে।

উন্নত দেশগুলোতে মৌমাছিপালন ব্যবসা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মধু উৎপাদনের চেয়ে এর পরাগায়ন ক্রিয়ার জন্যে। আমেরিকা এবং জাপানে শুধু পরাগায়ন করানোর উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়ার জন্যে প্রচুর মৌমাছির বাক্স তৈরি করা হয়। অবশ্য এর পাশাপাশি মধু তাদের জন্যে অতিরিক্ত পাওয়া হিসেবে গণ্য। সত্যি বলতে বাক্স ভাড়া দিয়ে তারা যে আয় করেন মূলত তা মধু, মোম এবং প্রোপলিসের মূল্যের চেয়েও অনেক বেশি। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লক্ষ্য করা গিয়েছে।

১. মৌমাছিদের পরাগায়নে ব্যবহারের প্রবণতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বছরের পর বছর বাড়ছে ;
২. মৌমাছির উৎপাদান চাহিদাও দিনে দিনে বাড়ছে।

আমাদের দেশেও যদি বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছির উৎপাদন করা যেতো সেটা একদিকে আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে পারত অন্যদিকে এতে নতুন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতো।

সামাজিক মৌমাছি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এদের বাসাকে (hive) স্থানান্তর করা নিয়ে। শুধু তাই নয় এদের অনেক রোগবালাইও রয়েছে। আর সে কারণেই বিজ্ঞানীরা এর বিকল্প হিসেবে অমৌমাছি বা বন্য মৌমাছিদের নিয়ে গবেষণা করেছেন যাতে এদেরকে পরাগায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়। বন্য মৌমাছিদেরকে পলিনেটর হিসেবে ব্যবহার করে এ বিষয়ে অভূতপূর্ব এক ফল পাওয়া গিয়েছে। বন্য মৌমাছিরা পরাগায়নে সামাজিক মৌমাছির চেয়ে অনেক অনেক গুণে দক্ষ এবং এদের সংখ্যা অনেক কম হলেও চলে। আর এদের বাসা স্থানান্তর খুবই সহজ। এসব কারণে উন্নত দেশগুলো এদের ব্যবহারের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহশীল।

আমাদের উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হলে এদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার ফলে বন্য মৌমাছিদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কৃষির উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে হয়তো অন্যান্য অনেক দেশের মতোই এসব বন্য মৌমাছিদের বিদেশ থেকে আমদানিও করতে হতে পারে।

আমাদের দেশের মৌমাছিরা যে যে কারণে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তা হলো—বৃক্ষনিধন, বন উজাড়, পাহাড় কাটা এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য বিষয়। তাই এদের অবস্থার উন্নয়নকল্পে কৃষিক্ষেত্রের সন্নিকটে এদের আবাসভূমির ব্যবস্থাপনা ছাড়া (habitat management) অন্য কোনো বিকল্প নেই (এ বিষয়ে দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। এ ব্যাপারে আমাদের অনেক অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে, সেটা সম্পন্ন হলেই বলা যাবে কোন ফসলের জন্যে কোন মৌমাছি সবচেয়ে বেশি সফল পলিনেটর। এমন একসময় আসবে যখন হয়তো এদেরকে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করার প্রয়োজন হতে পারে। আর সে সময় এদের ব্যবস্থাপনা নিয়েও আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন হবে।

যে কোনো ফসলের পরাগায়নের উদ্দেশ্যে শুধু এক ধরনের পলিনেটর ব্যবহার করলে সেটা একটি বিরাট ঝুঁকির কারণ হতে পারে। সেজন্যে মৌমাছি এবং অমৌমাছি উভয়েই যাতে ব্যবহার করা যায় সেভাবেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এদের ব্যবস্থাপনা করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

১. একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের একটি নির্দিষ্ট পলিনেটর বাছাই করতে হবে ;

২. এদের জীবনবৃত্তান্ত, ফুলে ভ্রমণের ব্যবহার/আচরণ ইত্যাদি জানতে হবে ;

৩. ভ্রমণ ক্ষমতা জানতে হবে ;

৪. পরাগায়ন ক্ষমতা জানতে হবে ;

৫. প্রয়োজনে এদের প্রাপ্যতা সহজ হতে হবে।

প্রফেসর Macta (1990)–এর মতে স্বতন্ত্র মৌমাছির ব্যবস্থাপনার চিন্তা করলে প্রজাতি বাছাইয়ের জন্যে নিচের বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

১. প্রজাতিটি দলবদ্ধ (gregarious) হয়ে থাকে এমন হতে হবে, যাতে যেখানে রাখা হয় সেখানে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় ;

২. যে শস্যের পরাগায়ন করানো হবে তার প্রতি digolecty দেখাতে হবে ;

৩. প্রজাতিটি যেন মানুষের তৈরি স্থানে অর্থাৎ কৃত্রিম পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত হয় ;

৪. প্রজাতিটি এমন হতে হবে যেন কোনো পরজীবী বা রোগের সমস্যা না থাকে অথবা নিজেদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকতে হবে ;

৫. উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায় ;

৬. যে ফসলের পরাগায়ন করবে তার ফুল ফোটার সঙ্গে প্রজাতিটির উদ্ভয়নকালের মিল থাকতে হবে, যাতে দেখা যায় যে পলিনেটরটির ভ্রমণকাল ফুল ফোটার সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

একাদশ অধ্যায়

শস্য পরাগায়ন ও বন্য মৌমাছি

বন্য মৌমাছি (wild bee) কথাটির ব্যবহার আমাদের দেশে একেবারেই নতুন। কিন্তু এ শব্দটির প্রচলন শুরু হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে (Bohart, 1970) যদিও এদের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো Darwin (1859) এর সময় থেকেই।

মৌমাছি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি Apinae উপগোত্রের যে কটি প্রজাতি রয়েছে তাদেরকেই যেমন—*Apis mellifera, A. cerana, A. florea, A. dorsata, A. laboriosa, A. breviligula, A. koschevnikovi , A. nuluensis, A. nisrocincta* এবং *A. andreniformis* (Smith 1991)। এদের সবগুলোই সামাজিক মৌমাছি (social bee)। বন্য মৌমাছিদের পরাগায়নে ব্যবহারের পুর্বে *Apis* গণের মৌমাছিগুলোই ছিলো শস্য পরাগায়নের প্রধান উপায়।

বন্য মৌমাছিদের আসল পরিচয় হলো এরা সামাজিক নয় এবং নিজেদের পছন্দমতো প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতেই পছন্দ করে। সাধারণত আমরা এদেরকে মৌমাছির থেকে আলাদা করতে পারি না এবং অনেক ক্ষেত্রে মৌমাছিই মনে করি ফলে এদের সংখ্যা অনুমান করতে পারি না। আসলে এদের সংখ্যা সামাজিক মৌমাছিদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি এবং সত্যি বলতে শস্য পরাগায়নে এদের ভূমিকা সামাজিক মৌমাছিদের থেকেও বহুগুণে বেশি। উন্নত দেশে যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ এদেরকে ব্যবহারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্য মৌমাছিদের বেশির ভাগই স্বতন্ত্র মৌমাছি (solitary) তবে কিছু সামাজিক প্রজাতির বন্য মৌমাছিও রয়েছে ; এ ছাড়া স্বতন্ত্র নয় কিন্তু সামাজিকও নয় (non-social) এমন প্রকারের বন্য মৌমাছি অনেকই রয়েছে। এদেরকে অনেক সময় অমৌমাছি (non-honeybee) বলেও অভিহিত করা হয়। কারণ এরা মৌমাছির মতো সাধারণত মধু সঞ্চয় করে না, একমাত্র *Bombus* গণ এর প্রজাতিগুলো ছাড়া।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির বন্য মৌমাছির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের অনেকগুলোই আমাদের দেশে রয়েছে। কৃত্রিম শস্য পরাগায়নের প্রথম পর্যায়ে সামাজিক মৌমাছির ব্যবহারই অধিক ছিলো। কারণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদের সম্পর্কে বেশ ভালো জানা ছিলো এবং সহজেই এদেরকে ব্যবস্থাপনায় আনা যেত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল তার সাথে সাথে অন্যান্য মৌমাছিদের উপর বিজ্ঞানীদের জ্ঞানও বাড়তে লাগলো বিশেষ করে শস্য পরাগায়নে এদের ভূমিকার ক্ষেত্রে। সবদিক বিচার করলে এখন দেখা যায় যে, শস্য পরাগায়নে বন্য মৌমাছি সাধারণ মৌমাছিদের তুলনায় অনেক দিক থেকেই উত্তম ; যেমন— এরা কম ব্যয় সাপেক্ষ, অধিক কর্মক্ষম, কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং সংখ্যায় অনেক কম প্রয়োজন হয়।

চিত্র ১১.১ : মিষ্টি কুমড়ার ফুলে পরাগায়নরত একটি ভ্রমর

আমাদের দেশে এখনো পুরোপুরি শস্য পরাগায়ন এবং এর সুফল সম্পর্কে চিন্তা শুরু হয়নি যদিও উন্নত দেশগুলোতে বহুপূর্ব থেকেই এর ব্যবহার হচ্ছে। যার পরিণামে আমাদের দেশে ভাল ফুল ও বীজ উৎপাদন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং সঙ্গত কারণেই আমাদেরকে ভালো বীজ সংগ্রহের জন্যে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয় ।

খুব সাধারণভাবে বললেই বোঝা যাবে যে, যদি শীতের সরিষা ফুল কিংবা আম, জাম, বেল ইত্যাদি গাছের ফুলগুলো দেখা যায় সেখানে দৃষ্টিগোচর হবে অনেক অনেক পতঙ্গ ফুলের উপর উড়ছে এবং নেকটার অথবা পরাগ অথবা দুই-ই সংগ্রহ করছে। এদের অনেকেই হলো বন্য মৌমাছি।

এসব মৌমাছিদের কারণেই আমরা কৃত্রিম পরাগায়ন করা ছাড়াই ফল ও বীজ পেয়ে থাকি অনেক ক্ষেত্রেই এবং এজন্যে আমাদের কোনো চিন্তাই করতে হয় না।

উন্নত দেশগুলোতে শস্য পরাগায়নের চিন্তাটা খুবই প্রকট। কারণ, মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন করানো ফলের স্বাদ প্রাকৃতিকভাবে কিংবা কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন করানো ফলের স্বাদের চেয়ে অনেক উচ্চমানের হয়ে থাকে। ফলে সমপরিমাণ টমেটো যাতে পতঙ্গ পলিনেটর (insect pollinator) ব্যবহার করা হয়েছে তার মূল্য স্বাভাবিকভাবেই সেসব টমেটোর চেয়ে বেশি যাতে পতঙ্গ পলিনেটর (insect pollinator) ব্যবহার করা হয় নি।

বন্য মৌমাছি শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা Darwin (1859), Sladen (1912), Proctor *et. al.* (1996) এবং আরও অনেক বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে বলেন এবং তখন থেকেই চারটি প্রজাতির বন্য মৌমাছি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার হয়ে আসছিলো যেমন :

১. ক্ষারীয় মৌমাছি (Alkali bee) —*Nomia melanderi*
২. আলফালফা পাতাকাটা মৌমাছি— (Alfalfa leaf cutting bee) *Megachile rotundata*
৩. মেশন মৌমাছি (Mason bee)—*Osmia lignaria propinqua*
৪. শিং-মুখো মৌমাছি (Horned faced bee) —*Osmia cornifrons*

এ চারটি প্রজাতির বন্য মৌমাছির ব্যবহার শুরু হয়েছিলো ১৯৫০-এর দিকে (Bohart, 1950) এবং এরও প্রায় ৪০ বৎসর পরে আরও একটি প্রজাতি যুক্ত হয়েছে এদের সঙ্গে সেটা হলো *Bombus terrestris*। উন্নত বিশ্বে *B. terrestris* ব্যবহার অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রিনহাউজ (Green house) শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যেমন : টমেটো, শষা, পিমেন, স্ট্রবেরি ইত্যাদি। *Bombus* এর আরও কয়েকটি প্রজাতিও শস্য পরাগায়নের জন্যে ব্যবস্থাপনার জোর প্রচেষ্টা চলছে বিভিন্ন উন্নত দেশে, যেমন— *Bombus (Bombus) ignitus, Bombus (Bombus) hypocrita* ইত্যাদি (রঙিন চিত্র ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬)।

পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির ভ্রমর (Bumble bee) রয়েছে। আমাদের দেশেও এর দুটি প্রজাতি আছে বলে জানা গিয়েছে, তবে এদের জীবনবৃত্তান্ত এবং শস্য পরাগায়নে ভূমিকার কথা কিছুই জানা যায় নি, প্রজাতি দুটি হলো :

১. *Bombus eximius*
২. *Bombus montivagus*

ক্ষারীয় মৌমাছি *(Nomia melanderi)* আলফালফা পরাগায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Bohart, 1950)। Hackwell (1968)–এই প্রজাতির মৌমাছির জীবনবৃত্তান্ত পুরোপুরি অধ্যয়ন করেন এবং এর পরাগায়নে গুরুত্বের কথা বলেন। পরে Stephen (1960b) এবং Torchio (1966) এর কৃত্রিম বাসা তৈরি করেন এবং ব্যবস্থাপনা উপযোগী করেন। পরবর্তীতে কৃষকরা তাদের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করেন এবং এক সময় এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বেসিন এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিনেটর হিসেবে গণ্য হয়ে পরে, বিশেষ করে আলফালফা বীজ উৎপাদনের জন্যে। F. Torchio (1987) বলেন যে, *N. melanderi* ব্যবহার করলে বীজ সুন্দর হয় এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ আহরণ করা সম্ভব হয়। *Nomia* গণের অনেকগুলো প্রজাতিই আমাদের দেশে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যেমন :

১. *Nomia aurifrons*

২. *Nomia curvipes* ইত্যাদি।

এরা কোন কোন উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটায় এ সম্পর্কে তথ্য নেই বললেই চলে এবং এদেরকে বাণিজ্যিক উৎপাদন করা সম্ভব কি–না তাও জানা যায় নি।

পাতা কাটা মৌমাছি (Leaf cutting bee)

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের (১৯৬০) প্রথম দিকে পাতা কাটা মৌমাছির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় আলফালফা বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন, ওয়াশিংটন এবং আইদাহোতে এই মৌমাছির প্রয়োজন দেখা দেয় (Stephen, 1962)। এক সময় চাহিদা এত বেড়ে যায় যে, এর উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমগ্র পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এটি ক্ষারীয় মৌমাছিটির স্থান অনেকটা দখল করে নেয়। শুধু আমেরিকা নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর ব্যবহার করা হয় বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে।

শিংমুখো মেশন মৌমাছি (Horned-Faced mason bee)

জাপানে *Osmia cornifrons* Radoszkowski মৌমাছিটি Maeta and Kitamura (1974) আপেল পরাগায়নের কাজে ব্যবহার করেন। সেখানে কীটনাশকের ব্যবহার এতোই বেশি যে মৌমাছি পালনকারীরা (bee-keeper) তাদের মৌচাকগুলো (bee hive) সেগুলো কীটনাশকের সাহায্যে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আপেল চাষীদের ভাড়া দিতে চাইতেন না। ঠিক সে সময়ে এর আগমন আপেল চাষীদেরকে খুবই উৎফুল্ল করেছিলো। বর্তমানে জাপানে এরা খুবই প্রিয় বিভিন্ন ফুলের পরাগায়নের জন্যে (রঙিন চিত্র ২৭)। এরা নলে বাসা তৈরি করে (tube nest) এবং এদের পরাগায়ন ক্ষমতা মৌমাছির তুলনায় অনেক বেশি। সংখ্যায়ও এদের অনেক কম প্রয়োজন হয়। চাষীরা কীটনাশক ব্যবহারের সময় খুব সহজেই টিউব

নেক্টের বান্ডিলগুলো সরিয়ে নিতে পারে। এসব কারণেই এদের ব্যবহারের প্রতি চাষীদের উৎসাহ বেড়েছে।

এটি শুধু অ্যাপেলই নয় অন্যান্য ফলমূল যেমন— স্ট্রবেরি, নাসপাতি ইত্যাদি পরাগায়নের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এটি টমেটো পরাগায়নের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা।

Felicioli *et al.* (1996) বলেছেন যে, *Osmia cornuta* খুবই ভালো পলিনেটর। *Osmia* এর অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে, তবে আমাদের দেশে এর এখনো কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

Megachilid bee এর আরও একটি প্রজাতি হলো *Eumegachile pugnata*, এরা Compositae পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ পরাগায়ন করতে সাহায্য করে (Frohlich ও Parker, 1983)। সবচেয়ে আশীর্বাদজনক কথা হলো বিংশ শতাব্দীর ৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ভ্রমর এর একটি প্রজাতির ব্যবস্থাপনা সফলতা, যা গ্রিনহাউজ ফসলের পরাগায়নের জন্যে ব্যবহার করা হয়। সেটা সম্ভব হয়েছিলো Röseler (1985), Heemert *et al.* (1990). Doorn (1987) প্রমুখদের অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলে। *Bombus terrestris* এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয় সারাবছর ব্যবহারের জন্যে। জাপানে ভ্রমরের দুটি প্রজাতি একই Sub-genus *Bombus* –এর আওতায় রয়েছে এবং তার বাণিজ্যিক উৎপাদনের জোর প্রচেষ্টা চলছে। *Bombus terrestris* এখন গ্রিনহাউজ টমেটো এবং অন্যান্য ফল, সবজি এবং Orchard crops এর পরাগায়নের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জাপানিজ *Bombus* প্রজাতি দুটি হলো *Bombus ignitus* এবং *Bombus hypocrita*। এ ছাড়াও সেখানে ১৪টি*Bombus*-এর প্রজাতি রয়েছে। যেখানে আমাদের আছে মাত্র দুটি যা-কিনা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে কিভাবে এর ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা যায়। বড় ছুতার মৌমাছি (Large Carpenter bee) স্থানীয়ভাবে যেটাকে ভ্রমরও বলা হয়, আমাদের দেশে এর অনেকগুলো প্রজাতিই রয়েছে, কিন্তু এদের বেশির ভাগই পরাগায়ন না ঘটিয়েই এদের কায সমাধা করে থাকে অর্থাৎ এদের স্বভাব হলো নেকটার এবং পলাগ ছিনতাই করা (Nectar robbing and pollen robbing)। কিন্তু কোনো কোনো ফুলে এরা পরাগায়ন ঘটিয়েও থাকে সেগুলো এদের পরাগায়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করলে জানা সম্ভব। পরবর্তীকালে এদেরকে শস্য পরাগায়নের কাজে ব্যবহারের কথা চিন্তা করা যাবে।

Bhuiya and Miah (1990) চট্টগ্রাম এলাকায় পাওয়া যায় এমন বড় ছুতার মৌমাছির একটি তালিকা দিয়েছেন, তবে সারাদেশে আরও অনেক বেশি ছুতার মৌমাছি আছে বলে অনুমেয়।

মৌমাছি বলতে আমরা সাধারণত বুঝি Honeybee কে অর্থাৎ Apidae গোত্রের Apinae উপগোত্রের প্রজাতিগুলোকে (চিত্র ১১.১)। যার আরও ৩টি উপগোত্র (Sub family) রয়েছে।

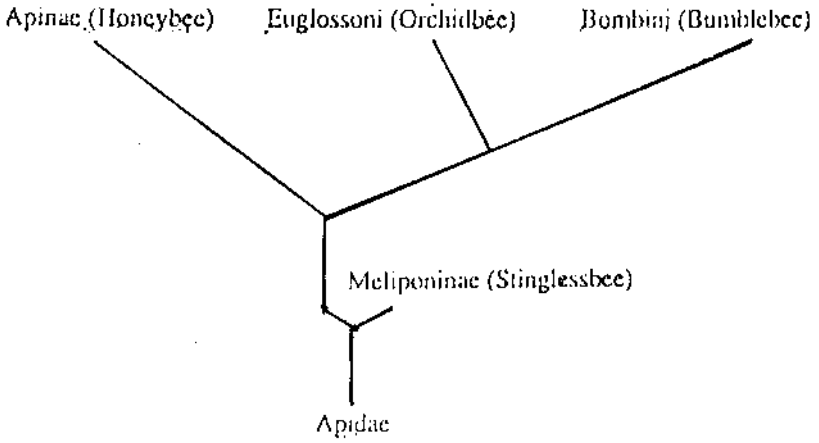

চিত্র ১১.২ : Apidae গোত্রের মৌমাছিদের শ্রেণিবিন্যাসগত সম্পর্ক

উপরের চিত্র থেকে বোঝা যায় অন্যান্য উপগোত্রগুলোও (Sub-family) একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যাদের অনেকেই স্বতন্ত্র মৌমাছি এবং এরা সবাই পরাগায়ন ক্রিয়া করে থাকে। এদের অনেকেই প্রাকৃতিক নল, পুরাতন শামুকের খোলকের ভেতর, মাটিতে, কাঠ বা মরা গাছের ডাল, বাঁশ, নলকার উদ্ভিদের ভেতর বাসা তৈরি করে। এরা সাধারণত মোম বা মধু সঞ্চয় করে না এবং অনেকেই এসব পদার্থ তৈরি পর্যন্তও করে না।

আমাদের কৃষিকে উন্নত করতে হলে এ বিষয়গুলোকে চিন্তা করা প্রয়োজন। এদের বিভিন্ন দিক গবেষণা করে কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারলে আমাদের কৃষির উন্নয়ন অনেকটা সম্ভব হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পলিনেটর গ্রুপ

আমাদের এ অঞ্চলে (দক্ষিণ এশিয়া) এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পলিনেটর রয়েছে (সারণি ১২.১, ১২.২, ১২.৩, ১২.৪, ১২.৫, ১২.৬ ও ১২.৭)। কিন্তু এ অঞ্চলের বেশিরভাগ অনুন্নত দেশগুলোতে পলিনেটরের তেমন কোনো ব্যবহার হচ্ছে না বললেই চলে। অথচ পলিনেটরের ভূমিকা বিভিন্ন শস্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফল, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতির জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলো আজকাল পলিনেটর ব্যবহার করে তাদের কৃষিকে অনেক উন্নত করে নিয়েছে। সেসব দেশে একথা আজ সবাই জানে যে পলিনেটরের সংশ্লিষ্টতার কারণে শস্যের গুণগত মান এবং পরিমাণগত দিক দুটোরই যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটেছে।

কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে পলিনেটর ছাড়া যাদের উৎপাদন অত্যন্ত কম হয় অথবা একেবারেই হয় না। এ ধরনের একটি উদ্ভিদ হলো *Ficus*। পরাগায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বাণিজ্যিকভাবে ফল ও বীজ উৎপাদনে। এসব ক্ষেত্রে পলিনেটর ব্যবহার করা না হলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে, ফলে লোকসান অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীরা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে নিম্নোক্ত উপায়ে পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করতে বাধ্য হন।

১. কৃত্রিম পদ্ধতি
   - ক. হস্ত পরাগায়ন ;
   - খ. যান্ত্রিক পরাগায়ন ;
   - গ. কৃত্রিম হরমোন দিয়ে পরাগায়ন ইত্যাদি।

২. প্রাকৃতিক পদ্ধতি
   - ক. সামাজিক মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন ;
   - খ. স্বতন্ত্র মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন।

কৃত্রিম পদ্ধতির ফলাফল কোনোটাই মৌমাছির সাহায্যে পরাগায়নের চেয়ে উর্ধ্বে নয় (রঙিন চিত্র ২৮)। মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন করলে ফসলের সর্বপ্রকার মান নিশ্চিত হয় এবং ব্যবসায়িক সফলতার নিশ্চয়তা থাকে (Bunting ও Griffiths, 1990)। কারণ মৌমাছিরা নিজেদের প্রয়োজনে প্রতিটি ফুলেই ভ্রমণ করে কিন্তু যন্ত্র বা হরমোন দিয়ে পরাগায়ন করালে

অনেক সময় অনেক ফুলই বাদ পড়ে যায় বা পড়ার সম্ভাবনা থাকে, ফলে ফলন কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে (Banda ও Paxton, 1991)।

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৭৫০টিরও বেশি গণের (Genera) উদ্ভিদ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Roubik, 1995), যার অনেকগুলো আমাদের এ অঞ্চলে রয়েছে। এদের পরাগায়নের উপর তেমন কোনো তথ্য নেই বললেই চলে বা থাকলেও অসম্পূর্ণ বা প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব বিদ্যমান। বীজ উৎপাদনের জন্যে ফুলের ক্রস-পরাগায়ন ঘটানো অপরিহার্য। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলোকে খুবই নির্দিষ্ট পলিনেটরের সাহায্যে পরাগায়ন করাতে হয়, নচেৎ এদের অনুপস্থিতিতে হাতের সাহায্যে (কৃত্রিম উপায়ে) পরাগায়ন করা ছাড়া আর উপায় থাকে না, যেমন— টমেটো, নাসপাতি, মাস্ক মেলন ইত্যাদি।

শস্য পরাগায়নের ব্যাপারে পলিনেটরের ব্যবহার সম্পর্কে এখন উন্নত দেশগুলোতে আর কোনো সংকোচ বা দ্বিধা-দ্বন্দ নেই, কারণ এদের ব্যবহারের ফলে—

১. ফলনের বৃদ্ধি লাভ ঘটে ;
২. ফলের আকার এবং স্বাদ বাড়ে ;
৩. প্রচুর বীজ উৎপন্ন হয় ;
৪. অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়।

একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরোক্ত কারণগুলোর জন্যে সব শ্রেণীর কৃষকরাই তাদের ফসলের পরাগায়ন ক্রিয়া ঘটাতে আগ্রহ বোধ করেন। পলিনেটর কর্তৃক পরাগায়ন ঘটানোর দুটি উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. বাসস্থান ব্যবস্থাপনার (habitat management) মাধ্যমে প্রাকৃতিক পলিনেটরদের সংখ্যা বাড়িয়ে ;
২. কৃত্রিম উপায়ে পলিনেটর উৎপন্ন করে বাক্স বা অন্য কোনো উপায়ে প্রয়োজনীয় স্থানে স্থাপন করে।

এ ব্যাপারে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে এবং গবেষণা ছাড়া এর সুফল অর্জন একেবারেই অসম্ভব। তবে আশার কথা হলো আমাদের দেশের কৃষক সমাজ এ ব্যাপারে সম্প্রতি জানতে শুরু করেছে, আর এ জানার ইচ্ছা, গতি এবং প্রয়োগের উপর নির্ভর করবে পরাগায়ন থেকে অদূর ভবিষ্যতে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে। পলিনেটরদের রক্ষা না করতে পারলে এবং এদের জীববিজ্ঞান এবং বাস্তব্যবিদ্যা ভালোভাবে না জানা হলে, এদের থেকে সুফল পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তাই এদের নিয়ে গবেষণা শুরু করা আমাদের দেশে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা ও পলিনেটর ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণার অর্থ হলো পরিবেশকে স্থিতিশীল করা এবং এক ধরনের আধুনিক ও উৎপাদনমুখী কৃষির সূচনা করা। আমাদের পরিবেশ তথা এ দেশকে অনেক উন্নত করা সম্ভব পলিনেটরের যথাযথ ব্যবহার করে।

উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোতে যত রকমের পলিনেটর আছে তার মধ্যে মৌমাছি (স্বতন্ত্র মৌমাছি এবং সামাজিক মৌমাছি) প্রায় অর্ধেক। বাকিগুলো অন্যান্য বিভিন্ন গ্রুপের (যেমন বাদুর থেকে শুরু করে মথ পর্যন্ত রয়েছে এতে)। মৌমাছির মধ্যে ৯৫% এর বেশি রয়েছে স্বতন্ত্র-মৌমাছি এবং বেশিরভাগই মাটিতেই বাসা তৈরি করে ও সেখানে বাস করে। নিচের সারণি থেকে এ অঞ্চলের পলিনেটর সম্পর্কে একটি বিশদ ধারণা পাওয়া যাবে। তবে এদের সবাই খুবই সফল পলিনেটর নাও হতে পারে। কারণ অনেক আছে যেমন—মাছি বিটল, বাদুর ইত্যাদি যারা সাধারণত অনিয়মিতভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে কদাচিৎ ফুলে আসে, ফলে এদের পরাগায়ন সার্ভিস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সারণি ১২.১ : পাখির পলিনেটর গ্রুপ (প্রজাতিগুলোর সম্ভাব্য সংখ্যা দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্যে প্রযোজ্য)

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা *
Flowerpeckers (Dicaeidae)	৩০
Lories (Subfamily- Loriinae)	২
Sunbirds (Nectariniidae)	৩৫
White- eyes (Zosteropidae)	৬০
Others	৫০*

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

সারণি ১২.২ : মৌমাছির পলিনেটর গ্রুপ

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা*
Long-tongued Bees (Apidae+ Anthophoridae)	১০০০
Long-tongued bees (Megachilidae)	১৫০০
Short-tongued bees (Andrenidae)	৫০
Short-tongued bees (Colletidae)	১০০
Short-tongued bees (Halictidae)	৫০০
Short-tongued bees (Melittidae)	৫০

সারণি ১২.৩ : বোলতার পলিনেটর গ্রুপ

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা*
Ichneumons (Ichneumonidae)	৫
Fig Wasps (Agaonidae)	১০০
Spider Wasps (Pompilidae)	১০০
Tiphiids (Tiphiidae)	১০০
Scoliids (Scoliidae)	১০০
Vespids (Vespidae)	১০০
Eumenids (Eumenidae)	১০০
Ants (Formicidae)	১০০
Sphecids (Sphecidae)	১০০

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

সারণি ১২.৪ : Diptera বর্গের পলিনেটর গ্রুপ (মাছি)

Sub order- Nematocera	
গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা*
Anisopodids (Anisopodidae)	১০০
Black Flies (Simuliidae)	১০০
Crane Flies (Tipulidae)	১০০
Fungus Gnats (Mycetophilidae)	১০০
Gall midges (Cecidomyiidae)	১০০
March Flies (Bibionidae)	১০০
Midges (Chironomidae)	১০০
Minute Scavengers (Scatopsidae)	১০
Mosquitoes (Culicidae)	১০০
Moth Flies (Psychodidae)	১০
Rool Gnats (Sciaridae)	১০০
Cand Flies (Ceratopogonidae)	১০০

Sub-order Brachycera	
গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা*
Apiocerids (Apioceridae)	১০০
Bee Flies (Bombyliidae)	১০০
Bigheaded Flies (Pipunculidae)	১০০
Chyromyids (Chyromyidae)	১০
Dance Flies (Empididae)	১০০
Flesh Flies (Sarcophagidae)	১০০
Fruit Flies (Chloropidae)	১০০
Fruit Flies (Tephritidae)	১০০
Horse Flies (Tabanidae)	১০০
House Flies (Muscidae)	১০০
Hover Flies (Syrphidae)	১০০
Humpbacked Flies (Phoridae)	১০০
Lauxaniids (Lauxaniidae)	১০০
Long- Legged Flies (Dolichopodidae)	১০০
Micro- headed Flies (Acroceridae)	১০
Mydaids (Mydaidae)	১০
Nemestrinids (Nemestrinidae)	১০
Pelecorhynchids (Pelecorhynchidae)	১০
Pyrgotids (Pyrgotidae)	১০
Robber Flies (Asilidae)	১০০
Shore Flies (Ephydridae)	১০০
Smoke Flies (Platypezidae)	১০
Snipe Flies (Rhagionidae)	১০
Soldier Flies (Stratiomyidae)	১০০
Spear -Winged Flies (Lonchopteridae)	১০

Stiletto Flies (Threvidae)	১০০
Tachinids (Tachinidae)	১০০
Thickheaded Flies (Conopidae)	১০
Upside-down Flies (Neurochaetidae)	১০
Vinegar Flies (Drosophilidae)	১০০

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

সারণি ১২.৫ : বিটল পলিনেটর গ্রুপ (Coleopteran)

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা*
Ant-like Flower Beetles (Anthicidae)	১০০
Blister Beetles (Meloidae)	১০০
Carpet Beetles (Dermestidae)	১০০
Checker Beetles (Cleridae)	১০০
Click Beetles (Elateridae)	১০০০
Darkling Beetles (Tenebrionidae)	১০০০
Ladybirds (Coccinellidae)	১০০
Leaf Beetles (Chrysomelidae)	১০০০
Lizard Beetles (Languriidae)	১০০০
Longhorns (Cerambycidae)	১০০০
Marsh Beetles (Helodidae)	১০০
Metallic Wood Borrers (Buprestidae)	১০০০
Net-Winged Beetles (Lycidae)	১০০
Odomerids (Oedomeridae)	১০০
Pythids (Pythidae)	১০০
Rhiphiphorids (Rhipipdoridae)	১০০
Rove Beetles (Staphylinidae)	১০০
Sap Beetles (Nitidulidae)	১০০

Scarab Beetles (Scarabaeidae)	১০০০
Scraptiids (Scraptiidae)	১০০
Shining Flower Beetles (Phalacridae)	১০০
Silken Fungus Beetles (Cryptophagidae)	১০০
Soft-Winged Flower Beetles (Melyridae)	১০০
Soldier beetles (Cantharidae)	১০০
Stag beetles (Lucanidae)	১০০
Throscids (Throscidae)	১০০
Tumbling Flower Beetles (Mordellidae)	১০০
Weevils (Curculionidae)	১০০০

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

সারণি ১২.৬ : প্রজাপতি এবং মথ পলিনেটর গ্রুপ

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা
Arctiids (Arctiidae)	৬০০*
Brush-Footed Butterflies (Nymphalidae)	১০০০*
Day-Moths (Uraniidae)	১০
Hairstreaks (Lycaenidae)	১০০০*
Moths (Micropterigidae)	৫
Owlet Moths (Noctuidae)	১০০০*
Skippers (Hesperiidae)	১০০০
Sphinx or Hawkmoths (Sphingidae)	১০০
Sulphurs (Pieridae)	৩০০
Swallowtails (Papilionidae)	৪০০*
Tinaegeriids (Tinaegeriidae)	৫০
Yucca Moths (Prodoxidae)	১০*
Zygaenids (Zygaenidae)	৫০

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

সারণি ১২.৭ : স্তন্যপায়ী প্রাণী পলিনেটর গ্রুপ

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা
Fruit bats, Flying Foxes (Pteropodidae)	১৭৪

সারণি ১২.৮ : থ্রিপস পলিনেটর গ্রুপ

গোত্র	প্রজাতি সংখ্যা
Thrips (Thripidae, Aeolothripidae, Phalaeothripidae, and others)	৫০০*

* প্রকৃত সংখ্যা বেশি

উপরোক্ত সারণি থেকে বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ পলিনেটর রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সারণিতে যতোগুলোর সংখ্যা দেয়া আছে এদের সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈষম্যের কারণে আমাদের দেশে পাওয়া নাও যেতে পারে। তাই এ বিষয়ে গবেষকদের করণীয় হচ্ছে আমাদের দেশে এরা কি পরিমাণ রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করা, যদিও এটি একটি সময়সাপেক্ষ কাজ। যারা শস্য পরাগায়ন (crop pollination) নিয়ে কাজ করেন, এ সারণি সেসব গবেষকের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে। কারণ এখান থেকে খুব সহজেই প্রজাতি বেছে নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনে গবেষণার কাজ করতে পারবেন।

এ ধরনের গবেষণা আমাদের দেশের টেকসই কৃষি উন্নয়নের (sustainable agricultural development) জন্যে খুবই জরুরি, যা এরই মধ্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো বুঝে নিয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দিয়েছে। অতএব এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা কাজ করা এবং বিপুল পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা। এ ব্যাপারে বিলম্ব কৃষির অগ্রযাত্রাকেই শুধু ব্যাহতই করবে না, সাথে সাথে অর্থনৈতিক মুনাফা থেকেও আমাদেরকে বঞ্চিত হতে হবে। সঠিক এবং তড়িৎ গবেষণা একমাত্র এ বিরাট বড় সম্ভাবনাকে সার্থক এবং সফল করতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বন্য পলিনেটরের জন্য বাসস্থান ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর কৃষি ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। ফসলের ফলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা যোগ হওয়ার কারণে বিগত দশকগুলোতে ধাপে ধাপে উৎপাদিত ফসল থেকে লাভ বেড়েছে। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে সবাই ভুলে গিয়েছিলো যে এসব প্রাণী বা উদ্ভিদ বিশেষ করে পলিনেটরের উপর রাসায়নিক পদার্থ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে সাংঘাতিক রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর ফল পলিনেটরদের সংখ্যা দিন দিন কমতে শুরু করেছে। সুখের কথা এই যে, উন্নত দেশগুলোতে এদের উপর নজর ইতোমধ্যে পড়েছে এবং সেসব দেশে পলিনেটরের আহার ও বাসস্থানের যাতে উন্নয়ন ঘটে তার চেষ্টা চলছে।

পলিনেটরের বাসস্থান নষ্ট হওয়ার কারণ

মৌমাছি এবং অন্যান্য অনেক প্রজাতির কীটপতঙ্গ যেমন : বিটল, মাছি, প্রজাপতি এরা সবাই পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। যদিও অনেক কীটপতঙ্গই ফুলের নেকটার সংগ্রহ করে অথবা ফুলের উপর বিচরণ করে, আসলে স্বার্থকভাবে পরাগায়ন ক্রিয়া ঘটায় মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক।

পলিনেটরদের বাসস্থান অটুট না রেখে কিংবা যেখানে অবনতি ঘটেছে তার উন্নয়ন না করে পর্যাপ্ত কিংবা প্রচুর পলিনেটর আশা করা যায় না। এদের বাসস্থানগুলোকে প্রচুর পরিমাণ বন্য গাছপালা জন্মিয়ে সংরক্ষণ/উন্নত করা হলে এদের সংখ্যা এমনিতেই অনেকাংশে বেড়ে উঠবে। এদের বাসস্থান নিম্নোক্ত কারণে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

১. এদের খাদ্যের উৎসকে ঠিক রাখার জন্যে ;

২. এদের বাসা তৈরির অবস্থান ঠিক রাখার জন্যে ;

৩. এদের জীবনবৃত্তান্ত জানার জন্যে (কারণ জীবনবৃত্তান্ত জানা না থাকলে এদেরকে বোঝা যাবে না যে এরা উপকারি না অপকারী)।

একটি বিশেষ পলিনেটর গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এদের পছন্দের যেসব ফুল রয়েছে সেসব উদ্ভিদের সংরক্ষণ অতীব জরুরি এবং এ ফুল ঠিক সময়ে অর্থাৎ এদের প্রজননকালে থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তাই বাসস্থান (habitat) কে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে

হবে যেনো এর সুফল উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে পায়। একটি বাসস্থান এর নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা উচিত :

১. স্থানীয় উদ্ভিদে জীববৈচিত্র্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা দরকার ;
২. সেখানে কোনো কীটনাশক ব্যবহার না করা ;
৩. যে কোনো ধরনের প্রজাতির অবাধ বিচরণ থাকা ;
৪. কৃষকদের পর্যাপ্ত ফসলের চাষ করা।

এর সঙ্গে যদি ছোট ছোট অব্যবহৃত ভূমি চাষযোগ্য জমির আশে-পাশে কোনোরকম পরিবর্তন না করে প্রাকৃতিকভাবে রাখা যায় সেখানেও প্রচুর পলিনেটর বাস করতে পারে, শুধু তাই নয় সেখানে ফল-মূলও জ্বালানি কাঠ ইত্যাদিও পাওয়া সম্ভব। এ ধরনের বাসস্থান থেকে সরাসরি কোনো আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না তবে পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে আর্থিক চিন্তার কথা মুখ্য হওয়া উচিত নয়। এসব বাসস্থানের টেকসই ব্যবহারের জন্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

১. স্থানীয় ঐতিহ্যগত কারণে বনের ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে ;
২. দুর্ভিক্ষের সময় যাতে বিকল্প খাদ্যের মজুত থাকে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে ;
৩. স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ঔষধি বৃক্ষ থাকতে হবে ;
৪. ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে।

সেখানের প্রজাতির ভাণ্ডার অবশ্যই নির্ভর করবে কৃষকদের ব্যবহারের ইচ্ছার উপর এবং সে অনুপাতে পদক্ষেপ নেয়ার উপর। বড় রকমের বাসস্থান যেমন— Biosphere reserves বা World heritage reserve এগুলো পলিনেটর এবং এতদসঙ্গে সবার বাসস্থানই সুরক্ষা করে। ছোট বাসস্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জমির আইল, বনের ধার ইত্যাদি। নিচে কিছু বিশেষ ধরনের বাসস্থান এবং পলিনেটর রক্ষার জন্যে সহায়ক ধরনের বাসস্থানের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. সীমানার গাছপালা

সৌন্দর্য এবং সুরক্ষা দান ছাড়াও সীমানার গাছপালার সমাবেশ এমনি একটি জায়গা যেখানে অনেক ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদের থাকা এবং খাবারের সংস্থান হয়, যার মধ্যে পলিনেটরও রয়েছে। এখানে পলিনেটরের সংখ্যা বাড়াতে হলে একটি জিনিস চিন্তা করতে হবে তা হলো যাতে এদের খাবার অর্থাৎ পরাগ এবং নেকটারসমৃদ্ধ উদ্ভিদ বেশি থাকে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, লেগ্যুম জাতীয় উদ্ভিদই বেশি সহায়ক হবে এখানে কারণ এরা প্রচুর নেকটার উৎপাদন করে যা *Xylocopa* এবং *Apis* জাতীয় পলিনেটররা খুব পছন্দ করে ও সেগুলো থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কাষ্ঠল উদ্ভিদও খাদ্যের ভালো উৎস হতে পারে, আবার এদেরকে ছাঁটি করে গোখাদ্য কিংবা জ্বালানিও পাওয়া যেতে পারে। এর প্রশস্ততা এক সারি থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

২. জমির আইল

পলিনেটরের জন্যে জমির আইল আর এক ধরনের আশ্রয়স্থল হতে পারে। এটি জীবিত বা মৃত (শুকনো) এ দু'ধরনের উদ্ভিদের মাধ্যমেই করা যায়। এক্ষেত্রে জানা গিয়েছে যে, গ্রামে-গঞ্জে জমির আইলের উপর বসানো শুকনো গাছের ডালের সরু নলে খুব সহজেই পলিনেটররা বাসা তৈরি করতে পারে। চট্টগ্রাম এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এসব জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের (শিম, বরবটি ইত্যাদি) চাষ করতে দেখা যায়, যা বহুবিধভাবে ব্যবহৃত হয় যেমন—শিম মনুষ্য খাদ্য হিসেবে, ফুল পলিনেটরের খাদ্য হিসেবে। আর যে বাঁশের খুঁটিতে আঁকড়ে থাকে গাছ তা পতঙ্গভোজি পাখির বসার জন্যে। এ বাউন্ডারির প্রশস্ততা এবং থাকার সময়সীমা নির্ভর করে জমিতে চাষাবাদের উপর।

৩. সড়কের ধার

আমাদের দেশে সব ধরনের পলিনেটরের জন্য সড়কের ধার একটি বিরাট বড় রকমের আবাসস্থল। বাংলাদেশে এমনিতেই নিচু তার উপর বন্যার প্রকোপ তো আছেই, তাই মাটিতে বসবাসকারী কীটপতঙ্গ তথা পলিনেটররা সড়কের ধারকেই বেছে নেয় তাদের আবাসস্থল এবং খাদ্যের উৎস হিসেবে। এখানে সড়কের দু'পাশে থাকে সাধারণত নানা জাতের বৃক্ষ, লতা-গুল্ম যা পলিনেটরের সাধারণত সারা বছরই খাদ্য যুগিয়ে থাকে। যদি সড়কের ধারকে আরও সুন্দরভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনা করা যায় সেখানে অনেক পলিনেটর স্থায়ীভাবে থাকতে পারে।

৪. বাগান/উদ্যান/সংরক্ষিত এলাকা

বাগান সাধারণত দুটি ভিন্ন পরিবেশে করতে দেখা যায়, যেমন—

১. বাড়ির আঙিনার বাগান (house garden);
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাগান (academic/institutional garden)।

উপরোক্ত ধরনের বাগানে খাদ্যের উৎস খুবই অপ্রতুল থাকে নিম্নোক্ত কারণে :

১. আয়তনে ছোট হয়;
২. ফুলের পছন্দ পলিনেটরের জন্যে চিন্তা করে চাষ করা হয় না;
৩. ফুল ফোটার সময় এবং পলিনেটরের প্রয়োজনের সময় এক নাও হতে পারে;
৪. এখানে সাধারণত কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাদে বাগান করা শুরু হয়েছে। এটি পরিবেশের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে যদি আরও ব্যাপকভাবে সমস্ত লোকালয়ের বাসিন্দারা তাদের বাড়ির আঙিনায় বা ছাদে ছোট ছোট ফুল, ফল কিংবা সবজির বাগান করে। এসব জায়গা পলিনেটরের আহার, বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধি করার জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে যারা মৌমাছি পালন করে তাদের বাক্সের

মৌমাছিকেও প্রচুর খাবার যোগান দিতে সমর্থ হবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও হবে আরোও সুন্দর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত এবং অন্যান্য স্থানের বাগানে এ ধরনের অন্য আরো একটি উৎস যেখানে অবশ্যই বহুবিধ ফুলের চাষ হয়ে থাকে। এখানে জায়গাগুলো আবাসিক বাড়ির জায়গার চেয়ে সাধারণত পলিনেটরের বংশবৃদ্ধির জন্যে অনেক বেশি নিরাপদ। কারণ এখানে খুব সহজে বাগানের পরিবেশ নষ্ট হয় না, যা আবাসিক বাড়িতে হতে পারে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্যে। তাই যদি এ বাগানগুলোতে বছরব্যাপি বিভিন্ন ফুলের চাষ করা হয়, সেক্ষেত্রে পলিনেটরের বংশবৃদ্ধির জন্যে এখানে অত্যন্ত সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এ ধরনের বাগানগুলো সাধারণত কোনো যত্ন নেয়া হয় না। ফলে সেখানে নিয়মিত কোনো ফুল হয় না এবং সঙ্গত কারণে এ পরিবেশ পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক নয়। পলিনেটরের বাসস্থান শহর কিংবা গ্রাম যে–কোনো ধরনের পরিবেশেই হতে পারে যদি ফুলের উৎস থাকে। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কোনো কোনো শহরে, গ্রাম অঞ্চলের চেয়ে পলিনেটরের সংখ্যা বেশি, কারণ শহরে প্রচুর ফুল আছে। কিন্তু ঢাকা শহরের জন্য ব্যাপারটি উল্টো, কারণ পরিবেশ দূষণের ফলে এখানকার গাছ–পালা, লতা–পাতা, আগাছা, এমনকি ফলমূলের গাছ খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এখানে গাছের পাতা আর ফুলগুলো বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে ধূলো–ময়লা কিংবা অন্যান্য দূষণে আবৃত হয়ে থাকে ফলে সেখানে মৌমাছি বা অন্যান্য পলিনেটর আসে না। কারণ সেখান থেকে পরাগ বা নেকটার কোনোটাই তাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। যদি এসব উদ্ভিদকে এবং আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে পারি, তাহলে এগুলো পলিনেটরের জন্যে একটি খাদ্যের উপযুক্ত উৎস হতে পারে।

আমাদের দেশের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতগুলো নিম্নরূপ :

১. জাতীয় উদ্যান (National park) ;
২. অভয়ারণ্য (Sanctuaries) ;
৩. শিকারের জন্য সুরক্ষিত এলাকা/বন (Game reserve) ;
৪. বিভিন্ন ধরনের বনজঙ্গল ইত্যাদি।

আমরা যদি উপরোক্ত এসব পরিবেশকে নষ্ট না করি তাহলে এ পরিবেশগুলোতেও প্রচুর পরিমাণে প্রাণী এবং উদ্ভিদকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে, সাথে সাথে পলিনেটরও সংরক্ষিত হবে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে।

৫. নদী বা জলাশয়ের পাড়ের বনভূমি

আমাদের দেশের প্লাবনভূমি (Flood plain) এলাকায় নদীগুলোর পাশে এ ধরনের বনভূমি পাওয়া যাবে না তবে উঁচু এলাকার বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট ইত্যাদি অঞ্চলে নদী বা খালের জলাশয়ের দু'ধারে এরকম বনভূমি পাওয়া যেতে পারে এবং এসব পরিবেশ

পলিনেটরদের আহার ও বাসস্থানের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব নদীর পাড়ে নেকটার উৎপাদনকারী উদ্ভিদ প্রচুর থাকতে পারে যা বিভিন্ন ধরনের পলিনেটরকে আকৃষ্ট করে থাকে। যেসব স্থানে এরকম পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করে সে পরিবেশ ফিরিয়ে আনলে সেখানে পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

৬. ছোট বনভূমি (Small forest patches)

বহুকাল পূর্বে এ দেশের গ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট বনানী অনেক ছিল যার আকার এবং সংখ্যা দিনে দিনে কমছে। গ্রামের ভাষায় একে 'ছাড়া বাড়ি'ও বলা হয়ে থাকে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্যে এগুলো ছিল একটি সুন্দর এবং উপযুক্ত জায়গা। কারণ এখানে বনজ গাছপালা শুরু করে অন্যান্য ছোট ছোট বন্যপ্রাণীও নির্ভয়ে থাকতে পারতো, যেখানে অবশ্যই ছিল বন্য মৌমাছিও। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব ছোট বনানীগুলো কমে যাচ্ছে ফলে এসব প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে সেখান থেকে। এসব ছোট বনানী সংরক্ষণ করা গেলে সেক্ষেত্রে অনেকাংশেই পলিনেটর গ্রুপকেও সংরক্ষণ করা যেত। এখনও চিন্তা করলে এবং পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নিলে কিছুটা হলেও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব।

৭. পরিবর্তনশীল চারণভূমি

এসব পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ প্রচুর জন্মায় বলে এখানে পলিনেটরের প্রচুর খাবারের সমারোহ থাকে, ফলে এখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে পলিনেটর তাদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এ ধরনের বাস্তব্যতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের উপকারী কীটপতঙ্গের তথা পলিনেটরের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

৮. স্বল্পকালীন সহায়ক শস্য

সাধারণত ফসলের ক্ষেতে বছরের সবসময়ই কৃষিকাজ করা হয় না ফলে এমন একটি সময় থাকে যখন কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে এবং সেখানেও কোনো ফুলের বা পলিনেটরের খাবারের অস্তিত্ব থাকে না, যার দরুণ পলিনেটরদের সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই সেখানে সে সময়ে সহায়ক শস্য (cover crops) ফুল সরবরাহ করে পলিনেটরের সংখ্যা বাড়াতে পারে। এ ব্যাপারে এক ধরনের উদ্ভিদ *Mellilotus* অথবা অন্য যে কোনো নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী (nitrogen fixing) লেগ্যুম, যা মাটিকে উর্বর করে এবং প্রচুর ফুল হয় যা নেকটারের ও পরাগের উৎস সেগুলোর চাষ করা যায়। শুধু তাই নয় এগুলো গো-খাদ্য এমনকি সবুজ সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এ *Mellilotus* ৬ মাসেরও অধিককাল পর্যন্ত ফুল সরবরাহ করতে পারে। এর একটি বিশেষ অসুবিধাও রয়েছে তা হলো এটা যদি অন্যান্য শস্যের সঙ্গে এক সময়ে চাষ করা হয় তাহলে পলিনেটররা এখানেও বেশি চলে আসতে পারে প্রয়োজনীয় জমিতে না যেয়ে। তাই এটাকে এমনভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে যেন অন্যান্য চাষের ফসলের সাথে একই সময়ে না পড়ে যায়।

৯. শস্য বাছাইকরণ

শস্য উৎপাদনকারীদের এমন বীজ এবং শস্য বাছাই করতে হবে যেন ঠিক ফসলের ফুল ফোটার সাথে সাথে পলিনেটরের আবির্ভাব ঘটতে পারে। বন্য পলিনেটরের ব্যবহার করার জন্যে এটি একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু যেকোনো ফুলে যেতে ওরা মুক্ত তাই বিকল্প ফুল প্রচুর থাকলে সেখানে তাদের যেতে বাধা থাকবে কেন, আর তাই আসল কাজে বাধা পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেজন্য এসব চিন্তা করে শস্য উৎপাদনকারীদের শস্যের জাত পছন্দ করে নিয়ে কাজ করতে হবে (রঙিন চিত্র ৩০)। আমাদের দেশে প্রচুর গাছপালা নিধনের ফলে পলিনেটরের ফুলের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে আর সঙ্গত কারণেই এদের সংখ্যা ও কমে যাচ্ছে যদিও এ ব্যাপারে সরাসরি কোনো তথ্য নেই। এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। এ প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে যে, শ্রীলংকাতে প্রচুর প্রাকৃতিক বন উজার করার ফলে মৌমাছি পালনের জন্যে সেখানে বিকল্প ফুলের বৃক্ষ রোপন করা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

১০. বালাইনাশক

পলিনেটরের জন্যে এটি একটি বড় রকমের হুমকি যা ক্ষতির দিক থেকে বৃক্ষ নিধনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এর যথেচ্ছ ব্যবহার পলিনেটরের বাঁচার যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেয়, কারণ এর প্রয়োগে পলিনেটররা সাধারণত মারা যায়। শ্রীলংকাতে যথেচ্ছ বালাই নাশক (pesticides) ব্যবহারের কারণে সেখানে শস্যের উৎপাদন কমে গিয়েছিল, শুধু তাই নয় যা হয়েছিল তাও বিকৃত আকারের, কারণ প্রাকৃতিক পলিনেটরদের বিনাস করা হয়েছিল বলে। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কি হতে পারে তা ধারণা করা খুবই সহজ কারণ এখানে কীটনাশক ব্যবহারের কোনো নিয়ম নেই বললেই চলে।

১১. চাষাবাদের ধরন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পলিনেটরকে আমাদের উপকারে আনতে হলে অনেক চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। সব এলাকায় একই সময়ে একইজাতীয় শস্য চাষ করলে সব পলিনেটরের সম্পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হবে না, কারণ সব পলিনেটর সব শস্যের ফুল ব্যবহার করে না। ফলে সেক্ষেত্রে পরাগায়ন সমভাবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আরও একটি বড় অসুবিধা হলো, সব এলাকায় একইজাতীয় ফুল থাকলে এরা কষ্ট করে এদের বাসা থেকে বেশি দূরে যেতে চাইবে না বরং বাসার আশেপাশেই পরাগায়ন ক্রিয়া করবে। তাই intercropping অথবা একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য চাষ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে এক এলাকায় একই খাবারের বেশি সমারোহ থাকবে না এবং এরা সব এলাকাই ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করতে বাধ্য হবে ও আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে। এতে যদিও একই ফসল কম চাষ হবে কিন্তু ফলন অনেক বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয় intercropping চাষের খরচ কমাতেও সাহায্য করে কারণ এতে বালাইনাশক এবং সার তেমন ব্যবহার করার

প্রয়োজন হয় না। প্রাকৃতিক পলিনেটরকে সংরক্ষণ করতে হলে আমাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১. বালাইনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে ও প্রয়োজনে চিন্তা করে এর ব্যবহার করতে হবে ;

২. স্থানীয় বীজ, যার স্থানীয় পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর গুণাবলি রয়েছে সেরকম বীজ ব্যবহার করতে হবে ;

৩. বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষের ব্যবস্থা করতে হবে ;

৪. সুস্থ্য এবং সুন্দর বীজ ব্যবহার করতে হবে ;

৫. একই জমিতে একই শস্য বারবার ব্যবহার করা যাবে না ;

৬. কম চাষ এবং অধিক জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।

প্রাকৃতিক পলিনেটরদের সংখ্যা বাড়াতে হলে বালাইনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। বিকল্প চাষাবাদ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। পলিনেটর ও এদের বিচরণ ভূমি এবং গাছপালার সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সব সময়ই খেয়াল রাখতে হবে যেন একটির লাভজনক চাষাবাদ করতে গিয়ে অন্যটির ক্ষতি সাধিত না হয়। শুধু প্রাকৃতিক উদ্যান কিংবা সরকারি জমি বা বন সংরক্ষণ করলেই পলিনেটররা সংরক্ষিত হবে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা, তা হলো এদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কি করে এদের সংরক্ষণ করা যায়। তবেই এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

চতুর্দশ অধ্যায়

কীটপতঙ্গ এবং পরিবেশ

সাধারণত কীটপতঙ্গকে আমাদের দেশে ধরা হয় বিরক্তিকর (irritating) অথবা মারাত্মক প্রাণী হিসেবেই। অনেকেই এদের পছন্দ করেন না এবং এদের উপস্থিতি অকিঞ্চিতকর মনে করেন। শুধু তাই নয় অনেকেই এদের নাম পর্যন্ত জানেন না ও এদের কি কাজ তা বোঝেন না, এমনকি এরা কতদিন বাঁচে তাও বলতে পারেন না। মানুষের সাধারণ চিন্তা কীটপতঙ্গ মেরে দমন করা বা তাড়িয়ে দিয়ে পরিবেশ কীটপতঙ্গ মুক্ত রাখা। অথচ এ কীটপতঙ্গও নানাবিধ কারণে আমাদের উপকারে আসে। মৌমাছি একটি গ্রুপ যা মূলত শস্য পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অতি সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত তথ্য হলো উষ্ণমণ্ডলীর বাদল অরণ্য এলাকায় (Tropical rain forest) তেলাপোকার পরাগায়ন ভূমিকা। আমাদের দেশে এখন পর্যন্তও কীটপতঙ্গের উপর তেমন জোরালো গবেষণা হয়নি যদিও অন্যান্য উচ্চতর প্রাণীর বেলায় কিছুটা হয়েছে।

আশ্চর্যের কথা হলো, পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে তার মধ্যে কীটপতঙ্গের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর যেখানেই যাওয়া যাক, কম করে হলেও যে প্রাণীর সন্ধান মিলবে সেটা হলো কীটপতঙ্গ, হতে পারে সেটা মাছি, বিটল, মৌমাছি, এমনকি পিঁপড়া। বস্তুত এরা প্রত্যেক দেশের অর্থনীতিতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, আমাদের নির্দয় ব্যবহারের কারণে পৃথিবী থেকে এদের অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেকেই বিরাট হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীতে যত কীটপতঙ্গ আছে তাদের অধিকাংশই উপকারী। কিছু কিছু কীটপতঙ্গের কর্যক্রম সরাসরি আমাদের কোনো ভালো ফল না দিলেও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এদের বিলুপ্তি অবশ্যই আমাদের পরিবেশ এবং সর্বোপরি অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এটাই স্বাভাবিক।

কিছু কিছু কীটপতঙ্গের সুফল আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যেমন—মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা ইত্যাদি। আবার যেগুলো আমাদের কৃষিপণ্য এবং দৈনন্দিন জীবনে ক্ষতি করে তাদের কুফলও আমরা একইভাবে বুঝতে পারি। এদের সম্পূর্ণ নির্মূল না করে প্রয়োজনে দমনের ব্যবস্থা নেয়া যায়। মোম মথ (Wax moth) হলো তেমন একটি ক্ষতিকর পতঙ্গ। এরা মৌচাকে একবার ঢুকতে পারলে তা ধ্বংস করে ফেলে (রঙিন চিত্র ৩৯)।

যেসব কারণে আমাদের দেশে কীটপতঙ্গের গবেষণা খুব একটা আকর্ষণীয় নয় তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো :

১. এদের স্বভাব, বাসস্থান এবং জীবন সম্পর্কে তেমন কোনো জানার সুযোগ নেই যা অন্যান্য প্রাণীর বেলায় রয়েছে ;

২. এদের প্রতিদান সম্পর্কে ভাল জানা নেই (অর্থাৎ অর্থকরীভাবে এরা কতোটা উপকারী এ বিষয়ে)।

কীটপতঙ্গ আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে থাকে, তাই এদের সংরক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। নিচে এদের সংরক্ষণ করার বিশেষ কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো।

১. মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে ;

২. মৌমাছি, রেশম পোকা, লাক্ষা ইত্যাদি কীটপতঙ্গ আমাদের অর্থকরী সাহায্য প্রদান করে এবং কর্মসংস্থানে সাহায্য করে ;

৩. কিছু কিছু শুকনো পতঙ্গ/তাদের লার্ভা পোষাপ্রাণীর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. বোলতা, মাছি ইত্যাদি পরজীবী কীটপতঙ্গ অন্যান্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হয় ;

৫. কোনো কোনো দেশে এটি মানব খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার হয় ;

৬. কিছু কিছু কীটপতঙ্গ মাটির পরিবর্তন ঘটিয়ে এর উর্বরতা বৃদ্ধি করে ;

৭. ভ্রমর, প্রজাপতি, ফড়িং ইত্যাদি অত্যন্ত সুন্দর পতঙ্গগুলো আমাদের অপার আনন্দ দিয়ে থাকে (এদের অন্যান্য ভূমিকা থাকার পরেও)।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়, তাহলো জাপানে জুলাই থেকে আগস্ট মাসের রাতগুলোতে বিশেষ করে অমাবশ্যার রাতে জোনাকি দেখার মেলার কথা। মাৎসুয়ে শহরের অদূরে একটি গ্রামে একটি সেতুকে 'জোনাকি সেতু' (হোতারো ওহাসি) নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ সেখানে রাতে জোনাকি দেখার দর্শকের প্রচুর ভীড়ে জমে। গ্রীষ্মের গরমের সময় সেখানের স্থানীয় লোকেরা রাতে জোনাকি দেখে প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকে। এদিকে অন্য আর একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, ইংল্যান্ডের লোকেরা ভ্রমর পোষে আনন্দ পাবার জন্যে। কারণ এদের ভোঁ ভোঁ শব্দ এবং উজ্জ্বল গায়ের রঙ সত্যি মনোহর, তাছাড়া পরাগায়ন করার ফল তো আছেই।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, আমাদের দেশের লোকেরা কীটপতঙ্গের নামই অনেকে জানেন না। জাপানের সাধারণ লোকেরা প্রায় সবধরনের কীটপতঙ্গের দেশীয় নামগুলো জানেন। শুধু তাই নয় কীটপতঙ্গ নিয়ে সেখানে নানা রকমের খেলাধুলার অন্ত নেই। যেমন শিশুরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিটল, ক্রিকেট ইত্যাদি ধরনের কীটপতঙ্গ পোষে এবং এদের নিয়ে খেলা করে। এটি সম্ভব হয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। তারা যে কোনো জীবকে শ্রদ্ধার/আদরের চোখে দেখে, ফলে সেরকম একটা পজিটিভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে প্রকৃতির একেবারে কাছে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এবং উদ্ভিদকে, দেখানো হচ্ছে ফলে তারা ছোটবেলা থেকে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা বুঝতে সক্ষম

হচ্ছে এবং সেভাবে তাদের জীবনকে গড়ে নিচ্ছে। মা-বাবারা (বিশেষ করে মায়েরা) কীটপতঙ্গ, গাছপালা ইত্যাদি ছেলেমেয়েদের সরাসরি আসল পরিবেশে নিয়ে খেলার ছলে চিনিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের দেশে যা হলো একটি বিরল ঘটনা। খুব কম পরিবার আছে শহর অঞ্চলে যারা বাচ্চাদের প্রকৃতির খুব কাছে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতিকে শেখানোর চেষ্টা করে। তাই এখনই আমাদের চিন্তা করতে হবে কিভাবে এ অবস্থার উন্নতি করা যায়, তা না হলে আমাদের প্রকৃতিকে তথা প্রকৃতির জীবকে সুরক্ষা করা খুবই কঠিন হবে।

অন্যান্য বন্য প্রাণীর মত কীটপতঙ্গও অতি অসহায়। এরা এদের খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে সম্পূর্ণই নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। এরা কোনো খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না বরং প্রকৃতি থেকে প্রাকৃতিক খাদ্য সংগ্রহ করে। ফলে আমাদের সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিদূষণ এদের জীবনকে অনেকটা দুর্বিসহ করে তুলছে। বালাইনাশক, রাসায়নিক পদার্থ, সার প্রভৃতি প্রকৃতিকে খুবই সাংঘাতিকভাবে দূষিত করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করছে কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এর সঙ্গে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগও। আর তাই একথা আমাদের বুঝতে হবে যে, কীটপতঙ্গের বেঁচে থাকার জন্যে যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করা যায়, এটা আমাদের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। নিম্নোক্ত কারণগুলো কীটপতঙ্গের উপর ভীষণ রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে।

১. বনভূমি উজাড়;
২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ;
৩. দুর্ভিক্ষ;
৪. বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার;
৫. অশিক্ষা;
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
৭. নগরায়ন এবং শিল্পায়ন;
৮. পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি।

এদের রক্ষা করতে না পারলে প্রকৃতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে আমাদের হারাতে হবে। কোনো গবেষণা ছাড়াই উপকারী বা অপকারী কীটপতঙ্গ বোঝা যাবে না। তাই এদের উন্নয়নকল্পে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে এবং একমাত্র গবেষণা ছাড়া এদের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামাজিক মৌমাছি এবং পরিবেশ

অতি সাম্প্রতিক কালে জানা গিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে তেলাপোকার পরাগায়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা। এর ফলে পরাগায়ন ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় যুক্ত হলো। আমাদের দেশেও অনেক কীটপতঙ্গ রয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন ফসলের পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। এদের মধ্যে সামাজিক মৌমাছি সবার কাছেই বিশেষভাবে পরিচিত। এরা মধু উৎপাদনের পাশাপাশি বিভিন্ন ফসলের পরাগায়নও করে থাকে।

ঋতু বৈচিত্র্য, ভূমির বিন্যাস, প্রজাতি বৈচিত্র্য প্রভৃতি এদেশের প্রকৃতিকে এক বিশেষ রূপ দান করেছে, যেখানে সামাজিক মৌমাছিদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় এত উপকারী একটি প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে মৌমাছির উপর বেশ অবহেলা করা হয়েছে।

মৌমাছি থেকে প্রাপ্ত যেসব ব্যবহার্য জিনিস রয়েছে এর মধ্যে মধু অন্যতম, এছাড়াও রয়েছে মোম এবং প্রোপলিস। এগুলোর চেয়েও বড় যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হলো পরাগায়ন সার্ভিস। বর্তমান উন্নত বিশ্ব বিশ্বাস করে যে, মৌমাছির মধুর চেয়ে বেশি লাভজনক হলো এর পরাগায়ন সার্ভিস। এছাড়া প্রোপলিস হলো ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। পৃথিবীতে ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রোপলিস উৎপন্ন করে থাকে এবং এসব রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এসব মৌমাছিকে আমাদের উপকারে আনতে হলে এদের সম্পর্কে জানতে হবে এবং আরও জানতে হবে যে, এদের সঙ্গে উদ্ভিদের কি সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে সামাজিক মৌমাছিদের নিয়ে যতটুকু কাজ হয়েছে সেটাও মূলতঃ বিদেশি গবেষকরাই করেছে (ইংল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের গবেষকরা) ফলে এদের কোনো তথ্য এখানে পাওয়া খুবই দুষ্কর। যে যে কারণে সামাজিক মৌমাছিরা আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রধান কয়েকটি কারণ নিচে দেয়া হলো—

১. বাসা বানানোর পরিবেশ নষ্ট করে;

২. খাদ্যের উৎস নষ্ট করে;

৩. নির্বিচারে এদের চাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করে;

৪. নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করে।

এদের বিনাশের পিছনে বন উজাড় হওয়া একটি অন্যতম মুখ্য কারণ। ইদানিংকালে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে এদের বেঁচে থাকা বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর কার্যকলাপের ফলে এদের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশে বনজ ফুলের সংখ্যা কম তাই এদের জন্যে ফুলের বৃক্ষ রোপণ করা উচিত হবে। জাপানে একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, প্রাকৃতিক উদ্ভিদ কমে যাওয়ার ফলে মৌমাছিরা রোপণ করা উদ্ভিদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

এখন থেকে যদি এসব সামাজিক মৌমাছিদের নিয়ে এবং এদের পরাগায়ন ক্ষমতা নিয়ে কাজ না করা হয় তবে এর সুফল থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত হতে হবে।

ষোড়শ অধ্যায়

পলিনেটর ব্যবস্থাপনা

কোনো একটি পলিনেটরের কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করে প্রয়োজনের সময়ে এদেরকে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়াকেই পলিনেটর ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থাৎ গবেষণাগারে এদেরকে যেকোনো সময়ে উৎপন্ন করার ব্যবস্থা থাকলে যখন ফুলের পরাগায়নের প্রয়োজন ঠিক সে মুহূর্তেই এদেরকে ব্যবহার করা যাবে। কীটপতঙ্গের ব্যবস্থাপনা শব্দটি বেশ সহজ মনে হতে পারে কিন্তু এর বাস্তবায়ন একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ।

পতঙ্গের ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে ১৯৪০ সালে। জর্জ বোহার্ট নামে একজন বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ–এর উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন করেন। সে সময় পতঙ্গ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়েছিল শস্য পরাগায়নে অ-মৌমাছিদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, যদিও *Apis* মৌমাছিদেরও ব্যবস্থাপনা করা হয়েছিল। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর উন্নয়ন এবং প্রয়োগের লক্ষ্যে অনেক অনেক গবেষণা কর্ম চলছে। একটি পতঙ্গকে ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

১. একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের একটি নির্দিষ্ট পলিনেটর বাছাই করতে হবে ;

২. এদের ব্যবহার এবং জীবনবৃত্তান্ত জানতে হবে ;

৩. ফুলে ভ্রমণ ক্ষমতা জানতে হবে ;

৪. পরাগায়ন ক্ষমতা জানতে হবে ;

৫. প্রয়োজনের সময়ে তাদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে ;

৬. অতিমাত্রায় উৎপন্ন (Mass rearing) করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শুধু পলিনেটরদের ব্যবস্থাপনাই নয় অন্যান্য কীটপতঙ্গও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে যেগুলো জৈব দমনকারী (Biological control agent) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

শস্য পরাগায়নের ক্ষেত্রে মৌমাছিই হলো জৈবিক পলিনেটরের (biotic pollinator) মধ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের। মূলত এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশে পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা এখন পুরোদমে এগিয়ে চলছে। আজ পর্যন্তও অনেক দেশেই সামাজিক মৌমাছিই একমাত্র পলিনেটর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অ–মৌমাছিও এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। সত্যি বলতে কি পরাগায়নে অ-মৌমাছিরা

সামাজিক মৌমাছির চেয়ে অনেকগুণ বেশি কর্মঠ ও পরিশ্রমী। আর এদের সংখ্যাও সামাজিক মৌমাছির চেয়ে অনেক কম প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আপেল পরাগায়নে যেখানে হেক্টর প্রতি ২–৩ হাজার শিংমুখো মৌমাছির (*Osmia cornifrons*) প্রয়োজন হয় সেখানে সামাজিক মৌমাছির প্রয়োজন হয় প্রায় ১৬,৮০০–এর মতো। তারপরও মৌমাছির তুলনায় শিংমুখো মৌমাছিরা অধিকতর ভালোভাবে পরাগায়ন করে থাকে। তাই আজ জাপানে আপেল পরাগায়নের জন্যে প্রধানত শিংমুখো মৌমাছিই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাদের সার্থক ব্যবস্থাপনাও হচ্ছে সেখানে।

সপ্তদশ অধ্যায়

কীটপতঙ্গ উৎপাদনের শিল্প প্রতিষ্ঠান

পতঙ্গের বিপণন উন্নত কয়েকটি দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা এবং বিশ্বব্যপী এর পরিসর বাড়ার একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এর মধ্যে পতঙ্গই সবচেয়ে বেশি এবং প্রায় ১.৮ মিলিয়ন প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি বিরাট গ্রুপ রয়েছে যারা হলো মৌমাছি (সামাজিক এবং স্বতন্ত্র মৌমাছি) এদের সবাই পরাগায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ফলে এদের ব্যবহার চাহিদা অনেক বেশি। বিশেষ বিশেষ ফসলের পরাগায়নের জন্যে এদেরকে ব্যবস্থাপনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ব্যবস্থাপনা করতে হলে এদের বহুল উৎপাদন প্রয়োজন পড়ে। কারণ একই সময়ে বিশেষ উদ্ভিদের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্যে এদের সংখ্যা অনেক প্রয়োজন হতে পারে তাই গবেষণাগারে অতগুলো একবারে উৎপাদন সম্ভব হয় না বলে সৃষ্টি হয়েছে পতঙ্গ শিল্প প্রতিষ্ঠানের (Insect Industry)। সেখানে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পতঙ্গ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে।

বন্য মৌমাছিদের পরাগায়নে ব্যবহার করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে পতঙ্গ ব্যবস্থাপনার এবং এটা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বর্তমান বিশ্বে বন্য মৌমাছিদের অন্তত তিনটি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে পলিনেটর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১. ক্ষারীয় মৌমাছি (*Nomia melanderi*)

২. পাতাকাটা মৌমাছি (*Megachile rotundata*)

৩. শিংমুখো মৌমাছি (*Osmia cornifrons*)

প্রফেসর মায়েতার মতে (Shimane University, Japan) উপরোক্ত মৌমাছিগুলোর পলিনেটর হিসেবে ব্যবহার উন্মোচন করেছে "New Entomology Industry" অর্থাৎ নতুন পতঙ্গ শিল্প প্রতিষ্ঠানের।

ড. মায়েতা *Osmia cornifrons*-কে শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন করেছেন আপেল পরাগায়নের জন্যে। মূলত তার এই আবিষ্কারের ফলে জাপানে আপেল উৎপাদনকারী কৃষকদের মনে অনেক আসার সঞ্চার করেছিল। তিনি বলেন যে, সে সময়ে এক বছরে এ বন্য মৌমাছির কোকুন (Cocoons) বিক্রি করে ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা হয়েছিল।

শিংমুখো মৌমাছি ব্যবহারের পূর্বে জাপানের আপেল চাষীরা হস্তদ্বারা আপেলের ফুলের পরাগায়ন সম্পন্ন করত। তা ছিল যেমন কষ্টকর তেমনি সময় সাপেক্ষ। কিন্তু *Osmia*-এর

আবিষ্কারের ফলে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এই *Osmia cornifrons* কে পলিনেটর হিসেবে এবং ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে সময় লেগেছিল প্রায় ৩০বছর। এখন এ মৌমাছি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। বছরের যেকোনো সময় এবং যত খুশি কিনে জাপানের কৃষকরা তাদের কাজে লাগাতে পারছেন। এদের কোকুনকে রেফ্রিজারেটরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় এবং যখনই এদের কর্মক্ষম তাপমাত্রায় আনা হয় এরা কোকুন থেকে বের হয়ে পরাগায়ন ক্রিয়া শুরু করতে পারে (রঙিন চিত্র ২৭)।

কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে (নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড) প্রায় ৩০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ উৎপাদন করছে যা কৃষিকাজে ব্যবহার হয়। এদের কয়েকটি হলো যেমন—কোপার্ট (Kopart), বায়োবেস্ট (Biobest), আপি (Api),ক্যাটস (Cats) ইত্যাদি। এ ধরনের কয়েকটি কোম্পানি জাপানেও গড়ে উঠেছে পতঙ্গ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কোম্পানিগুলো একদিকে যেমন কর্মসংস্থানে সহায়তা করছে তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য অন্যদিকে সহায়তা করছে উন্নত কৃষির।

আমাদের দেশেও কি পতঙ্গ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ নয়! এখানে আছে অনেক প্রজাতির বন্য এবং সামাজিক মৌমাছি। যেগুলো নিয়ে এখনো তেমন কাজ হয়নি। যদি এ বিষয়ে গবেষণা করা হয় এবং অন্তত একটি প্রজাতিও পাওয়া যায় ব্যবস্থাপনা করার জন্যে তাও একটি কম ব্যাপার নয়।

আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির ফুল রয়েছে , যেগুলো পরপরাগায়ন ছাড়া ফল উৎপন্ন করে না। এমনই একটি ফল হচ্ছে ডুমুর। ডুমুর অত্যন্ত সুস্বাদু ফল কিন্তু পরাগায়ন করা হয় না বলে এর স্বাদ থেকে বঞ্চিত এদেশের মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডুমুর একটি অতি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু ফল। এর উন্নয়ন ঘটাতে পারলে আমাদের দেশেও এত পুষ্টিকর ফলটি খাওয়ার সুযোগ হতো।

আমাদের কৃষির উন্নয়নের জন্য পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা ও পতঙ্গ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরিবেশতন্ত্রে পলিনেটরের গুরুত্ব

পরাগায়নের প্রক্রিয়া এবং পলিনেটরের ব্যবহার এ দু'য়েরই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে পরিবেশের বিভিন্ন জীবের, উদ্ভিদের, জেনেটিক বৈচিত্র্যের, ফুলের বৈচিত্র্যের, উদ্ভিদের বিবর্তনের এবং সর্বোপরি বাস্তব্যতন্ত্র সংরক্ষণের। বিভিন্ন পলিনেটর বিভিন্নভাবে বাস্তব্যতন্ত্রে তাদের অবদান রাখে। একই পলিনেটর সব উদ্ভিদে একই রকমের কার্য সম্পাদন করতে পারে না।

স্বপরাগায়ন এবং তার ভূমিকা

স্বপরাগায়নের ফলে কোনোরকম জিনের পুনঃবিন্যাস হয় না এবং বংশগত গুণাবলির অবক্ষয়ের (genetical impoverishment) কারণে উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের ক্ষমতা হারায়। যার জন্যে একটি উদ্ভিদ নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না ফলে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বপরাগায়ন খুব কম উদ্ভিদেই হয় তবে সংঘটিত প্রজাতির নিষেকক্রিয়ার হার খুব ভালো (প্রায় ৯৯%)। গম, ভুট্টা, বার্লি প্রভৃতিতে এবং সুযোগ সন্ধানী (opportunistic) বাৎসরিক উদ্ভিদে (annual plants) স্বপরাগায়ন ঘটে থাকে। পুনঃপুন স্বপরাগায়ন হলে একটি উদ্ভিদের উচ্চতা, ওজন এবং বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা সর্বোপরি সজীবতা কমে যায়।

বায়ু-পরাগায়ন (anemophily)

বাতাস দিয়ে পরাগায়ন সর্বোপরি সজীবতা কমে যাওয়ার থেকে কিছুটা ভালো, এ কারণে যে এখানে outcrossing হওয়ার সুযোগ বেশি, ফলে জিনের পুনর্বিন্যাস (gene recombination) ঘটার সুযোগও বেশি। এ ধরনের পরাগায়নকে এলোমেলো ধরনের পরাগায়ন প্রক্রিয়া বলা যায়, কারণ বাতাসের দিক এবং গতির উপর এর সার্থকতা নির্ভর করে। বায়ু-পরাগায়নকে সার্থক করার জন্য প্রয়োজন শুষ্ক আবহাওয়া, কম ঘন প্রজাতিক বৈচিত্র্য অথবা একই প্রজাতির অনেক উদ্ভিদের এক সঙ্গে অবস্থান। ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে এ ধরনের পরাগায়ন সার্থকতা নির্ভর করে, নিচু এলাকায় বায়ু-পরাগায়ন নেই বললেই চলে।

উনবিংশ অধ্যায়

ফুলের গঠন

পরাগায়ন সংঘটনের একমাত্র স্থান হলো উদ্ভিদের ফুল, যার অনুপস্থিতিতে পরাগায়ন ক্রিয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তাই ফুলের গঠন এবং কার্য পদ্ধতি অবশ্যই জানতে হবে তা না হলে পরাগায়ন সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে জানতে হবে ফুল এবং পলিনেটরের মধ্যে সম্পর্ক কি। ফুলের গঠন এবং উপহার সামগ্রির (পরাগ এবং নেকটার) উপর নির্ভর করে এদের পলিনেটর কে বা কারা হবে (সারণি ১৯.১)। একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের নিম্নোক্ত অংশগুলো থাকে :

সারণি ১৯.১ : ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং পরাগায়নে তাদের ভূমিকা

ফুলের অংশ	কার্য
বৃণ্ডি (Calyx)	১. কুঁড়ি অবস্থায় ফুলকে বিভিন্ন আঘাত থেকে রক্ষা করে ২. কিছু কিছু ফুলের ক্যালিক্স দেখতে খুব সুন্দর *(Limonium* spp.*)* ৩. কিছু উদ্ভিদের ক্যালিক্স অলফ্যাক্টোরি গ্রন্থি বা প্রয়োজনীয় তেল গ্রন্থি ধারণ করে (Lamiaceae পরিবারের অনেক উদ্ভিদ) ৪. নেকটার গ্রন্থি ধারণ করে
দলমণ্ডল (Corolla)	১. রঙ্গিন অংশ, সাধারণত সুঘ্রাণ বহন করে (Olfactory gland) ২. পলিনেটরের ব্যবহার (Behavior) নিয়ন্ত্রণ করে ৩. পলিনেটরের জন্য অনেক সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে রাতে কিংবা খারাপ আবহাওয়ার সময় ৪. অনেক উদ্ভিদে *(Cypripedium)* করোলাতে নেকটার গ্রন্থি অবস্থান করে ৫. অনেক উদ্ভিদে তাপ উৎপাদন করে *(Serapias)* ৬. খারাপ আবহাওয়া এবং রাতে বন্ধ থেকে ফুলের অন্যান্য অংশের সুরক্ষা দান করে *(Crocus, Anemone)*
পুংস্তবক ও (Androecium)	১. নেকটারের সুরক্ষা দান করে *(Asphodelus)* ২. স্ত্রীস্তবকের সুরক্ষা দান করে (Leguminosae) ৩. অনেক সময় এরা নেকটার গ্রন্থিও বহন করে *(Colchicum)* ৪. দেখতে সুন্দর বলে পলিনেটর আকর্ষণ করতে সহায়তা করে *(Verbascum)*
পরাগধানী (Anther)	পরাগ উৎপাদন করে

স্ত্রীস্তবক ও (Gynoecium) গর্ভমুণ্ড (Stigma)	১. পরাগ স্থাপনের স্থান। গর্ভমুণ্ড এমনভাবে থাকে যেখানের জৈবরাসায়নিক পদার্থ সঠিক পরাগ গ্রহণ করতে সক্ষম। এটি germination substrate হিসেবেও কাজ করে। পরাগের সার্থকতার জন্যে পর্যাপ্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম। সর্বাপেক্ষা অগ্রে বিরাজমান পরাগ সুরক্ষা করে ২. নিষেক ঘটাতে সাহায্য করে (breeding) ৩. অনেক সময় দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয় (*Crocus*)
গর্ভদণ্ড (Style)	১. নিষেকক্রিয়ায় সহায়তা করে।
ওভারি (Ovary)	১. এখানে ওভিউল থাকে ২. নিষেকক্রিয়া ঘটে ৩. নেকটার গ্রন্থি বহন করে ৪. অনেক প্রাণী খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করে

উৎস : Dafni (1992) থেকে পরিবর্তিত।

১. বৃতি (calyx) : সাধারণত সবুজ রঙের হয় এবং এটি কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের অন্যান্য অংশগুলোর সুরক্ষা দান করে ;
২. দল (corolla) : ফুলের পাঁপড়ি, যা বিভিন্ন রঙের হয় ;
৩. পুংস্তবক (androecium) : পুংস্তবক, এখানে পরাগ থাকে ;
৪. স্ত্রীস্তবক (gynoecium) : স্ত্রীস্তবক এর ভিতরে স্ত্রীকোষ (female gamete) থাকে।

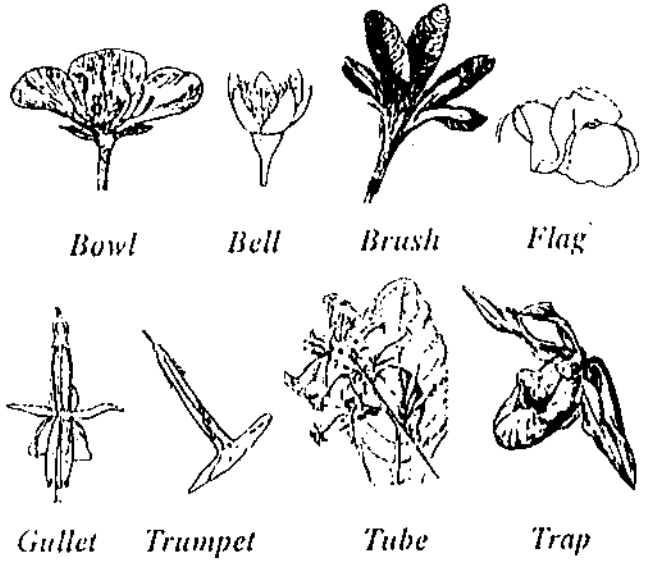

চিত্র ১৯.১ : বিভিন্ন আকারের ফুলের চিত্র, ফুলের গঠনের সাথে ভ্রমণকারীর দৈহিক গঠনের সম্পর্ক

সাধারণত ফুলের আকারের উপর ভিত্তি করে পলিনেটর নির্ধারিত হয় (চিত্র ১৯.১)। কারণ এর সঙ্গে রয়েছে পলিনেটরের দৈহিক আকার-আকৃতি এবং আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে জিহ্বার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সব পলিনেটরের জিহ্বা এক সমান নয়। মূলত অনেক সময় এ জিহ্বার দৈর্ঘ্যই এদেরকে একটি নির্দিষ্ট ফুলে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে। প্রায়শঃই দেখা গিয়েছে যে, ছোট জিহ্বাযুক্ত পলিনেটররা সাধারণত লম্বা করলাদৈর্ঘ্যের ফুল এড়িয়ে চলে; ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়, বড় জিহ্বাযুক্ত পলিনেটররা

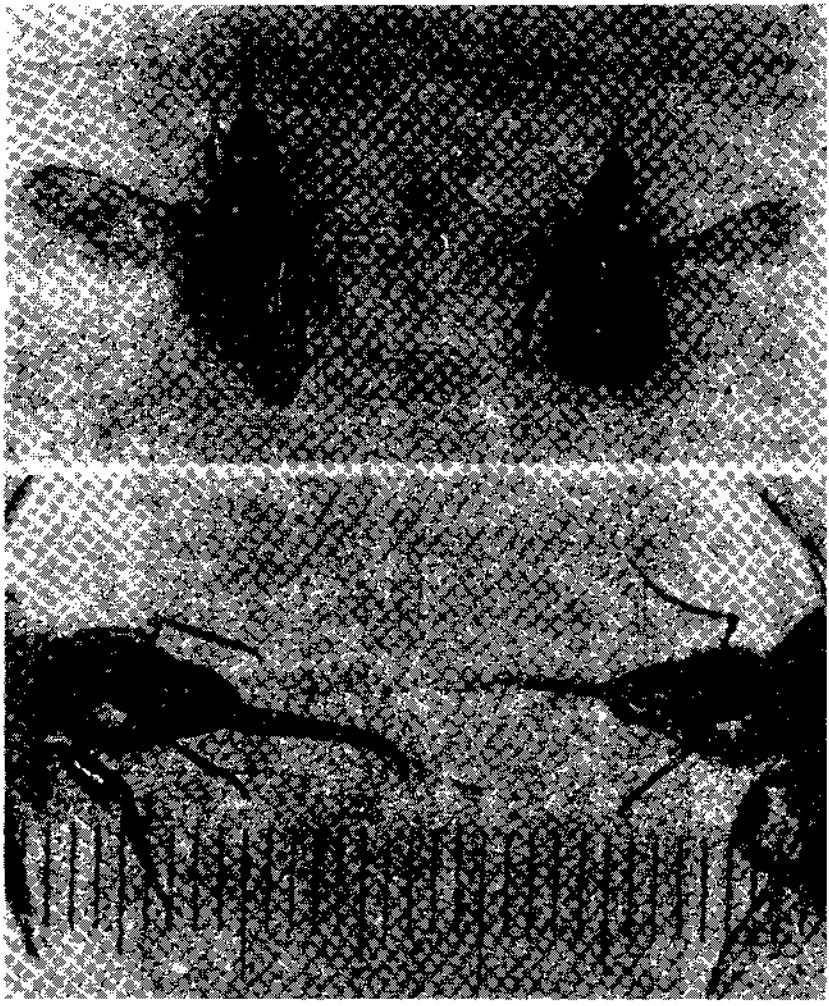

চিত্র ১৯.২ : চিত্রে ভ্রমরের জিহ্বার দৈর্ঘ্যের পার্থক্য দেখানো হয়েছে

ছোট করলা দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফুলকে এড়িয়ে চলে। অর্থাৎ ফুল বাছাইয়ে জিহ্বার দৈর্ঘ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে (চিত্র ১৯.২)। নিচে বিভিন্ন আকারের ফুলের পলিনেটরের একটি তালিকা দেয়া হলো।

১. থালার ন্যায় ফুল (bowl) : পলিনেটর হলো বিটল, সামাজিক মৌমাছি, মাছি, প্রজাপতি এবং মথ ;
২. ঘণ্টাকার ফুল (bell) : ছোট জিহবাযুক্ত মৌমাছি, বোলতা, মাছি, সেটলিং মথ (settling moth), পাখি, বাদুর ;
৩. বুরুজাকার ফুল (brush) : সামাজিক মৌমাছি, প্রজাপতি, বিটল, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি ;
৪. পতাকাকার (flag) : লম্বা জিহবাযুক্ত মৌমাছি, পাখি ;
৫. গালেট (gullet) : লম্বা জিহবা যুক্ত মৌমাছি, হকমথ, পাখি, প্রজাপতি ;
৬. ট্রাম্পেট (trumpet) : প্রজাপতি, হকমথ, পাখি ;
৭. টিউব (tube) : হোভারিং এবং পাচিং মথ, প্রজাপতি, পাখি, লম্বা পোবসিস মাছি ;
৮. ট্র্যাপ (trap) : কারিওন মাছি, বিটল, ছোট ছোট ডিপটেরা সামাজিক মৌমাছি।

পরাগ বহন ক্ষমতা

গায়ে প্রচুর লোম থাকা পরাগ সংগ্রহের এবং বহনের পূর্ব শর্ত। তাই যেসব পলিনেটরের গায়ে প্রচুর লোম থাকে তারা প্রচুর পরিমাণ পরাগ সংগ্রহ এবং বহন করতে পারে। ভ্রমর, *Apis* মৌমাছি এবং স্বতন্ত্র মৌমাছি গড়ে ২০ থেকে ৯০,০০০ (সর্বাধিক ০.৫ মিলিয়ন) পরাগ রেণু তাদের গায়ে বহন করতে পারে, যা থ্রিপস-এ হয়ে থাকে মাত্র কয়েকটি। কম লোমবিশিষ্ট ছোট ছোট মৌমাছি যেমন *Hylaeus* খুব একটা বেশি পরাগ বহন করতে পারে না।

পলিনেটররা তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে পরাগ বহন করে, যেমন—

১. করবিকিউলিতে
২. মাথায়
৩. পেটে বা বক্ষে

ফুলের আকার এবং পরাগায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে এ বিন্যাস নিশ্চিত করেছে। পলিনেটরের দৈহিক গঠনের ও ফুলের গঠনের উপর ভিত্তি করে ঠিক হয়েছে একটি উদ্ভিদের আসল পলিনেটর কোনটি।

ফুলে ভ্রমণ ক্ষমতা

সব পলিনেটর সব সময়, সব ফুলে একইভাবে ভ্রমণ করতে সক্ষম নয়। এটা পলিনেটর থেকে পলিনেটরে যেমন পার্থক্য হয় অন্যদিকে উদ্ভিদের উপরও নির্ভর করে। শুধু তাই নয় তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদিও এদের ভ্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, মৌমাছি (Honeybee)

সাধারণত ১০ থেকে ১৫° সেলসিয়াসে ফুলে ভ্রমণ করতে শুরু করে এবং যখন ২০ থেকে ২৫° সেলসিয়াস হয় সে সময় এদের ভ্রমণ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

ফুল পছন্দ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সব ফুলে সব পলিনেটর বসে না এবং পরাগায়ন ক্রিয়াও সম্পন্ন করতে পারে না তাই বিপর্যয় ঘটে তখনই, যখন কোনো মৌমাছি প্রয়োজনে তার নিয়মিত ভ্রমণ করা উদ্ভিদে না গিয়ে অন্য উদ্ভিদে যায়। সেক্ষেত্রে সে এখানে নেকটার কিংবা পরাগ সংগ্রহ করে ঠিকই কিন্তু পরাগায়ন নাও ঘটাতে পারে। অনেক সময় এক্ষেত্রে শোনা যায় নেকটার/পরাগ লুণ্ঠন (robbing) ক্রিয়া ঘটে থাকে। আবার অনেক ফুল একই সময়ে ফুটে গেলে সেক্ষেত্রে মৌমাছিদের পছন্দের পরিধি বেড়ে যায় বলে কাঙ্ক্ষিত ফুলে পরাগায়ন নাও ঘটাতে পারে।

মৌমাছির পছন্দের রঙ

মৌমাছিতে সাধারণত দুটি যৌগিক চোখ (compound eyes) এবং তিনটি সরল চোখ (ocelli) থাকে। প্রত্যেকটি যৌগিক চোখ হাজার হাজার ওমাটিডিয়াম (ommatidium) দিয়ে তৈরি।

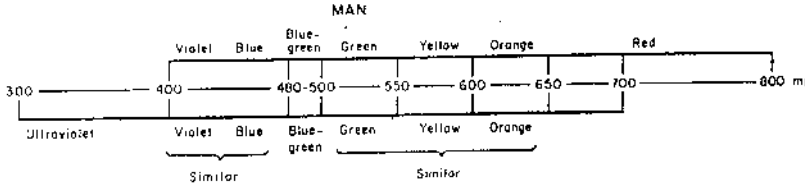

চিত্র ১৯.৩ : মানুষ এবং মৌমাছি দেখতে পারে যেসব রঙ তাদের নাম এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনা চিত্র

মৌমাছি ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় এর রঙ আকার–আকৃতি এবং গঠনের উপর ভিত্তি করে (Baker ও Hurd, 1968; Kevan, 1978; Dafni, 1984)। ফুলের ঘ্রাণ মৌমাছি খুব সহজেই নিতে পারে। মৌমাছি মানুষের মতো প্রায় সব রঙই দেখতে পায় (Trichromatic, (Michener, 1974; Daumer, 1956)। তবে এরা অতিবেগুনি (ultraviolet) রঙকে একটি আলাদা রঙ হিসেবে দেখে যা মানুষ দেখে না, যাদের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খাটো (চিত্র ১৯.৩, ১৯.৪)। আবার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হয় এমন রঙ যেমন গাঢ় কমলা–লাল এরা দেখতে পায় না। (Daumer,1958; Frisch, 1967; Silberglied, 1979; Kevan 1983)। মৌমাছি যে রঙগুলো দেখতে পায় সেগুলো অবশ্যই হতে হবে 530 mμ (সবুজ), 430 mμ (নীল) এবং 340 mμ (অতিবেগুনি)–এর আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মিশ্রণ। বিপরীতধর্মী রঙগুলো মিলে সাদা রঙ–এর সৃষ্টি করে অর্থাৎ সাদা রঙ হিসেবে দেখে (Daumer, 1956)।

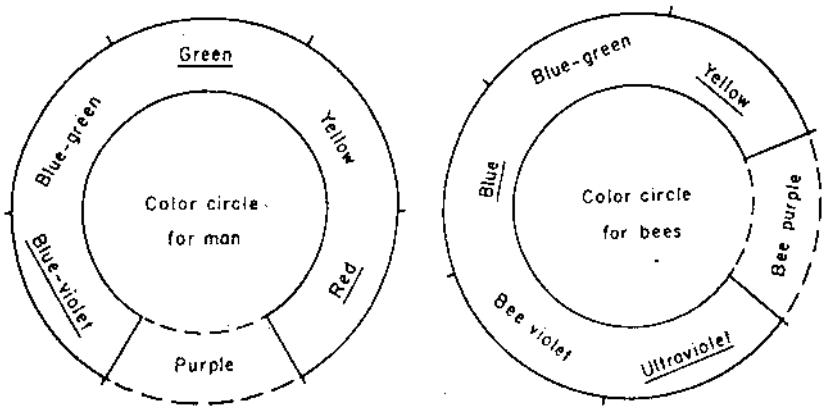

চিত্র ১৯.৪ : মানুষ এবং মৌমাছির রঙচক্র তিনটি প্রধান রঙ দাগ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য রঙগুলো প্রধান রঙের মিশ্রণের তৈরি হয় (Michener, 1974)

অন্যদিকে মানুষ যেমন দেখতে পায় ফুলের সাদা, হলুদ, নীল–বেগুনি অথবা পিঙ্গল (Purple) বর্ণ ; মৌমাছিও এ বর্ণগুলো দেখতে পায়। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গিয়েছে যে, মৌমাছিরা সাদা ফুলের চেয়ে হলুদ ফুলই বেশি পছন্দ করে। মানুষ এবং মৌমাছির রঙের বিভিন্নতার তুলনা দুটি আলাদা চিত্রের সাহায্যে করা হলো (চিত্র ১৯.৩, ১৯.৪)। এখান থেকে দেখা যায় মানুষ অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পায় না (400 m-এর নিচে) আবার মৌমছি লাল রঙ দেখতে পায় না (700 m-এর উপরে)।

এ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম পরিবেশে মৌমাছির ব্যবহার দেখার জন্য লাল আলোর নিয়ন সাইন ব্যবহার করা হয়। কারণ লাল আলোতে মৌমাছিরা দেখতে পায় না বলে শান্ত থাকে।

ফুলে পলিনেটর আকর্ষক পদার্থ

পলিনেটরের বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পরাগ আর নেকটার, যা থাকে একমাত্র ফুলে। অন্যদিকে ফুলের বংশবৃদ্ধির জন্যে স্বার্থক পরাগায়ন প্রয়োজন যা অনেকাংশেই সংঘঠন করতে সাহায্য করে বিভিন্ন পলিনেটর। তাই এদেরকে আকর্ষণ করার জন্যে উদ্ভিদের ফুলে থাকে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় উপহার্য পদার্থ (সারণি ১৯.২)। ফুলের এ উপহার্যগুলো নিম্নরূপ :

১. ফুলের রঙ ;

২. ফুলের ঘ্রাণ এবং এর তীব্রতা ;

৩. ফুলের আকার এবং আকৃতি ;

৪. পরাগ এবং নেকটারের পরিমাণ, ধরন ইত্যাদি ;

৫. ফোটার সময়।

সারণি ১৯.২ : ফুলে সঞ্চিত বিভিন্ন পদার্থ (reward) এবং পরাগায়নে এদের ভূমিকা

পদার্থ	রাসায়নিক গঠন	ব্যবহারকারী	পরিবেশতাত্ত্বিক ভূমিকা
নেকটার	কার্বোহাইড্রেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, লিপিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যালকালয়ড, প্রোটিন, ভিটামিন এবং অন্যান্য	প্রায় সবধরনের পলিনেটর গ্রুপ অথবা ভ্রমণকারী নিজের জন্যেই	একমাত্র শক্তি উৎপাদনকারী উপঢৌকন (reward) নেকটারের পরিমাণ, ঘনত্ব, নিঃসরণ প্রভৃতি পলিনেটর গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফুলের গঠনের সাথে এর উৎপাদন সঙ্গতিপূর্ণ
পরাগ	প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, লিপিড, মিনারেল, এনজাইম, পিগমেন্ট, এবং অন্যান্য	বিশেষভাবে পতঙ্গ তবে প্রধানত এর ডেভেলোপমেন্টের সময় ব্লড ফুড হিসেবে ব্যবহৃত হয়	যে কোনো ধরনের ম্যান্ডিবুলেট (mandibulate) কীটপতঙ্গই এদের ব্যবহার করতে পারে। এটি গ্রহণ করতে কারো (insect) কোনো অসুবিধা হয় না
গর্ভমুণ্ড নিঃসৃত রস	লিপিড, চিনি, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফেনোলিক, অ্যালকালয়ড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।	কীটপতঙ্গ	একমাত্র trap flowers-এর মধ্যে পাওয়া যায়।
ফ্লোরাল টিস্যু	চিনি, শর্করা, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি	কীটপতঙ্গ (প্রধানত বিটল এবং মৌমাছি) এবং বাদুর	পরাগধানী, বিভিন্ন ধরনের টিস্যু (পেটাল, ইত্যাদি)
তেল	সেচুরেটেড মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, ডাইগ্লুইসারাইড	বিশেষ স্ত্রী মৌমাছি	ট্রপিক্যাল দেশগুলোর বিশেষ কতগুলো উদ্ভিদে পাওয়া যায়। একটি বিশেষ স্থানে এর উৎপত্তি হয় (elaiophores)। তেল সংগ্রহের জন্যে বিশেষভাবে পরিবর্তনীয় setae এবং সামনের tarsi ব্যবহার হয়
রেজিন এবং গাম (gums)	টারপিন	মৌমাছি (Euglossini, Meliponini, Anthidiini).	কিছু কিছু ট্রপিক্যাল উদ্ভিদ রেজিন এবং গাম উৎপন্ন করে থাকে। মৌমাছিরা এগুলো বাসা তৈরিতে ব্যবহার করে।

পদার্থ	রাসায়নিক গঠন	ব্যবহারকারী	পরিবেশতাত্ত্বিক ভূমিকা
রুড সাইট	---	বিশেষ ধরনের কীটপতঙ্গ	ফুলের ভিতরে ডিম পাড়ে (oviposition site) এবং বাচ্চা পালন (brood rearing) করে, যেমন—*Yucca, Ficus* । পূর্ণ বয়স্ক পতঙ্গ সে ফুলের পরাগায়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
আবাসস্থল	ফুল আবাসস্থল এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে	মৌমাছি, মাছি, বিটল	এরা ফুলের ভিতরে যখন ঘুমায় এবং বিশ্রাম নেয় সে সময় বেশ শক্তি পেয়ে থাকে যেহেতু ফুলের ভিতরের তাপমাত্রা বাহিরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি
সাক্ষাৎ-কারের স্থান	মিলনের বিশেষ সুযোগ ঘটে	কীটপতঙ্গ	কিছু কিছু পুরুষ যখন mating-এর জন্যে ফুলে অপেক্ষা করে তার বিনিময়ে এরা ফুলের পরাগায়নও ঘটিয়ে থাকে।
শিকার ধরা	ফুলে এরা থাকে	কীটপতঙ্গ	শিকারি কীটপতঙ্গ শিকার ধরতে ফুলে আসে এবং বিনিময়ে অনেক সময় পরাগায়নও ঘটিয়ে থাকে।

উৎস : Dafni (1992)।

উল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই ফুলের পলিনেটর বাছাইয়ে (pollinator selection) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এদের পরিমাণ (বিশেষ করে ঘ্রাণের তীব্রতা, নেকটার) পলিনেটরের বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিছু কিছু পলিনেটর ঘ্রাণের চেয়েও ফুলের রঙকে বেশি পছন্দ করে থাকে, যেমন- মৌমাছি (Frisch, 1967)। নিচে ফুলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা করা হলো।

১. ফুলের রঙ

পলিনেটরের চোখে বেশ দ্রুততম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ফুলের রঙ, রঙের বিন্যাস, আকার এবং আকৃতি, যা ফুলকে পলিনেটরের কাছে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ফুলের উৎস থেকে পলিনেটরের অবস্থানের দূরত্বও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্যে।

সব রঙই মৌমাছিরা দেখতে পায় না (যেমন লাল রঙ)। দৃশ্যমান সকল বস্তুই হলো পলিনেটরের জন্যে ফুলের প্রধান প্রচারণা (advertisement) তার। ফুল এগুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে পলিনেটরকে আকর্ষণ করার জন্যে।

অনেক ফুলেরই একাধিক রঙ হয়ে থাকে এবং সময় বাড়ার সাথে সাথে সে রঙও পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে আসল রঙ যাচাই করতে হলে সদ্য ফোটা ফুলের রঙকেই ধরে তা করতে হয়। ফুলের রঙ তার পরিবেশের সাথে যদি একিভূত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তা সাধারণত নজরে আসে না। অনেক ফুল একই সঙ্গে একই জায়গায় ফুটলে সেটা একই প্রজাতি/ভিন্ন প্রজাতির হলেও যদি প্রায় একই রঙের হয় সেক্ষেত্রে পলিনেটরের ফুল বাছাই করতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়।

ফুলের আকার এবং আকৃতি

একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তার আকার, আকৃতি, রঙ, গন্ধ এবং এর বিন্যাসের ধারার মাধ্যমে। ফুলের আকার প্রায়শই এর পরিধিকে (diameter) বুঝায়। ফুলের আকৃতি দিয়ে বুঝানো হয় এর গঠনকে। আর গঠনের উপরও পলিনেটরের ফুল পছন্দ নির্ভর করে।

ফুলের ঘ্রাণ

পলিনেটর বাছাই করতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ঘ্রাণও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফুলের ঘ্রাণ গ্রন্থি (scent gland) সাম্প্রতিক কালেই আবিষ্কৃত হয়েছে (Vogel 1963, 1990)। এসব সুগন্ধ ফুলের গায়ে ছড়িয়ে থাকে। ফুলের সুগন্ধ অনেকগুলো রাসায়নিক যৌগের ঘনিষ্ঠ মিশ্রণের ফলে তৈরি হয়। অতি উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি সুগন্ধকে ধরা হয় Long-range cue হিসেবে এবং কম উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থকে ধরা হয় Close-range cue হিসেবে (Bergstrom, 1978)।

সুগন্ধ (Scent organ) অঙ্গগুলোর খুব মজবুত নিঃসরণ ক্ষমতাসম্পন্ন কলাকে (tissue) অসমোফোর বলে (Vogel 1963, 1990)। কিছু প্রজাতির অর্কিড আছে যা পুরুষ Euglossine (Apidae) দিয়ে পরাগায়ন করানো হয় (Williams, 1983)। পুরুষ অর্কিড মৌমাছিরা অর্কিডের ফুল থেকে নিঃসৃত বিশেষ ধরনের সুগন্ধি তেল সংগ্রহ করে, যদিও এরকম সংগ্রহের কারণ কি তা এখনো জানা যায় নি।

ফুলের এ সুনির্দিষ্ট ঘ্রাণ একটি পলিনেটরকে খুব সহজেই তার পছন্দের ফুলকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এর ফলে আরও একটি জিনিস ঘটে তা হলো পলিনেটররা একমাত্র নির্দিষ্ট প্রজাতির অন্যান্য ফুলে ভ্রমণ করে সার্থক পরাগায়ন ঘটাতে সাহায্য করে (Faegri Pijl, 1979)।

ফুলের বিশ্বস্ততা

একটি পলিনেটর খাদ্য সংগ্রহের জন্যে প্রতি ভ্রমণে যদি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলে যায় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তবে এ ঘটনাকে ফুলের বিশ্বস্ততা (flower constancy) বলা হয়।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই জানা গিয়েছিল যে, একটি মৌমাছি প্রতি ভ্রমণে একটি নির্দিষ্ট ফুল থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে (Dafni, 1992)। ফুলের পছন্দ একটি অতি জটিল ব্যাপার। কোনো পলিনেটর একটি ফুলকে পছন্দ করার অনেক কারণ থাকতে পারে এবং এ ধরনের পছন্দ শারীরিক কারণ হলে সেটা তার একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যদি একটি পলিনেটর অনেকগুলো প্রজাতির ফুলের মধ্য থেকে ইচ্ছে করেই যে-কোনো একটিকে পছন্দ করে নেয় তাহলে সেটা হবে পলিনেটরের সত্যিকারের ফুলের প্রতি বিশ্বস্ততা (flower constancy) একটি ফুলকে মৌমাছি নিম্নোক্ত কারণে পছন্দ করতে পারে :

১. ফুলের করোলার দৈর্ঘ্যের সাথে মৌমাছির জিহ্বার একটি সম্পর্ক রয়েছে ফলে যে ফুলটির সাথে মৌমাছির জিহ্বার মিলবে সাধারণত সে ফুলেই এরা বেশি যাওয়ার প্রবণতা দেখাবে ;

২. অন্য প্রজাতির ফুলের অভাব হলে অর্থাৎ পলিনেটরের এলাকায় অন্য ফুল না থাকলেও এরা একই ফুলে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয় ;

৩. বার-বার একই ফুলে আসতে বাধ্য করলে (সেটা সম্ভব হয় যখন পলিনেটর এবং ফুল একই জায়গায় আবদ্ধ থাকে যেমন গ্রিনহাউস/জালে ঘেরা খাঁচায়। যেহেতু সেখান থেকে পলিনেটরের বের হওয়ার আর পথ থাকে না, আর অন্য ফুল থাকলেও সেগুলো তেমন পছন্দও করে না)।

ফুলের বিরামহীন পছন্দের গুরুত্ব

পলিনেটরের ফুলের পছন্দ কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলের পরাগায়ন ঘটাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যদি মৌমাছিরা ফসলের মাঠে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফসলের ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে সে ফুলের উত্তম পরাগায়ন হয় এবং উত্তম ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে। মৌমাছিদের যদি বাধ্য করা যায় একটি নির্দিষ্ট ফুলে ভ্রমণ করতে তাহলে একটি নির্দিষ্ট ফসলের পরাগায়ন করানোর জন্যে তাদের (সেসব মৌমাছির) ব্যবস্থাপনাও করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল অনেক ফসলের পরাগায়নের জন্যে এভাবে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফুলের প্রতি বিশ্বস্ততা বাড়ানোর উপায়

যে যে উপায়ে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলের প্রতি পলিনেটরের মধ্যে বিশ্বস্ততা (flower constancy) বাড়ানো যায় সেগুলো নিম্নরূপ হতে পারে :

১. ফুলের আকার, রঙ এবং ঘ্রাণ একটি পলিনেটর চিনতে পারলে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে পারে ;

২. কাছাকাছি অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলের উৎস অনেক সময় মৌমাছিকে আকৃষ্ট করে ;

৩. দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় যখন একটি নির্দিষ্ট ফুল ফোটে সেটাও ফুল পছন্দ করতে সাহায্য করে।

ফুলের পছন্দ বোঝার উপায়

সাধারণত পলিনেটরের বহন করা পরাগ পরীক্ষা করেই ফুলের পছন্দ বোঝা যায়। পূর্বে এ ধারণাটি বেশ গ্রহণযোগ্য ছিল কিন্তু আজকাল আর তেমন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ একই ফুলে অনেক সময়ই পরাগ এবং নেকটার নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে একটি পলিনেটরকে একটি ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করতে হয় এবং অন্য ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহ করতে হয়। অতএব, শুধু পরাগ সংগ্রহ দেখেই ফুলের পছন্দ বোঝা যাবে না তৎসঙ্গে সংগৃহীত নেকটারও পরীক্ষা করতে হবে, তাহলেই বোঝা যাবে ফুলের পছন্দ সম্পর্কে। একটি নির্দিষ্ট পলিনেটর একটি নির্দিষ্ট ফুলেই কেবল ভ্রমণ করে না অন্যান্য ফুলেও ভ্রমণ করে। ফুলের পছন্দ সম্পর্কে Faegri ও Pijl (1979) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। শুধু পরাগ সংগ্রহ প্রমাণ করে একটি পলিনেটরের পরাগ পছন্দকে (pollen constancy) যা ফুল পছন্দ (flower constancy) নাও হতে পারে।

বিংশ অধ্যায়

পরাগ

পরাগধানী (anther) হলো ফুলের এমনই একটি অংশ যা পরাগ রেণু (pollen grain) উৎপাদন করে এবং জমা রাখে। পরাগরেণু হলো পুং গ্যামেটোফাইট, [illegible]। পরাগধানী একটি ফিলামেন্টের মাথায় লেগে থাকে, সাধারণত এর দুটি চেম্বার (locules) থাকে যার মধ্যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পলিনেটরের গায়ে লেগে বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

পলিনেটরের জন্যে ফুলের উপহারগুলোর (floral reward) মধ্যে পরাগ হলো তাদের বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার জন্যে সবচেয়ে উচ্চমানের পুষ্টি বহনকারী বস্তু। মৌমাছির খাদ্যের প্রধান উপাদান (প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং লিপিড) এর একমাত্র উৎস হলো পরাগ (সারণি ২০.১)। এগুলো তাদের বৃদ্ধির জন্যে এবং বেঁচে থাকার জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। নিচে পরাগরেণুতে যেসব গঠনকারী যৌগ রয়েছে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হলো।

পরাগধানীর দুটি চেম্বার থাকে যাকে বলে লোকিউল (locules), যার ভিতরে পরাগ রেণুগুলো উৎপন্ন হয় এবং এখান থেকে পুষ্টি নেয়।

যেভাবে পরাগ বের হয়

ফুলের বৃদ্ধির এক পর্যায়ে যখন পরাগধানী ফেটে বা খুলে যায় (dehiscence) ঠিক তখনই এর ভিতরে লোকিউল এর দেয়ালের উপর পরাগগুলো ছড়ানো থাকে। সেখান থেকে পলিনেটরের গায়ে লেগে পরাগ রেণু অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। পরাগধানী ফাটার জন্যে বিভিন্ন রকমের উপাদান (factor) কাজ করে, যেমন — বাতাসের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ইত্যাদি।

পলিনেটররা বিভিন্ন উপায়ে ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে, যেমন — শব্দ কম্পন সৃষ্টির (buzzing) মাধ্যমে বা কম্পনের সৃষ্টি করে (vibrating)। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যাদের পরাগ সামান্য একটু নাড়া পেলে খুব সহজেই ঝরে পড়ে, আবার কিছু আছে যাদের ঝাঁকুনি দিলেও পড়ে না। সেক্ষেত্রে পলিনেটরকে অনেক কায়দা-কানুন করে কিংবা প্রচুর শক্তি বল প্রয়োগ করে সেসব উদ্ভিদের পরাগ সংগ্রহ করতে হয়। এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টমেটোর ফুলের কথা। টমেটোর ফুল থেকে পরাগ সব মৌমাছি সংগ্রহ করতে পারে না। এ ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী পলিনেটরের প্রয়োজন হয়। আর সেজন্যেই বাম্বল ভ্রমর ব্যবহার করা হয় টমেটোর পরাগায়ন ঘটানোর জন্যে।

সারণি ২০.১ : ফুল গঠনকারী রাসায়নিক পদার্থের তালিকা

পদার্থের নাম	প্রজাতির সংখ্যা (পরীক্ষার জন্য)	গড় পরিমাণ (%)	(Typical Range) সাধারণ সীমা
প্রোটিন (Protein)	২৭৭	২৪%	৭.৫ – ৩৫%
লিপিড (Lipid)	৫২	৫%	১ – ১৫%
কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)	৪৭	২৭%	১৫–৪৫%
ফসফরাস (Phosphorous)	৫৪	০.৫%	০.১–০.৬%
ছাই (Ash)	৬০	৩.১	১–৫
পটাশিয়াম (Potassium)	৫৬	০.৬	০.২–১.১
ক্যালসিয়াম (Calcium)	৬০	০.২	০.১–০.৫
ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	৩০	০.২	০.১–০.৪
সোডিয়াম (Sodium)	৫১	০.০৪	০.১৫–০.৮
আয়রন (Iron)	২৮	১৪০ µg/g	Wide
ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	২১	১০০ µg/g	Wide
জিঙ্ক (Zinc)	২৭	৭৮ µg/g	Wide
কপার (Copper)	২৩	১৪ µg/g	৬–২৫ µg/g
নিকেল (Nickel)	?	৫ µg/g	০–৭ µg/g
বোরন (Boron)	?	Trace	?
আয়োডিন (Iodine)	৮	?	৪–১০ µg/g
থায়ামিন (Thiamin)	৬	৯ µg/g	৪–২২ µg/g
নায়াসিন (Niacin)	৮	১৫৭ µg/g	১৩০–২১০ µg/g
রাইবোফ্লাভিন (Riboflavin)	২	১৯ µg/g	?
পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)	৩৩	৯ µg/g	?
পেন্টোথেনিক অ্যাসিড (Pantothenic acid)	৮	২৮ µg/g	৫–৫০ µg/g
ফলিক অ্যাসিড (Folic acid)	৪	৫ µg/g	?
বায়োটিন (Biotin)	৭	০.৩ µg/g	০.২–০.৬ µg/g
ভিটামিন সি (Vitamin C)	?	৩৫০ µg/g	০–৭৪০ µg/g
ভিটামিন এ (Vitamin A)	৪	০ µg/g	০

কেরোটিন (Carotenes)	৪	৯৫ µg/g	৫০–১৫০ µg/g
ভিটামিন ডি (Vitanin D)	৪	০	০
ভিটামিন ই (Vitamin E)	৪	১৪ µg/g	?
ভিটামিন কে (Vitamin K)		০	০

পরাগের নিষেকক্রিয়া এবং বীজ উৎপাদন

সাধারণত পরাগকে মনে করা হয় যে, এরা সব সময় নিষেকক্রিয়া (germination) ঘটাতে সক্ষম এবং এদের প্রত্যেকটিরই নিষেকক্রিয়া ঘটানোর ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে সম্যক গবেষণালব্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যেকোনো পরাগের নিষেকক্রিয়া সম্পর্কে বলা কঠিন। শুধু তাই নয় গবেষকদের আরও জানতে হবে যে, এরা আসলে কতদিন নিষেকক্রিয়া ঘটানোর জন্যে উপযুক্ত (viable) থাকে। এরা ফুল থেকে পৃথক হওয়ার পর বিরাট এক আলাদা মাধ্যমে পতিত হয়। সেখান থেকে ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে সময় ও সুযোগের বিষয় রয়েছে এবং এর ফলে এ অন্তর্বর্তীকালীন এদের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা সেটি জানা প্রয়োজন। একটি পরাগ কণাকে সার্থকভাবে নিষেকক্রিয়া ঘটাতে নিম্নোক্ত ধাপগুলো পার হতে হয় :

১. পরাগধানী থেকে পরাগ যেকোনো বাহকের মাধ্যমে এসে গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়া ;

২. পরাগ ও গর্ভমুণ্ডর মধ্যে সংযোগ ঘটা ;

৩. পরাগরেণুর পানিসংযোজন (hydration) ঘটা ও গর্ভমুণ্ডর প্যাপিলি (stigmatic papillae) আগমনকারী পরাগের নিষেকক্রিয়া ঘটানোর যোগ্যতা থাকা ;

৪. পরাগের নিষেক রন্ধ্র (germinal pores) খুলে যাওয়া এবং পুরোপুরি পানিসংযোজন ঘটা ;

৫. পরাগনালি বের হওয়া এবং নিচের দিকে বাড়তে থাকে ;

৬. পরাগনালি গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছলে ওভিউল (ovules)-এর মধ্যে পরাগরেণু নিউক্লিয়াই (nuclei) ছেড়ে দিয়ে একটি নিষিক্ত জাইগোট (fertilized zygote) উৎপন্ন করা, যা পরে একটি বীজে পরিণত হয়।

ফুলে ভ্রমণ

পলিনেটরের ফুলের মধ্যে বিচরণের ধরন দেখলে মনে হতে পারে যে, এরা তা করছে পরাগ স্থানান্তরের জন্যে। আসলে সেটা ঠিক নয়। তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহ করার জন্যে এরা ফুলে আসছে আর বিনিময়ে এ অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে যাচ্ছে উদ্ভিদের জন্যে। ফুলে ভ্রমণকারী সকল পতঙ্গই পলিনেটর নাও হতে পারে কারণ তাদের সবাই সার্থকভাবে পরাগায়ন করতে পারে না। কেউ আংশিক, কেউ একেবারেই নয়, আবার কেউ পরাগায়ন করা তো দূরে থাক বরং ফুলের আরও ক্ষতিসাধন করে থাকে। এদেরকে

নেকটার/পরাগ ছিনতাইকারী বলা হয়, কারণ এরা নেকটার বা পরাগ সংগ্রহ করার সময় ফুলের পরাগায়ন না ঘটিয়েই এ কাজটি সমাধা করে থাকে। শুধু তাই নয় এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রমণকারীরা নিয়মিত পরাগায়ন করে পলিনেটরকে সেসব ফুলে ভ্রমণে বাধার সৃষ্টি করে, তাদেরকে আক্রমণ করে এবং ফুলকে উপঢৌকনহীন (rewardless) করে। কিছু কিছু ছুতার মৌমাছি, (carpenter bee) ভ্রমর, ভলবিহীন মৌমাছি এ ধরনের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত। এরা বাইর থেকে ফুলের গোড়ার দিকে যেখানে নেকটার থাকে সে স্থানটি কামড়িয়ে ছিদ্র করে (ভিতরে ঢোকার পরিবর্তে) সেখান থেকে নেকটার সংগ্রহ করে নেয়। ফলে ভিতরে অবস্থিত পরাগের সঙ্গে এদের কোন সংস্পর্শ হয় না এবং পরাগায়ন ও ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

আবার কতকগুলো আছে চোরের মতো নেকটার বা পরাগ চুরি করে নিয়ে যায় (nectar/pollen thief) তবে ফুলের কোনো ক্ষতি করে না কিন্তু পরাগায়নও ঘটায় না। ছোট ছোট মৌমাছিরা (*Trigona* এবং ছোট Halictidae) এ ধরনের কাজে লিপ্ত। এরা সাধারণত নেকটার এবং পরাগ ফুল থেকে সংগ্রহ করে ঠিকই কিন্তু কিছুতেই ফুলের গর্ভমুণ্ডকে ছোঁয় না।

এ ধরনের ফুল চুরিকে (floral larceny) ফলে ফুল তাদের নেকটার হারায়, যার ফলে উপকারী পলিনেটরেরা সে ফুলে ভ্রমণ করতে অনাগ্রহ হয়। আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই বললেই চলে, ফলে এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি কোনটি কোন শস্যের জন্যে অকল পলিনেটর। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গবেষণা/পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোনটি কোন উদ্ভিদের জন্যে সত্যিকারের পলিনেটর তা বলা খুবই কঠিন।

কিছু কিছু ফুল আছে যেখান থেকে খুব সহজেই পলিনেটররা পরাগ বা নেকটার সংগ্রহ করে নিতে পারে। আবার কিছু আছে যাদের ফুল খুবই জটিল (complex) যেখানে পরাগ এবং নেকটার গুপ্ত থাকে, যেমন মিন্ট (Lamiaceae) এবং লিগিউম (Leguminosae) নেকটারের জন্যে; ব্লু বেরি (Ericaceae) এবং টমেটো (Solanaceae) পরাগের জন্যে। এসব জটিল ফুলের পরাগ এবং নেকটার উপঢৌকন (reward) সংগ্রহের জন্যে বিশেষ ধরনের পলিনেটর ছাড়া পরাগায়ন ঘটানো সম্ভব নয়। আর সেজন্যেই আজকাল টমেটোর জন্যে সবচেয়ে ভালো পলিনেটর হিসেবে জন্ম দিয়েছে ভ্রমরকে এবং, আপেলের জন্যে শিশুমুখো মৌমাছিকে। এ ধরনের পলিনেটরও চট করেই এসব জটিল (complex) উদ্ভিদে পরাগায়ন ক্রিয়া করতে পারে না সেজন্য তাদের বুঝে উঠতে একটু সময় লাগে। তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে, ফুল যত জটিল তার উপঢৌকন তত উন্নত মানের। আমাদের দেশে শস্য পরাগায়নকে উন্নত করতে হলে এ বিষয়ে অনেক অনেক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

ফুলের বিরামহীন পছন্দ (Flower Constancy)

খুব খেয়াল করে ফসলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, জমিতে যখন ফুল ফোটে সেখানে অনেক অনেক পলিনেটর আসে। নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করে উড়ে চলে যায় তাদের বাসস্থানে, সেখানে জমা রেখে আবার আসে একই জমিতে, এমনি করে তাদের

যতক্ষণ সম্ভব এবং প্রয়োজন তা তারা করে চলে. এটি সম্ভব হয় মৌমাছিদের, এরকম ভ্রমণের (foraging) একটি বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে যার জন্যে তারা এটি করতে পারে। এ কাজের জন্যে তারা একটি বোধশক্তির মানচিত্র (cognitive map) ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে সূর্যকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান হিসেবে ধরে নেয়। এ ধরনের মানচিত্র (cognitive map) হতে পারে দৃশ্যমান কোনো বস্তু অথবা ঘ্রাণবস্তু (visual and olfactory landmarks); যার উপর ভিত্তি করে পলিনেটররা তাদের বাসায় ফিরে আসতে পারে কিংবা বিচরণ ভূমিতেও যেতে পারে। একটি পলিনেটর যখন তার পছন্দের ফুলের সন্ধান পায় সে তখন শুধু সেখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে, যদিও আশেপাশে অন্যান্য অনেক ফুলই থাকে। তবে কিছু কিছু পলিনেটর আছে যাদের কোনো পছন্দ নেই অথবা ফুল বদলাতেও পছন্দ করে, তাই একটি নির্দিষ্ট ফুলে না গিয়ে যেখানে খুশি চলে যায়। শস্য পরাগায়নে ফুলের বিরামহীন পছন্দ (flower constancy) একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার সার্থকতার উপর নির্ভর করে পরাগায়নের সার্থকতা। পলিনেটর যদি ইপ্সিত ফুলে ভ্রমণ না করে সেক্ষেত্রে পলিনেটরদের থেকে কোনো উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না। আর তাই উদ্ভাবন হয়েছে নানা রকম প্রযুক্তির, কিভাবে এদেরকে ইপ্সিত ফুলে আনা যায় এবং ধরে রাখা যায়।

. *Apis* মৌমাছি একটি গ্রুপ যাদের ফুল বদলানোর স্বভাবটা খুবই প্রকট। ফলে একই সময়ে অনেক জাতের উদ্ভিদের ফুল ফুটলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে যদি এদেরকে ব্যবহার করা হয় পরাগায়নের কাজে।

পরাগ সংগ্রহ

ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহের জন্যে পলিনেটরদের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেমন ফুলের পরাগধানীতে সজোরে ঝাঁকুনি দেওয়া অথবা বল প্রয়োগ করা অথবা ম্যান্ডিবলের সাহায্যে দোহন করা ইত্যাদি।

পরাগধানী থেকে যখন পরাগ ঝরে পলিনেটরের গায়ে পড়ে, সেখান থেকে সংগ্রহ করার অঙ্গের (Collecting organ যেমন— পা, ম্যান্ডিবল) সাহায্যে সারা শরীর থেকে এনে এক জায়গায় জড় করে (পেছনের পায়ে/পেটের তলায়) বাসায় নিয়ে আসে। প্রথমে সামনের পা এবং পরে মাঝখানের পায়ের সাহায্যে পরাগ সারা শরীর থেকে ক্রমশ পেছনের পায়ের করবিকি উলিতে জমা করে (রঙিন চিত্র ৩২)। যে যে প্রক্রিয়ায় পলিনেটররা ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. শব্দ কম্পাঙ্কের সাহায্যে (Buzzing) ;
২. দোহন করে (Milking) ;
৩. কুড়িয়ে (Gleaning)।

১. শব্দ কম্পাঙ্ক পদ্ধতি

অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের পরাগ খুবই জটিল প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত থাকে (যেমন টমেটো, বেগুন ইত্যাদি) এবং সাধারণত এগুলো অল্প ঝাঁকুনি বা পলিনেটরের সামান্য ছোঁয়া লেগেই

ঝরে পড়ে না ; সেক্ষেত্রে পলিনেটরের বল প্রয়োগ করতে হয়। অনেক পলিনেটরই তাই এসব উদ্ভিদ থেকে পরাগ সংগ্রহ করতে সজোড় শব্দ কম্পন সৃষ্টি করে ফুলের সংরক্ষিত স্থান থেকে পরাগ ঝরিয়ে নেয়। সাধারণত ছোট এবং দুর্বল পলিনেটররা বাজিং প্রক্রিয়ায় পরাগ সংগ্রহ করতে পারে না। এজন্যে শক্তিশালী এবং বড় আকারের পলিনেটররা বেশি উপযুক্ত। তাই দেখা যায় ভ্রমর একধরনের যোগ্য শব্দ কম্পাঙ্ক সৃষ্টিকারী পলিনেটরে (Buzz pollinator) পরিণত হয়েছে। ভ্রমরের কর্মীরা পরাগধানী আঁকড়ে ধরে এদের গায়ের উড্ডয়ন পেশীর সাহায্যে শব্দ কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করে, যার ফলে পরাগধানী থেকে পরাগ পলিনেটরের গায়ে ঝরে পড়ে (Thorp, 1979; Buchmann, 1983)। এসব উদ্ভিদের পরাগগুলো বেশ দৃঢ়ভাবে পরাগধানীতে লেগে থাকে। এধরনের উদ্ভিদের সবসময় একটি বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা থাকে এ কারণে যে, কিছু কিছু মৌমাছি আছে যারা পরাগধানীর টিউব কেটে ছিদ্র করে প্রোবোসিস ঢুকিয়ে পরাগ সংগ্রহ করে নেয় ফলে পরাগায়ন ঘটে না (Wille, 1963)। বাজ পলিনেটররা যে কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করে তা প্রায় ৪ — ৫ KHZ এবং এর জন্যে সময় প্রয়োজন প্রায় ০.১ — ১০.০ সেকেন্ড। সময় কম হয় যখন ফুলে পরাগের মজুদ বেশি থাকে (Buchmann, 1983)। বাজ পরাগায়ন করে এধরনের কয়েকটি মৌমাছি হলো যেমন— *Xylocopa, Amegilla, Anthophora, Melipona, Bombus* ইত্যাদি।

চিত্র ২০.১ : বাজ পরাগায়নরত একটি বন্য মৌমাছির চিত্র

২. দোহন পদ্ধতি

যখন মৌমাছিরা শব্দ কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করে সে সময়ে এরা ম্যান্ডিবলের সাহায্যে পরাগধানী দোহন করেও অনেক সময় পরাগ সংগ্রহ করে থাকে। এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে সাধারণত যখন পরাগধানী একটু নরম হয় তখন।

৩. কুড়ানো পদ্ধতি

কিছু কিছু মৌমাছি আছে যারা এ পদ্ধতিতে পরাগ সংগ্রহ করে। এটি ঘটে যখন কোনো মৌমাছি শব্দ কম্পাঙ্কের সাহায্যে পরাগ সংগ্রহ করে এ সময় কিছু পরাগ ফুলের ভিতরে পড়ে যায়। আর সে পরাগগুলোকে অন্য মৌমাছি এসে একটি একটি করে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই পরাগায়ন ঘটে না। সামাজিক মৌমাছি এবং হুলবিহীন মৌমাছিকে প্রায়শঃই এরূপ ক্রিয়া করতে দেখা যায়।

একবিংশ অধ্যায়

নেকটার

নেকটার (nectar) হলো চিনি এবং অন্যান্য খুব সামান্য রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে গঠিত তরল পদার্থ যা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় এবং ফুলের মধ্যে জমা থাকে। যে স্থান থেকে নেকটারের নিঃসরণ ঘটে তার নাম নেকটার গ্রন্থি বা নেকটারি (সারণি ২১.১ দ্রষ্টব্য)।

নেকটার গ্রন্থির অবস্থান

উদ্ভিদের গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে নেকটারি (nectary) উদ্ভিদের বিভিন্ন স্থানে থাকতে পারে। শুধু যে ফুলের মধ্যেই থাকবে এমন কোনো কথা নেই এছাড়াও (cotyledon) কাণ্ডে, পাতায়, উপপত্রে (stipule), ফুলে এবং ফলে পর্যন্ত নেকটার গ্রন্থি থাকতে পারে। অনেক সময় একাধিক স্থানেও নেকটার থাকতে দেখা যায়, যেমন *Vigna unguiculata* -তে দুটি নেকটার গ্রন্থির দুটোই ফুলের বাইরে উপপত্র (stipules) এবং ফুলের গোড়া (flower base) এর মাঝখানের দণ্ডে (inflorescence stalk) অবস্থিত। তাই নেকটার গ্রন্থির অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুরকম নাম দেয়া হয়েছে যেমন— বহিঃপ্রজননিক নেকটারি (Extrareproductive nectaries) এবং প্রজননিক নেকটারি (Reproductive nectaries)।

বহিঃপ্রজননিক নেকটারিগুলো থাকে উদ্ভিদের অঙ্গজ (vegetative) অংশে, এদেরকে extrafloral nectaries ও বলা হয়ে থাকে। প্রজননিক নেকটারিগুলো থাকে ফুলের পুষ্পদণ্ড, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী (inflorescence, stem, bracts) ও অন্য যেকোনো অংশে।

পরাগায়ন ক্রিয়ায় প্রজননিক নেকটার গ্রন্থিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এসব গ্রন্থিগুলো ফুলের প্রজননিক গঠনের মধ্যে বা গোড়ায় (stamen) এবং ডিম্বাশয় অথবা ফুলের এমন কোনো অংশে থাকে যেখান থেকে নেকটার আনতে হলে পরাগায়ন পায়ে পরাগধানী এবং গর্ভমুন্ড ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনা থাকে ফলে পরাগায়ন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নেকটারের অবস্থান এবং বের হওয়ার সময় এ দুইই সার্থক পরাগায়নে ভূমিকা রাখে। তবে একটি নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নেকটার গ্রন্থি থাকার অবস্থান সাধারণত

পরিবর্তন হয় না। যেমন সরিষায় (Brassicaceae) নেকটার গ্রন্থিটি থাকে গর্ভদণ্ড (stamen) এর গোড়ায়। *Eucalyptus* (Myrtaceae)-এ নেকটার নিঃসরণ হয় floral cup-এর চারদিক ঘিরে।

নেকটারের অবস্থান দেখেই নেকটার গ্রন্থির অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। নেকটার গ্রন্থির অবস্থান নির্ণয় করা একটু কষ্টসাধ্য কাজ। নেকটার গ্রন্থিকে চিহ্নিত করার সহজ উপায় হলো এর রঙ দেখে, চারপাশের রঙ থেকে আলাদা বলে খুব সহজেই এটিকে চিহ্নিত করা যায়।

সারণি ২১.১ : নেকটারের বিভিন্ন উপাদান এবং পরাগায়নের ভূমিকা

উপাদান	ঘনত্ব	পরাগায়নে ভূমিকা	মন্তব্য
চিনি	৫–৭৫%	পলিনেটরের শক্তি সঞ্চয়ের প্রধান উৎস, বিভিন্ন পলিনেটর বিভিন্ন ঘনত্বের নেকটার পছন্দ করে।	সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজ হলো চিনির উপাদান। চিনির ঘনত্ব পলিনেটর শনাক্ত (select) করতে সাহায্য করে।
অ্যামাইনো অ্যাসিড	০.২৫–১৫,৫০০ µmol/ml	এর পরিমাণ থেকেও পলিনেটরের ধরন নির্ধারণ হয়।	যেকোনো উদ্ভিদের এটি প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কোনো প্রজাতিতে যতটুকু অ্যামাইনো অ্যাসিড হওয়ার কথা সাধারণত ঠিক সেটুকুই হয়ে থাকে।
প্রোটিন	সামান্য	এর সঙ্গে সুক্রোজ-এর এনজাইমেটিক বিক্রিয়ার সংযোগ রয়েছে(?)।	—
লিপিড	খুবই সামান্য (Traces)	পরাগায়নের সঙ্গে এর সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে তবে নেকটারের উপরে এর একটি পাতলা আবরণ (Film of lipid) নেকটারের বাষ্পীভবন রোধ করে।	লিপিড নেকটারের সাথে তেল গ্রন্থি থাকে।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)	খুবই সামান্য	নেকটারে অবস্থিত অন্যান্য উপাদানকে অক্সিডেশন হওয়া থেকে রক্ষা করে।	—

অ্যালকলয়ড	খুবই সামান্য	যারা সত্যিকারের পলিনেটর নয় অর্থাৎ কিছু মথ এবং প্রজাপতি তাদেরকে অনুৎসাহিত করে।	—
		অন্যদিকে এটি সাধারণ পলিনেটর যেমন, মৌমাছিদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না।	
পিগমেন্ট	মৎসামান্য	অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করতে সাহায্য করে ফলে নেকটার পলিনেটরদের কাছে আরও সহজে দৃশ্যমান হয় (?)।	—
উপাদান	**ঘনত্ব**	**পরাগায়নে ভূমিকা**	**মন্তব্য**
ভিটামিন	খুবই সামান্য	এদের উপস্থিতি নিশ্চিত নয় সব সময়।	থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড ইত্যাদি এরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।
প্রয়োজনীয় তেল	১–৩ ٪	ফুলের ভিতরের তেল গ্রন্থি থেকে এর উৎপত্তি হয়।	নেকটারের উদ্বায়ী অংশ উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে পার্থক্য হতে পারে।
পলিস্যাকরাইড	খুব সামান্য	আঠালো পদার্থ সৃষ্টি করে।	—

উৎস : Dafni, 1992।

নেকটারে চিনির ঘনত্ব

নেকটারে চিনির ঘনত্ব একই উদ্ভিদেও সময়, কাল, তাপমাত্রা, আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। সেসব উদ্ভিদে নেকটারে পানির পরিমাণ খুব বেশি কমে যেতে পারে। এটা হয় অতিরিক্ত বাষ্পীভবন (evaporation)-এর কারণে। আবার অন্যদিকে বৃষ্টির পানি, কুয়াশা ইত্যাদি ফুলের ভিতরে ঢুকে গেলেও নেকটারের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। চিনির ঘনত্ব বাড়ে যদি নেকটার থেকে পানি কমে যায়, আর পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে চিনির ঘনত্ব কমে যায়। Kato ও Inoue (1994) প্রমাণ করেছেন যে, *Gnetum*-এ চিনির ঘনত্ব বাতাসের আর্দ্রতার কারণে কমে বা বাড়ে। তারা আরও বলেন যে, এ ঘনত্ব সন্ধ্যার সময় প্রায় ৯৫٪ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ফুলের নেকটারে চিনির পরিমাণ নির্ণয় করার নিয়ম হলো নেকটার ভলিউমকে চিনির ঘনত্ব দিয়ে গুণ করা (mutliply nectar volume by sugar concentration)। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে কি করে ফুলের নেকটারে চিনির ঘনত্ব বের করা যায়।

উদাহরণ : মনে করি, একটি ফুলে আছে ৩.৫ μL নেকটার (microliters অথবা ১/১,০০০,০০০তম লিটার) এবং ৩৬% চিনি (৩৬ গ্রাম চিনি/১০০ ml পানি) তাহলে উক্ত নেকটারে চিনির পরিমাণ কত?

উপরোক্ত সম্পর্ক থেকে চিনির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৫ μL × ৩৬g চিনি/ ১০০ ml পানি = ১.২৬ mg চিনি।

নেকটার ভলিউম এবং চিনির ঘনত্ব মাপার নির্দিষ্ট যন্ত্র রিফ্রেক্টোমিটার এর সাহায্যে এসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পলিনেটর চিহ্নিত করা

পলিনেটর ধরা এবং চিহ্নিত করা

যেকোনো পলিনেটরের পরাগায়ন ক্ষমতা এবং ভ্রমণের দূরত্ব জানার জন্যে এর চিহ্নিতকরণ অতীব জরুরি। এছাড়া বোঝা কঠিন যে, কোন পলিনেটর কোন উদ্ভিদে এবং কতদূরে গিয়ে পরাগায়ন করছে। পোলেন স্তূপ (pollen load) দেখে হয়তো বলা যাবে এরা কোন ফুলে ভ্রমণ করে কিন্তু এটা কিছুতেই বলা যাবে না যে এরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। সে কারণেই এদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

মৌমাছিদের চিহ্নিতকরণের জন্যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ/চিহ্ন/নাম্বার/রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যতই দিন যাচ্ছে এদের চিহ্নিতকরণের ততই নতুন নতুন উন্নতমানের সামগ্রি পাওয়া যাচ্ছে। কিছুকাল পূর্বেও সাধারণ কাগজে নাম্বার লিখে কেটে মৌমাছির পিঠে (thorax) আঠার সাহায্যে লাগিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু মুশকিল ছিল পানি লাগলে সেগুলো খুলে যেত। আর অতো ছোট কাগজে বড় সংখ্যার নাম্বার (১০/১০০ এর বেশি) লিখা অসম্ভব ছিল। সে সমস্যার সমাধানকল্পে আজকাল চমৎকার এক ধরনের নাম্বার প্লেট বেরিয়েছে যা একধরনের বিশেষ আঠার সাহায্যে মৌমাছির পিঠে বসিয়ে দিলে খুব সহজেই সেটা আটকে থাকে (*Hannan et al.* 1997, 1998)। এগুলো বৃষ্টির পানিতে খুলে যায় না, এমনকি স্পষ্টভাবে অনেক দূর থেকে নাম্বার বোঝাও যায় এবং বিভিন্ন রঙের (০–৯৯) ১০০টি করে থাকায় ছোট আকারের কলোনির প্রায় ৫০০ কর্মীর প্রত্যেকটি মৌমাছিকেই নাম্বার লাগানো যায়। সাধারণত যে কোনো পলিনেটরকে নিম্নোক্ত কারণে চিহ্নিত করা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

১. মৌমাছির ব্যবহার (ethology) দেখার জন্য;

২. ভ্রমণ সম্পর্কে জানার জন্য;

৩. মোট সংখ্যা এবং ভ্রমণকারীর (forager)-র সংখ্যা জানার জন্য;

৪. এদের পছন্দের উদ্ভিদ অর্থাৎ কোন ফুলে এরা ভ্রমণ করে তা জানার জন্য;

৫. ভ্রমণের দূরত্ব জানার জন্য;

৬. এদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোনো তথ্য জানার জন্য।

চিহ্নিত করার নিয়ম

সাধারণত মৌমাছির পিঠের (thorax) উপরে দুই পাখার মাঝখানে এ নাম্বার ট্যাগ/রং/চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। মৌমাছির আকার খুব ছোট হলে নাম্বার ট্যাগ ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে রঙ ব্যবহার করাই উত্তম। কোনো পলিনেটরকে চিহ্নিত করতে হলে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে।

১. প্রথমেই ইনসেক্ট নেটের সাহায্যে পলিনেটরটি ধরতে হবে ;

২. স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে অবস করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বরফে ঢুকিয়ে অবশ করাই সবচেয়ে ভালো। কোনো গ্যাস বা কেমিক্যাল (anaesthetic) ব্যবহার করলে যদি সেটা সঠিক না হয় পলিনেটর মরে যেতে পারে। সেজন্যে সেরকম কিছু ব্যবহার না করাই উত্তম ;

৩. এবার উপরে বর্ণিত যেকোনো একটি পদ্ধতির নাম্বার এর পিঠে বসিয়ে দিতে হবে। একটু সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যেন নাম্বার প্লেটটি শুকিয়ে যায় ;

৪. তারপরে এটিকে পরীক্ষার জন্যে ছেড়ে দেয়া যায়।

যদি চিহ্নিত করার জন্যে কোনো রঙ ব্যবহার করা হয় সেটা যেন ব্যবহার সহজ হয় এবং খুব শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। তা না হলে যখনই পলিনেটরের ব্যবহার স্বাভাবিক হতে থাকে ওটা ওর সামনের পা দিয়ে ঘষে ফেলে দেয়। এতে বিপর্যয় ঘটতে পারে, যেমন রঙ বা আঠা পায়ের ঘষায় যদি চোখ বা মুখের কোনো অংশে লাগে তাহলে এদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। পলিনেটদের কিভাবে চিহ্নিত করা যায় নিচে তা বর্ণনা করা হলো :

১. নাম্বার প্লেট/ট্যাগ/লেবেল ;

২. স্বল্প সময়ে শুকিয়ে যায় এমন রঙ ;

৩. টাইপিং কারেকশন ফ্লুইড ;

৪. ফেরাস ধাতব ট্যাগ ;

৫. দলবদ্ধভাবে চিহ্নিত করার জন্যে ফ্লুরেসেন্ট পাউডার, পাউডার রঙ অথবা যে কোনো রঙের ধূলি ব্যবহার করা যায় (এক্ষেত্রে অনেক অসুবিধেও হতে পারে) ;

৬. রেডিওঅ্যাকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করা যায় (এগুলো শুধু সামাজিক পতঙ্গের জন্যেই সুবিধাজনক)।

বিভিন্ন কোম্পানি নাম্বার ট্যাগ প্রস্তুত করে থাকে (C.H.R. Graze, K.G. Fabrik fur Bienegerate, 7057 Endershach bei Stuttgart, Postfach 7, Würtemberg, Germany Article No, 1373)। এসব ট্যাগ ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং কার্যকরী। রঙ

দিয়ে চিহ্নিত করার জন্যে খুবই সূক্ষ্ম তুলি, ইনসেক্ট পিন, টুথপিক ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। আবার কীটপতঙ্গ আটকানোর জন্যে একটি যন্ত্র আছে (Graze article no. 1373) যার একপাশে ৪ × ৫ মিমি. ছিদ্রবিশিষ্ট জাল আছে। সেখানে দিয়ে একটি স্বাভাবিক পতঙ্গকে অনায়াসেই ট্যাগ লাগিয়ে দেয়া যায়।

যেভাবেই কীটপতঙ্গ চিহ্নিত করা হোক না কেন, খুব খেয়াল রাখতে হয় যেন সেটা পতঙ্গের সাধারণ ব্যবহারে বাঁধার সৃষ্টি না করে অর্থাৎ এর পিঠের দুই পাখার টেগুলার (Tegula) মাঝখানে থাকে এবং নিশ্চিতভাবে শুকানো থাকে। সবকিছু ঠিকভাবে করলে এ ধরনের ট্যাগ সাধারণত পলিনেটরের অসুবিধার সৃষ্টি করে না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মৌ-উদ্ভিদ

পলিনেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হলে এবং এদের প্রাকৃতিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে যা করণীয় সেটা হচ্ছে এদের আহার এবং বাসস্থান নিশ্চিত করা। এ দুটো ঠিক থাকলে প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মৌমাছি সব ফুলে সব সময় ভ্রমণ করে না। এমতাবস্থায় মৌমাছি ভ্রমণ করে এজাতীয় উদ্ভিদের একটি তালিকা তৈরি করা অতীব জরুরি। যে উদ্ভিদে মৌমাছি ভ্রমণ করে সে উদ্ভিদকে মৌ-উদ্ভিদ (bee-plant) বলা হয়। মৌ-উদ্ভিদ মৌমাছির বংশ বৃদ্ধিতে সরাসরি সাহায্য করে থাকে। Hossain ও Sharif (1993) তাঁদের গ্রন্থ "মৌমাছি পালনবিদ্যায়" চট্টগ্রাম অঞ্চলের মৌ-উদ্ভিদ সম্পর্কে বেশ সুন্দর একটি তালিকা উপস্থাপন করেন। Razzak (1987) অনুরূপ আর একটি মৌ-উদ্ভিদের তালিকা তৈরি করেন। BSCIC এর মৌ-কলোনি বিভাজন কেন্দ্র, রাজশাহী "মধু ফুলের বর্ষপঞ্জিতে" অনেকগুলো মৌ-উদ্ভিদের নামের তালিকা প্রদান করেন।

সুন্দরবনে প্রায় ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রজাতির উদ্ভিদই মৌমাছিরা ব্যবহার করে থাকে পরাগ ও নেকটার সংগ্রহের জন্যে। তবে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের মধু হয় খুলসি (*Aegiceras corniculatum*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*) এবং গরান (*Creiops decandra*) থেকে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ শনাক্ত করা হয়েছে। এর থেকে মাত্র অল্প কিছু উদ্ভিদের নাম পাওয়া গেলো যেগুলোতে মৌমাছি তাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করে। এ বিষয়ে গবেষণার পরিধি বাড়লে মৌ-উদ্ভিদের তালিকা আরও বড় হবে বৈকি। শুধু এটাই নয় গৃহস্থালীর বাগান (Homestead gardening) থেকেও এদের জন্য প্রচুর খাবার তৈরি হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বাসস্থানে কিংবা কর্মস্থলে বাগান করে থাকে। এগুলোতে পলিনেটরের কথা চিন্তা করে ফুলের প্রজাতি পছন্দ করলে তা তাদের জন্য অনেক কল্যাণকর হতে পারে। সেখানে মৌমাছি ব্যবহার করে এমন ফুলের বাগান করলে অথবা এদের পছন্দের ফুল থাকলে একদিকে বাগানের শোভা যেমন বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি মৌমাছিরও খাদ্যের সংস্থান হবে যা এদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। সারণি ২৩.১-এ বিভিন্ন প্রজাতির মৌ-উদ্ভিদের তালিকা প্রদান করা হলো।

সারণি ২৩.১ : মৌ-উদ্ভিদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	খাদ্য	ফুল ফোটার কাল	মৌমাছির ভ্রমণের সময় (প্রধানত)	মধুর রঙ	মধুতে পানির পরিমাণ	সংগ্রহের কারণ
১	সরিষা	*Brassica campestris*	নেকটার ও পরাগ	কার্তিক–অগ্রহায়ণ	সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা	মধু হালকা–হলুদ পরাগ হলুদ	১৮–১৯%	সঞ্চয়
২	শিমুল	*Salmalia insignis*	নেকটার ও পরাগ	মাঘ–ফাল্গুন	সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা	মধু হালকা–হলুদ, পরাগ মেটে কমলা	১৯%	সঞ্চয়
৩	লিচু	*Litchi chinensis*	নেকটার	ফাল্গুন	ভোর ৬টা থেকে সকাল ১০টা	মধু স্বচ্ছ হালকা–হলুদ	১৮%	সঞ্চয়
৪	জাম্বুরা	*Citrus grandis*	নেকটার ও পরাগ	ফাল্গুন	ভোর ৬টা থেকে সকাল ১০টা	পরাগ কালচে–বেগুনি, মধু হালকা–হলুদ	১৯%	সঞ্চয়
৫	সাজনা	*Moringa oloifera*	নেকটার	পৌষ–মাঘ	সন্ধ্যায়	মধু স্বচ্ছ সাদা	১৭%	সঞ্চয়
৬	জলপাই	*Elaeocarpus robustus*	নেকটার	আষাঢ়–শ্রাবণ	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা	মধু লাল	২২%	তাৎক্ষণিক ব্যবহার, কখনো সঞ্চয়
৭	মান্দার	*Erythrina ariegata*	নেকটার	মাঘ–ফাল্গুন	দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা	—	—	তাৎক্ষণিক ব্যবহার
৮	পেয়ারা	*Psidium guajava*	নেকটার ও পরাগ	বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ	ভোর ৫.৩০টা থেকে সকাল ৮টা	মধু হালকা–চকলেট পরাগ সাদা	২০%	সঞ্চয়

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	খাদ্য	ফুল ফোটার কাল	মৌমাছির ভ্রমণের সময় (প্রধানত)	মধুর রঙ	মধুতে পানির পরিমাণ	সংগ্রহের কারণ
৯	তেঁতুল	*Tamarindus indicus*	নেকটার	আষাঢ়-শ্রাবণ	সকাল-বিকাল	নেকটার ও মধু লাল	—	তাৎক্ষণিক ব্যবহার
১০	কড়ই	*Albizia procera*	নেকটার	ভাদ্র-আশ্বিন	ভোর ৫.৩০টা থেকে সকাল ৭টা	নেকটার ও মধু কালো	১৯%	সঞ্চয়
১১	কুল বড়ই	*Zizyphus jujuba*	নেকটার	শ্রাবণ-ভাদ্র	সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা	মধু লালচে-হলুদ	১৯%	সঞ্চয়
১২	নারকেল	*Cocos nucifera*	পরাগ	সারা বছর	ভোর ৬টা থেকে সকাল ৯টা	পরাগ সাদা	—	সঞ্চয়
১৩	জাম	*Syzygium grandis*	নেকটার	চৈত্র	ভোর ৬টা থেকে সকাল ৭টা	মধু লাল	২২%	কখনো সঞ্চয়
১৪	আম	*Mangifera indica*	নেকটার	ফাল্গুনের শেষ ভাগ থেকে চৈত্রের প্রথম ভাগ	ভোর ৬টা থেকে সকাল ৮টা	মধু মলিন লাল	১৮%	সঞ্চয়
১৫	কদম	*Anthocephalus cadamba*	পরাগ	জ্যৈষ্ঠ	ভোর ৬টা থেকে সকাল ১০টা	পরাগ সাদা	—	সঞ্চয়
১৬	গজারী	*Shorea robusta*	নেকটার	চৈত্র	ভোর ৬টা থেকে সকাল ১০টা	মধু লালচে-হলুদ	১৮%	সঞ্চয়
১৭	সুপারী	*Areca catechu*	পরাগ	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	ভোর ৫টা থেকে সকাল ৭টা	পরাগ সাদা	—	তাৎক্ষণিক ব্যবহার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	খাদ্য	ফুল ফোটার কাল	মৌমাছির ভ্রমণের সময় (প্রধানত)	মধুর রঙ	মধুতে পানির পরিমাণ	সংগ্রহের কারণ
১৮	আমলকী	*Phyllanthus embelica*	নেকটার	আষাঢ়	সকাল–বিকাল	—	—	তাৎক্ষণিক ব্যবহার
১৯	ধনে	*Coriandrum sativum*	পরাগ	পৌষ	সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা	পরাগ বেগুনি	—	সঞ্চয়
২০	কলা	*Musa Paradisiaca*	নেকটার	গ্রীষ্ম	ভোর ৬ থেকে সকাল ৭টা	—	—	তাৎক্ষণিক ব্যবহার

উৎস : **Razzak, 1987**

সারণি ২৩.২ : চট্টগ্রাম বিভাগের মৌ-উদ্ভিদের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
১	ঢেঁড়শ, ভেণ্ডি	*Abelmoschus esculentus*	Malvaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
২	কাঁটা বাবলা	*Acacia nilotica* (L) *Delile*	Mimosacae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	নেকটার ও পরাগরেণু
৩	হাড়গোজা	*Acanthus illicifolius* L	Acanthaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৪	বেল	*Aegle marmebs* (L)	Rutaceae	মে–জুন	নেকটার
৫	বাসকপাতা, কানতালা	*Agave americana* L	Agavaceae	মার্চ	নেকটার
৬	দুকান্তি	*Ageratum conyzoides* L	Asteraceae	মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
৭	পেঁয়াজ	*Allium cepa* L	Liliaceae	মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
৮	নায়রা, গোবরানটে	*Amaranthus lividus* L	Amaranthaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার ও পরাগরেণু
৯	কাঁটা নটে	*Amaranthus spinosus* L	Amaranthaceae	অক্টোবর–নভেম্বর	নেকটার ও পরাগরেণু
১০	ডাঁটা	*Amaranthus tricolor* L	Amaranthaceae	অক্টোবর–নভেম্বর	পরাগরেণু
১১	কাজু বাদাম	*Anacardium occidentale* L	Anacardiaceae	মার্চ	নেকটার
১২	গবুরা	*Anisomeles indica*	Lamiaceae	মার্চ	নেকটার
১৩	আতা, নোনা	*Annona reticulata* L.	Anonaceae	নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
১৪	শরিফা	*Annona squamosa* L	Anonaceae	নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
১৫	অনন্ত লতা	*Antigonon leptopus*	Polygonaceae		নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
১৭	সুপারি	*Areca catechu* L	Arecaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
১৭	কাঠাল চাঁপা	*Artabotrys hexapetalus*	Anonaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
১৮	কামরাঙা	*Averrhoa carambola*	Averroaceae	মে–জুন	নেকটার
১৯	নিম	*Azadirachta indica*	Meliaceae	এপ্রিল–মে	নেকটার
২০	হিজল	*Barringtonia acutangula*	Lecythidaceae	এপ্রিল–মে	নেকটার ও পরাগরেণু
২১	পুঁই শাক	*Basella alba*	Basellaceae	অক্টোবর-নভেম্বর	নেকটার
২২	চালকুমড়া	*Benincasa hispida*	Cucurbitaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
২৩	পালং শাক	*Beta palanga*	Chenop-odiaceae	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	নেকটার
২৪	বড় কুকশিম	*Blumea lacera*	Asteraceae	মার্চ	পরাগরেণু
২৫	শিমুল	*Bambax ceiba* L	Bombacaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
২৬	তাল	*Borassus flabellifer* L	Arecaceae	মার্চ	নেকটার ও রস
২৭	তোরি, সরিষা	*Brassica campestris* L	Brassicaceae	নভেম্বর-জানুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
২৮	রাই সরিষা	*Brassica juncea* L	Brassicaceae	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
২৯	মধী সরিষা	*Brassica napus* L	Brassicaceae	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	নেকটার
৩০	ফুলকপি	*Brassica oleracea* L var *botrytis*	Brassicaceae	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
৩১	শালগম	*Brassica rapa* L	Brassicaceae	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	নেকটার
৩২	পলাশ	*Butea monosperma*	Fabaceae	মার্চ	নেকটার
৩৩	অড়হর	*Cajanus cajan*	Fabaceae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	নেকটার
৩৪	আকন্দ	*Calotropis procera*	Asclepia-daceae	মার্চ	নেকটার
৩৫	বেত, হাঁচি বেত	*Calamus rotung* L.	Arecaceae	জুন	নেকটার
৩৬	পেঁপে	*Carica papaya* L	Caricaceae	সারা বছর	নেকটার
৩৭	করমচা	*Carissa congesta*	Apocynaceae	মার্চ	নেকটার
৩৮	সোনালু, বঁদর লাঠি	*Cassia fistula* L	Caesalpiniaceae	মে	পরাগরেণু
৩৯	নয়নতারা	*Catharanthus roseus* L	Apocynaceae	জুন–আগস্ট	নেকটার
৪০	বথুয়া শাক	*Chenopodiun album* L	Chaopodiacee	ফেব্রুয়ারি	নেকটার
৪১	চানা, বুট, ছোলা	*Cicer arietinum* L.	Fabaceae	মার্চ	নেকটার
৪২	তরমুজ	*Citrullus lanatus*	Cucurbitaceae	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	নেকটার
৪৩	বাতাবি লেবু, জাম্বুরা	*Citrus grandis* L	Rutaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
৪৪	লেবু	*Citrus medica* L.	Rutaceae	মার্চ–জুন	নেকটার
৪৫	কমলা লেবু	*Citrus sinensis* L	Rutaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৪৬	মুর্তা, শীতল পাটি, পাটি পাতা	*Clinogyne dichotoma*	Maranaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
৪৭	নারিকেল	*Cocos nucifera* L	Arecaceae	সারা বছর	নেকটার ও পরাগরেণু
৪৮	পাতা বাহার	*Codieum variegatum*	Euphorbiaceae	জুন	নেকটার ও পরাগরেণু
৪৯	ধনিয়া	*Coriandrum sativum L.*	Apiaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
৫০	বড় কানুর	*Crinum asiaticun* L	Awaryllidaceae	জুন–জুলাই	নেকটার ও পরাগরেণু
৫১	সুকান্দা রসুন	*Crinum latifolium* L	Amaryllidaceae	জুন–জুলাই	পরাগরেণু
৫২	বন মরিচ	*Croton bonpolandianum*	Euphorbiaceae	মে–জুন	পরাগরেণু
৫৩	বাঙ্গি, ফুটি	*Cucumis melo* L	Cucurbitaceae	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	নেকটার
৫৪	শশা, খীরা	*Cucumis sativus* L	Cucurbitaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৫৫	মিষ্টি কুমড়া	*Cucurbita maxima*	Cucurbitaceae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	নেকটার ও পরাগরেণু
৫৬	শিশু	*Dalbergia sisoo*	Fabaceae	আগস্ট–সেপ্টেম্বর	পরাগরেণু
৫৭	কেশরাজ	*Eclipta alba* L	Asteraceae	জুন–জুলাই	পরাগরেণু
৫৮	ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus globulus*	Myrtaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৫৯	আয়াপান	*Eupatorium ayapana*	Asteraceae	ডিসেম্বর	পরাগরেণু
৬০	আসাম লতা	*Eupatorium odoratum* L	Asteraceae	ডিসেম্বর	পরাগরেণু
৬১	লাল–পাতা	*Euphorbia pulcherrima*	Euphorbiaceae	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	নেকটার
৬২	গন্ধরাজ	*Gardenia jasminoides* Ellis	Rubiaceae	জুন–জুলাই	পরাগরেণু
৬৩	দাঁত মাজন, আশশাল	*Glycosmis pentaphylla*	Rutaceae	জানুয়ারি–জুলাই	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
৬৪	তুলা, কার্পাস তুলা	*Gossypium harbaceum* L	Malvaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৬৫		*Gravillea robusta*	Proteaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৬৬	সূর্যমুখী	*Helianthus annuus* L	Asteraceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
৬৭	মেস্তা, মেস্তা পাট	*Hibiscus cannabinus*	Malvaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৬৮	ভোলা	*Hibiscus tilliaceus* L	Malvaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
৬৯	যব	*Hordeum vulgare* L	Gramineae	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
৭০	বন কলমি, ঢোল কলমি	*Ipomoea fistulosa*	Convolulaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
৭১	কলমি, কলমি লতা	*Ipomoea aquatica*	Convolulaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
৭২	লাল বেন্না, লাল ভেরেণ্ডা	*Jatropha gossypifolia* L	Euphorbiacae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	পরাগরেণু
৭৩	লাউ	*Lageneria siceraria*	Cucurbitaceae	সারা বছর	পরাগরেণু
৭৪	খেসারি	*Lathyrus sativus* L	Fabaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৭৫	রক্তদ্রোণ	*Leonurus sibiricus* L	Lamiaceae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	নেকটার
৭৬	শ্বেতদ্রোণ, দণ্ডকলস	*Leucas lavendulifolia*	Lamiaceae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	নেকটার
৭৭	তিসি, তিল	*Linum usitatissimum* L	Linaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
৭৮	ভূঁইওকরা	*Lippia alba*	Verbenaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
৭৯	লিচু	*Litchi chinensis*	Sapindaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার ও পরাগরেণু
৮০	—	*Loranthus philippensis*	Loranthaceae	ডিসেম্বর–জানুয়ারি	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
৮১	ধুন্দল, পারুল	*Luffa Cylindrica* L	Cucurbitaceae	নভেম্বর–ডিসেম্বর	পরাগরেণু
৮২	ঝিঙা	*Luffa acutangula L*	Cucurbitaceae	জুলাই–আগস্ট	পরাগরেণু
৮৩	আম	Mangifera indica L	Anacardiaceae	ফেব্রুয়ারি- মার্চ	নেকটার
৮৪	নাগেশ্বর	*Mesua nagassarium*	Guttiferae	মে–জুন	নেকটার ও পরাগরেণু
৮৫	আসাম লতা, তরুলতা	*Mikania cordata*	Asteraceae	নভেম্বর–জানুয়ারি	পরাগরেণু
৮৬	পিছলি	*Microcos paniculata* L	Tiliaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
৮৭	লজ্জাবতী	*Mimosa pudica* L	Mimosaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
৮৮	বকুল	*Mimusops elengi* L	Sapindanceae	মে–জুন	নেকটার ও পরাগরেণু
৮৯	কাঁকরোল	*Momordica cochinchinensis*	Cucurbitaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৯০	সাজনা, সজিনা	*Moringa oleifera*	Moringaceae	অক্টোবর–ফেব্রুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
৯১	কামিনী	Murraya *paniculata*	Rutaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৯২	কাচকলা	*Musa paradisiaca*	Musaceae	সারা বছর	নেকটার ও পরাগরেণু
৯৩	কলা	*Musa sapientum* L	Musaceae	সারা বছর	নেকটার ও পরাগরেণু
৯৪	পদ্ম	*Nelumbo nucifera*	Nymphaeaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৯৫	রক্তকরবী	*Nerium indicum*	Apocynaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৯৬	তামাক	*Nicotiana tabacum* L	Solanaceae	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	নেকটার
৯৭	বন তুলসী	*Ocimum basilicum* L	Lamiaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
৯৮	তুলসী	*Ocimum sanctum* L	Lamiaceae	মার্চ	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
৯৯	কেয়া	*Pandanus odoratissimus* L	Pandanaceae	জুন–জুলাই	পরাগরেণু
১০০	ঝুমকোলতা	*Passiflora foetida* L	Passifloraceae	জুন–জুলাই	নেকটার ও পরাগরেণু
১০১	খেজুর	*Phoenix sylvestris* L	Arecaceae	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	পরাগরেণু
১০২	—	*Phragmites karka*	Poaceae	মার্চ–এপ্রিল	পরাগরেণু
১০৩	আমলকী	*Phyllanthus* embelica L	Euphorbiaceae		নেকটার
১০৪	বিষকাটালি	*Polygonum hydropiper* L	Polygonaceae	এপ্রিল–জুলাই	নেকটার
১০৫	বিষকাটালি	*Polygonum orientale* L.	Polygonaceae	মার্চ–জুন	নেকটার
১০৬	করঞ্জা, করমচা	*Pongania pinnata* L	Fabaceae	মার্চ	নেকটার ও পরাগরেণু
১০৭	পেয়ারা	*Psidium guajava* L	Myrtaceae	জুন–সেপ্টেম্বর	নেকটার
১০৮	ডালিম	*Punica granatum* L	Punicaceae	নভেম্বর–মার্চ	নেকটার
১০৯	বন মূলা	*Raphanus raphiastum* L	Brassicaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
১১০	মূলা	*Raphanus sativus* L	Brassicaceae	ফেব্রুয়ারি–মার্চ	নেকটার
১১১	আখ	*Saccharum offcinarum* L	Poaceae	ফেব্রুয়ারি	পরাগরেণু
১১২	—	*Salvia coccinea* L	Lamiaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
১১৩	মেঘনিস	*Samanea saman*	Mimozaceae	জুন–জুলাই	নেকটার ও পরাগরেণু
১১৪	বন ধনিয়া	*Scoparia dulcis* L	Scropha-lariaceae	জুন–জুলাই	নেকটার ও পরাগরেণু
১১৫	তিল, তিসি	*Sesamum indicum* L	Pedaliaceae	সেপ্টেম্বর–জানুয়ারি	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
১১৬	শাল, গজারি	*Shorea robusta*	Dipterocar-paceae	ফেব্রুয়ারি–এপ্রিল	পরাগরেণু
১১৭	বেগুন	*Solanum melongena*	Solanaceae	নভেম্বর–মার্চ	নেকটার
১১৮	আমড়া	*Spondias dulcis*	Anacardiaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
১১৯	দেশী আমড়া	*Spondias pinnata*	Anacardiaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
১২০	কালজাম	*Syzygium cumini*	Myrtaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার
১২১	ক্ষুদি জাম	*Syzygium fruticosum*	Myrtaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার ও পরাগরেণু
১২২	গোলাপ জাম	*Syzygium jambos*	Myrtaceae	মার্চ–এপ্রিল	নেকটার ও পরাগরেণু
১২৩	টগর	*Tabernaemon- tana divaricata*	Apocynaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
১২৪	গাঁদা	*Tagetes patula* L	Asteraceae	নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি	পরাগরেণু
১২৫	তেঁতুল	*Tamarindus indica* L	Caesepiniaceae	এপ্রিল–জুন	নেকটার
১২৬	সেগুন	*Tectona grandis*	Verbenaceae	জুলাই–আগস্ট	নেকটার ও পরাগরেণু
১২৭	অর্জুন	*Terminalia arjuna*	Combretaceae	ডিসেম্বর–জুন	পরাগরেণু
১২৮	বহেড়া	*Terminalia belerica*	Combretaceae	ডিসেম্বর–জুন	পরাগরেণু
১২৯	হরিতকি	*Terminalia chebula*	Combretaceae	ডিসেম্বর–জুন	পরাগরেণু
১৩০	হলুদ করবী	*Thevetia peruviana*	Apocynaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
১৩১	চিচিঙ্গা	*Trichosanthe-s cucumerina* L var *anguina*	Cucurbitaceae	জুন–জুলাই	পরাগরেণু

ক্রমিক সংখ্যা	ফুলের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র	দর্শনকাল	আহরিত বস্তু
১৩২	ত্রিধারা, ত্রিদক্ষ	*Tridax procumbens* L	Asteraceae	ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারি	পরাগরেণু
১৩৩	গম	*Triticum aestivum* L	Poaceae	জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি	নেকটার
১৩৪	বন ওকরা	*Triumfetta rhomboidea*	Tiliaceae	মার্চ	নেকটার
১৩৫	কুকশিম	*Vernonia patula*	Asteraceae	মার্চ	পরাগরেণু
১৩৬	নিশিন্দা	*Vitex negundo* L	Verbenaceae	ডিসেম্বর	নেকটার
১৩৭	ভুট্টা	*Zea mays* L	Poaceae	নভেম্বর–জানুয়ারি	নেকটার ও পরাগরেণু
১৩৮	আদা	*Zingiber officinale*	Zingiberaceae	জুন–জুলাই	নেকটার
১৩৯	কুল বড়ই	*Zizyphus mauritiana*	Rhamnaceae	সেপ্টেম্বর–নভেম্বর	নেকটার
১৪০	জংলী কুল	*Zizyphus oenoplea* L	Rhamnaceae	অক্টোবর–নভেম্বর	নেকটার

সূত্র : Hossain ও Sharif (1993)।

সারণি ২৩.৩ : রাজশাহী বিভাগের মৌ-উদ্ভিদের তালিকা (বিসিক রাজশাহী)

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ফুল ফোটার শুরু	ফুল ফোটার শেষ	খাদ্যের উৎস
১	জারুল	*Lagerstroemina speciosa*	বৈশাখ	আষাঢ়	পরাগ
২	ঢেড়স	*Abelmoshus esculentus*	বৈশাখ	শ্রাবণ	পরাগ
৩	মাধবী লতা	*Hiptage bengha-lensis*	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	পরাগ ও নেকটার
৪	কদম	*Anthocephalus cadamba*	আষাঢ়	শ্রাবণ	নেকটার
৫	শাপলা	*Nymphaea nouchali*	আষাঢ়	আশ্বিন	পরাগ ও নেকটার
৬	বাবলা	*Acacia arabica*	শ্রাবণ	ভাদ্র	পরাগ
৭	কড়ই	*Albizzia procera*	ভাদ্র	আশ্বিন	নেকটার
৮	কাশ	*Saccharum spontaneum*	ভাদ্র	আশ্বিন	নেকটার
৯	কেওড়া	*Sonneratia apetala*	ভাদ্র	আশ্বিন	নেকটার
১০	বরই	*Zizyphus jujuba*	আশ্বিন	আশ্বিন	নেকটার
১১	তোকমা	*Hyptis suaveolens*	আশ্বিন	আশ্বিন	নেকটার
১২	বন ওকরা	*Triumfetta batramia*	আশ্বিন	আশ্বিন	পরাগ
১৩	সরিষা	*Brassica napus*	অগ্রহায়ণ	পৌষ	পরাগ ও নেকটার
১৪	ফুলকুঁড়ি	*Eupatorium odoratum*	অগ্রহায়ণ	পৌষ	নেকটার
১৫	ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus citriodora*	অগ্রহায়ণ	মাঘ	নেকটার
১৬	ক্যালিয়া	*Oxytenanthera nigrociliata*	অগ্রহায়ণ-পৌষ	মাঘ	পরাগ

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ফুল ফোটার শুরু	ফুল ফোটার শেষ	খাদ্যের উৎস
১৭	পালং শাক	*Spinacea oleracea*	পৌষ	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
১৮	টমেটো	*Lycopersicon lycopersicum*	পৌষ	চৈত্র	পরাগ
১৯	দণ্ডকলস, রক্তদ্রোণ	*Leonurus sibiricus*	বছরের প্রায় সবসময় ফোটে	সারা বছর	নেকটার
২০	ছোলা	*Cicer arietinum*	মাঘ	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
২১	শিমুল	*Salmalia malabaricum*	মাঘ	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
২২	সাজনা	*Moringa pterygosperma*	মাঘ	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
২৩	মৌরী	*Foeniculum vulgare*	মাঘ	চৈত্র	পরাগ
২৪	খইয়া বাবলা	*Acacia catechu*	মাঘ	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
২৫	মটর শুঁটি	*Pisum sativum*	মাঘ	ফাল্গুন	নেকটার
২৬	জাস্টিশিয়ান	*Justicia* sp.	মাঘ	ফাল্গুন	নেকটার
২৭	বনঝাল	*Croton bonpmandianum*	ফাল্গুন	শ্রাবণ	পরাগ
২৮	মনকাটা	*Randia spinosa*	ঐ	ফাল্গুন	পরাগ
২৯	তেলিকদম	*Leucaena leucocephala*	ক) ফাল্গুন খ) আষাঢ়	ক) চৈত্র খ) শ্রাবণ	পরাগ
৩০	বাতাবী লেবু	*Citrus grandis*	ফাল্গুন	চৈত্র	পরাগ ও নেকটার
৩১	আমঝুম	*Aphania danura*	ফাল্গুন	ফাল্গুন	পরাগ
৩২	উড়িআম	*Bouea burmanica*	ফাল্গুন	ফাল্গুন	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ফুল ফোটার শুরু	ফুল ফোটার শেষ	খাদ্যের উৎস
৩৩	জিগা	*Lannea grandis*	ফাল্গুন	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
৩৪	ডালিম	*Punica granatum*	ফাল্গুন	ফাল্গুন	পরাগ
৩৫	লিচু	*Syzygium samarangense*	ক) ফাল্গুন খ) চৈত্র	ক) চৈত্র খ) বৈশাখ	নেকটার
৩৬	বুনো আমড়া	*Spondias mangifera*	ফাল্গুন	ফাল্গুন	পরাগ ও নেকটার
৩৭	পাহাড়ি নিম (খোড়া নিম)	*Melia ajadirachta*	ফাল্গুন	চৈত্র	নেকটার
৩৮	লেবু	*Citrus medica*	ফাল্গুন	চৈত্র	পরাগ ও নেকটার
৩৯	আমড়া	*Spondias dulcis*	ফাল্গুন	চৈত্র	পরাগ ও নেকটার
৪০	আশফল, দাঁত মাজন (দাঁতন)	*Glycosmis pentaphylla*	ফাল্গুন	চৈত্র	পরাগ ও নেকটার
৪১	মেহেদী	*Lawsonia alba*	ফাল্গুন	চৈত্র	নেকটার
৪২	পেয়ারা	*Psidium guajava*	ফাল্গুন	চৈত্র	পরাগ ও নেকটার
৪৩	লালকচা (বিলাতী কচা)	—	ফাল্গুন	চৈত্র	নেকটার
৪৪	গোলাপ	*Rosa centifolia*	ফাল্গুন	বৈশাখ	পরাগ
৪৫	শিশু	*Dalbergia sixsoo*	চৈত্র	চৈত্র	নেকটার
৪৬	আকন্দ	*Calotropis procera*	ফাল্গুন	চৈত্র	নেকটার
৪৭	শিরিষ	*Albizia lebbeck*	চৈত্র-বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	নেকটার

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্ভিদের নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	ফুল ফোটার শুরু	ফুল ফোটার শেষ	খাদ্যের উৎস
৪৮	ছোট জাম	*Antidesma* ghasemblla	চৈত্র	বৈশাখ	নেকটার
৪৯	কেওড়া	*Streblus asper*	চৈত্র	বৈশাখ	নেকটার
৫০	হরিতকি	*Terminalia chebula*	চৈত্র	বৈশাখ	পরাগ ও নেকটার
৫১	খাদা কঁচা	—	চৈত্র	বৈশাখ	নেকটার
৫২	নারকেল	*Coccos nucifera*	সব সময়	সব সময়	পরাগ
৫৩	লাউ	*Lageneria siceraria*	সব সময়	সব সময়	নেকটার

পরিশিষ্ট ১

মৌমাছির জন্য ক্ষতিকর কীটনাশক/রাসায়নিক পদার্থের তালিকা

মৌমাছির জন্যে মাঝারি ধরনের বিষাক্ত (Moderately Toxic) রাসায়নিক পদার্থের তালিকা (অপরাহ্নে অথবা যখন মৌমাছি ভ্রমণ করে না এমন সময় ব্যবহার্য)*

১. ২, ৩, ৬, টিবিএ (2, 3, 6 TBA)

২. অ্যাসিডো জিবারেলিকো (Acido Gibberellico)

৩. অ্যাসিডো জিবারেলিকো জিএ ৪ + জিএ ৭ (Acido Gobberellico GA4 + GA7)

৪. এসিফ্লুরফেন সোডিয়াম (Acifluorfen Sodium)

৫. অ্যালাক্লোর (Alaclor)

৬. অ্যালোসিফপ – ইটোসিয়েটাইল

৭. অ্যানিলাজিনা (Anilazina)

৮. আটাজিনা (Atrazina)

৯. অ্যাজোসিক্লোটিন (Azocielotin)

১০. ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস (Bacillus Thuringensis)

১১. বারবান (Barban)

১২. বেনফ্লুরালিন (Benfluralin)

১৩. বেনোমিল (Benomil)

১৪. বেনটাজোন (Bentazone)

১৫. বেনজোসিমেটো (Benzossimato)

১৬. ব্রোমাসাইল (Bromacile)

১৭. ব্রোমোফেনোসিমা (Bromofenossima)

১৮. ব্রোমোপ্রোপিলেটো (Bromopropilato)

১৯. বুপাইরিমেট (Bupirimate)

২০. বুটিলেট (Butilate)

২১. ক্যাপ্টাফল (Captafol)

২২. ক্যাপ্টানো (Captano)

২৩. কার্বেন্ডাজিম (Carbendazim)

২৪. কার্বোসিনা (Carbossina)

২৫. কাইনোমেটিওনাটো (Chinometionato)

২৬. সিয়ানাজিনা (Cianazina)

২৭. সিয়েক্সাটিন (Ciexatin)

২৮. ক্লোফেনটেজিন (Clofentezine)

২৯. ক্লোপিরালিড (Clopiralid)

৩০. ক্লোরবেনসাইড (Clorbenside)

৩১. ক্লোরডাইমেফর্ম (Clordimeform)

৩২. ক্লোরফেনেটল (Clorfenetol)

৩৩. ক্লোরফেনসন (Clorfenson)
৩৪. ক্লোরফেনসালফাইড (Clorfensulfide)
৩৫. ক্লোরফ্লুরেনল (Clorflurenol)
৩৬. ক্লোরমেকুয়াট (Clormequat)
৩৭. ক্লোরোবেনজিলাটো (Clorobenzilato)
৩৮. ক্লোরোপ্রোপাইলাটো (Cloropropilato)
৩৯. ক্লোরোটালোনিল (Clorotalonil)
৪০. ক্লোরোজুরন (Cloroxuron)
৪১. ক্লোরপ্রোফাম (Clorprofam)
৪২. ক্লোরটাল-ডাইমিটাইল (Clortal-Dimetile)
৪৩. ক্লোরটলুরন (Clortoluron)
৪৪. ডেজোমেট (Dazomet)
৪৫. ডেসমেডিফাম (Desmedifam)
৪৬. ডেসমেট্রিনা (Desmetrina)
৪৭. ডাক্লোবেনিল (Diclobenil)
৪৮. ডাইক্লোফপ-মিটাইল (Diclofopmetile)
৪৯. ডাইক্লোন (Diclone)
৫০. ডাইক্লোরপ্রোপ (Diclorprop)
৫১. ডাইকোফল (Dicofol)
৫২. ডায়েনোক্লোর (Dienoclor)
৫৩. ডাইফেনামাইড (Difenamide)
৫৪. ডাইফেনজোকুয়াট (Difenzoquat)
৫৫. ডাইফ্লুবেনজুরন (Diflubenzuron)
৫৬. ডাইমেটিরিমল (Dimetirimol)
৫৭. ডাইনোকেপ (Dinocap)
৫৮. ডাইকুয়াট (Diquat)
৫৯. ডাইউরন (Diuron)
৬০. ডোডেমরফ (Dodemorf)
৬১. ডোডিনা (Dodina)
৬২. এডিফেনফস (Edifenfos)
৬৩. ইটাসিলাসিল (Etaceiasil)
৬৪. ইটেফন (Etefon)
৬৫. এটিডাইমিউরন (Etidimuron)
৬৬. এটিরাইমল (Etirimol)
৬৭. ফেনামিনোসাল্ফ (Fenaminosulf)
৬৮. ফেনারিমল (Fenarimol)
৬৯. ফেনাযাফ্লর (Fenazaflor)
৭০. ফেনবুটাটিন ওসিডো (Fenbutatin ossido)
৭১. ফেনক্লোরিম (Fenclorim)
৭২. ফেনমেডিফাম (Fenmedifam)
৭৩. ফেনপ্রোপিমরফ (Fenpropimorf)
৭৪. ফেনসন (Fenson)
৭৫. ফেনটিন এসিটাটো (Fentin Acetato)
৭৬. ফেনটিন ইড্রোসিডো (Fentin Idrossido)
৭৭. ফেরবাম (Ferbam)
৭৮. ফ্লুএজিফপ-পি-বিউটাইল (Fluazifop-p-Butile)
৭৯. ফ্লুবেনজিমিন (Flubenzimin)
৮০. ফ্লুরোক্লোরিডন (Fluorocloridone)

৮১. ফ্লুরোডাইফেন (Fluorodifen)

৮২. ফ্লুসিলিকেটো ডাই বারিও (Fluosilicato di Bario)

৮৩. ফ্লুরেনল (Flurenol)

৮৪. ফ্লুভালিনেট (Fluvalinate)

৮৫. ফলপেট (Folpet)

৮৬. গ্লিফোসেট (Glifosate)

৮৭. ইড্রাজাইড মালেইকা (Idrazide Maleica)

৮৮. ইমাজামেটাবেঞ্জ (Imazametabenz)

৮৯. আইওক্সিনিল (Ioxinil)

৯০. আইপ্রোডাইওন (Iprodione)

৯১. আইসোপ্রোপালিন (Isopropalin)

৯২. আইসোজাবেন (Isoxaben)

৯৩. লিনিউরন (Linuron)

৯৪. মানকোজেব (Mancozeb)

৯৫. মানেব (Maneb)

৯৬. এমসিপিবি (MCPB)

৯৭. মেটালক্সিল (Metalaxil)

৯৮. মেটামাইট্রন (Metamitron)

৯৯. মেটাম-সোডিয়াম (Metam-Sodium)

১০০. মেটিরাম (Metiram)

১০১. মেটোব্রোমিউরন (Metobromuron)

১০২. মেটোলাক্লোর (Metolaclor)

১০৩. মেটোক্সুরন (Metoxuron)

১০৪. মেট্রিবুজিন (Metribuzin)

১০৫. মলিনেট (Molinate)

১০৬. নাবাম (Nabam)

১০৭. ন্যাপ্রোপামাইড (Napropamide)

১০৮. ন্যাপটালম (Naptalam)

১০৯. নিকোটিনা (Nicotina)

১১০. ওসিকার্বোসিনা (Ossicarbossina)

১১১. অক্সাডিক্সিল (Oxadixil)

১১২. অক্সিফ্লুরোফেন (Oxifluorofen)

১১৩. পেনকোনাজোলে (Penconazolo)

১১৪. পেনডিমেটালিন (Pendimetalin)

১১৫. পাইক্লোরান (Picloran)

১১৬. পাইরিট্রাইন (Piretrine)

১১৭. পাইরিডেট (Piridate)

১১৮. পলিসোলফিউরো ডাই বারিও (Polisolfuro Di Bario)

১১৯. পলিসোলফিউরো ডাই কালসিও (Polisolfuro Di Calcio)

১২০. প্রোফাম (Profam)

১২১. প্রোমেট্রিনা (Prometrina)

১২২. প্রোপাক্লোর (Propaclor)

১২৩. প্রোপামোকার্ব (Propamocarb)

১২৪. প্রোপারজাইট (Propargite)

১২৫. প্রোপিকোনাজোলো (Propiconazolo)

১২৬. প্রোপিনেব (Propineb)

১২৭. প্রোপিজামাইড (Propizamide)

১২৮. রেমী (Rame)

১২৯. সেকবুমেটন (Secbumeton)
১৩০. সেটোসিডিম (Setossidim)
১৩১. সিমাজিনা (Simazina)
১৩২. টিসিএ সোডিয়াম (TCA Sodium)
১৩৩. টারবুমেটন (Terbumeton)
১৩৪. টারবুটিনা (Terbutrina)
১৩৫. টেট্রাডাইফন (Tetradifon)
১৩৬. টিয়াজাফ্লুরন (Tiazafluron)
১৩৭. টিরাম (Tirum)
১৩৮. ট্রাইঅ্যাডিমেফন (Triadimefon)
১৩৯. ট্রাইক্লোপির (Triclopir)
১৪০. ট্রাইফ্লুরালিন (Trifluralin)
১৪১. ট্রাইফোরিন (Triforine)
১৪২. ভিনক্লোজোলিন (Vinclozolin)
১৪৩. জিনেব (Zineb)
১৪৪. জোলফো (Zolfo)

---

* Roubik, 1995

মাঝারি ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের তালিকা (রাতে ব্যবহার্য)*

১. ২, ৪, ৫ – টি (2, 4, 5 - T)
২. ২, ৪, – ডি (2, 4 - D)
৩. ২, ৪, - ডিবি (2, 4 - DB)
৪. আমেট্রিনা (Ametrina)
৫. অ্যামিট্রাজ (Amitraz)
৬. অ্যামিট্রল (Amitrol)
৭. আরমাইট (Aramite)
৮. বিনাপাক্রিল (Binapacril)
৯. ব্রোমোক্সিনিল (Bromoxinil)
১০. ক্যানফেক্লোরো (Canfecloro)
১১. কারটাপ (Cartap)
১২. ক্লোরামবেন (Cloramben)
১৩. ক্লোরডানো (Clordano)
১৪. ক্লোরফেনভিনফস (Clorfenvinfos)
১৫. কৌমাফস (Coumafos)
১৬. ডালাপন সোডিয়াম (Dalapon Sodium)
১৭. ডিডিডি (DDD)
১৮. ডিডিটি (DDT)
১৯. ডেমিটন মিটাইল (Demeton metile)
২০. ডায়ালিফস (Dialifos)
২১. ডিকাম্বা (Dicamba)
২২. ডাইক্লোরান (Dicloran)
২৩. ডাইমেটিলান (Dimetilan)
২৪. ডাইনোবিউটন (Dinobuton)
২৫. ডাইঅক্সাটিয়ন (Dioxation)
২৬. ডাইসালফেটন (Disulfoton)

২৭. ডিটামিলফস (Ditamilfos)
২৮. ডিটিয়ানন (Ditianon)
২৯. এন্ডোসালফান (Endosulfan)
৩০. এন্ডোটাল (Endotal)
৩১. এন্ডোটিয়ন (Endotion)
৩২. এন্ড্রিন (Endrin)
৩৩. ইপিটিসি (EPTC)
৩৪. ইথিয়ন (Etion)
৩৫. ইটোফুমেসেট (Etofumesate)
৩৬. ইটোপ্রোফস (Etoprofos)
৩৭. এক্সিটিয়াযক্স (Exitiazox)
৩৮. ফেনক্লোরফস (Fenclorfos)
৩৯. ফ্লেমপ্রোপ মিটাইল (Flamprop-Metile)
৪০. ফ্লেমপ্রোপ-এম-আইসোপ্রোপাইল (Flamprop-M-Isopropile)
৪১. ফনোফস (Fonofos)
৪২. ফোরেট (Forate)
৪৩. ফরমেটানাটো (Formetanato)
৪৪. ফোসালোন (Fosalone)
৪৫. আইসোবর্নিল থিওসায়ানেটো (Isobornil Tiocianato)
৪৬. আইসোলোপ (Isolop)
৪৭. এম সি পি এ (MCPA)
৪৮. মেকোপ্রোপ (Mecoprop)
৪৯. মিনাজোন (Menazone)
৫০. মেটোসিক্লোরো (Metossicloro)
৫১. এমএনএফএ (MNFA)
৫২. ওলিও মিনারেল (Olio minerale)
৫৩. ওসিডেমিটন-মিটাইল (Ossidemeton-Metile)
৫৪. অক্সামিল (Oxamil)
৫৫. প্যারাকুয়াট (Paraquat)
৫৬. পারটেন (Pertane)
৫৭. পিরাজোফস (Pirazofos)
৫৮. পিরিমিকার্ব (Pirimicarb)
৫৯. প্রোফেনোফস (Profenofos)
৬০. প্রোপানিল (Propanil)
৬১. রটেনন (Rotenone)
৬২. স্রাদান (Schradan)
৬৩. সালফালেট (Sulfallate)
৬৪. টেমিফস (Temefos)
৬৫. টারবুফস (Terbufos)
৬৬. টিওডিকার্ব (Tiodicarb)
৬৭. টিওমিটন (Tiometon)
৬৮. টিওকুইনক্স (Tioquinox)
৬৯. ট্রানিড (Tranid)
৭০. ট্রাইক্লোরফন (Triclorfon)
৭১. ট্রাইক্লোরোনেটো (Tricloronato)
৭২. জিরাম (Ziram)
৭৩. জিরেব (Zireb)

---

* Roubik, 1995

মৌমাছির জন্যে খুবই বিষাক্ত (Highly toxic) রাসায়নিক পদার্থের তালিকা *

১. অ্যাসেফেট (Acefate)
২. অ্যালডিকার্ব (Aldicarb)
৩. অ্যালড্রিন (Aldrin)
৪. আলফাসাইপারমেট্রিনা (Alfacipermetrina)
৫. অ্যামাইনোকার্ব (Aminocarb)
৬. আরসেনিকো-ই-আরসেনিয়াটি (Arsenico-e-Arseniati)
৭. আজিনফস-ইটাইল (Azinfos-etile)
৮. আজিনফস-মিটাইল (Azinfos-metile)
৯. বেনডিওকার্ব (Bendiocarb)
১০. বিএইচসি (গামা-) (BHC, Gamma-)
১১. ব্রোমোফস (Bromofos)
১২. ব্রোমোফস-ইটাইল (Bromofos-etile)
১৩. বুটোকার্বোসিমা (Butocarbossima)
১৪. কার্বারিল (Carbaril)
১৫. কার্বোফেনোশন (Carbofenotion)
১৬. কার্বোফুরান (Carbofuran)
১৭. কার্বোসুলফান (Carbosulfan)
১৮. সিফলুট্রিন (Ciflutrin)
১৯. সাইপারমেট্রিনা (Cipermetrina)
২০. ক্লোরপাইরিফস (Clorpirifos)
২১. ক্লোরপাইরিফস মিটাইল (Cloropirifos metile)
২২. ডেল্টামেট্রিনা (Deltametrina)
২৩. ডেমিটন-এস-মিটাইল (Demeton-S-Metile)
২৪. ডেমিটন-এস-মিটাইলসফন (Demeton-S-Metilsolfone)
২৫. ডায়াজিনন (Diazinone)
২৬. ডাইক্লোরভস (Declorvos)
২৭. ডাইঅ্যালড্রিন (Dieldrin)
২৮. ডাইমেটোয়েটো (Dimetoato)
২৯. ডাইনোসেব (Dinoseb)
৩০. ডাইঅক্সাকার্ব (Dioxacarb)
৩১. ডিএনওসি (DNOC)
৩২. এপ্টাক্লোরো (Eptacloro)
৩৩. এপ্টেনোফস (Eptenofos)
৩৪. এটিওফ্যানকার্ব (Etiofencarb)
৩৫. ফেনামাইফস (Fenamifos)
৩৬. ফেনিট্রশন (Fenitrotion)
৩৭. ফেনক্সিকার্ব (Fenoxycarb)
৩৮. ফেনপ্রোপাট্রিন (Fenpropatrin)
৩৯. ফেনশন (Fention)
৪০. ফেনটোএটো (Fentoato)
৪১. ফেনভালেরেট (Fenvalerate)
৪২. ফ্লুসিট্রিনেট (Flucitrinate)
৪৩. ফরমোশন (Formotion)
৪৪. ফসফামিডন (Fosfamidone)

৪৫. ফসমেট (Fosmet)
৪৬. ফক্সিম (Foxim)
৪৭. গুয়াজাটিনা (Guazatina)
৪৮. আইসোবেনজান (Isobenzan)
৪৯. আইসোক্লোরশন (Isoclortion)
৫০. আইসোফেনফস (Isofenfos)
৫১. লিন্ডানো (Lindano)
৫২. ম্যালাশন (Malation)
৫৩. ম্যাটালডেইডি (Metaldeide)
৫৪. ম্যাটামাইডোফস (Metamidofos)
৫৫. মেটিডাশন (Metidation)
৫৬. মেটিল-ইটোএটো (Metil-Etoato)
৫৭. মেটিওকার্ব (Metiocarb)
৫৮. মেটোমিল (Metomil)
৫৯. মেভিনফস (Mevinfos)
৬০. মনোক্রোটোফস (Monocrotofos)
৬১. নালেড (Naled)
৬২. ওমেটোএটো (Ometoato)
৬৩. প্যারাটিওন (Paration)
৬৪. প্যারাটিওন-মিটাইল (Paration-metile)
৬৫. পারমেট্রিনা (Permetrina)
৬৬. পিরিডাফেনটিওন (Piridafention)
৬৭. পিরিমিফস মিটাইল (Pirimifos-Metile)
৬৮. প্রেটিলাক্লোর (Pretilaclor)
৬৯. প্রোপোক্সোর (Propoxur)
৭০. প্রোটোএটো (Protoato)
৭১. কুইনালফস (Quinalfos)
৭২. সালফোটেপ (Sulfotep)
৭৩. টিইপিপি (TEPP)
৭৪. টেট্রাক্লোরভিনফস (Tetraclorvinfos)
৭৫. টাইওনাজিন (Tionazin)
৭৬. ট্রাইএজোফস (Triazofos)
৭৭. ভামিডোটিওন (Vamidotion)

* Roubik, 1995

উপরে তিন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে যার অনেকগুলোই আমাদের দেশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতদ্‌বিষয়ে এটুকু বলা যায় যে, আমাদের দেশের বেশির ভাগ কৃষকই কীটনাশক কিংবা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের নিয়মাবলি ঠিকমত জানেন না। এজন্যে প্রায়ই শোনা যায় কীটনাশক নিয়ে নানা রকমের বিপত্তির কথা। তাই কীটনাশক এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ কৃষিকাজে ব্যবহারের পূর্বে তার সম্পর্কে সম্মকজ্ঞান থাকা প্রয়োজন যেন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যেই এর প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে, তা না হলে ঘটতে পারে বিরাট বিপর্যয়। বিশেষ করে কিছু নির্দোষ এবং লক্ষ্যহীন প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তার মধ্যে পলিনেটর গ্রুপও রয়েছে। আমাদের দেশের কৃষিবিদদের এ বিষয়ে করনীয় হচ্ছে কীটনাশক কিংবা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ

ব্যবহারের জন্যে একটি সহজবোধ্য পদ্ধতি কৃষকদের এবং অন্যান্য যারা এ বিষয়ে কাজ করেন তাদের শিখিয়ে দেওয়া। তবেই এরূপ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে কীটনাশক প্রয়োগ করা শস্যের ক্ষেতে পোকা ধরতে গিয়ে শত শত চড়ুই পাখি মারা পড়েছে। অনেক পতঙ্গ ভুক অন্যান্য পাখিও এরূপ অবস্থার শিকার। আর মৌমাছির অর্থাৎ পলিনেটরদের তো কথাই নেই। যেখানে ফুল আছে সেখানে ওরা আসবেই। তাই যথেচ্ছা রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করলে এদের বিনাশ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে আর সেটা মোটেও আমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে না।

ফুলের ক্ষেতে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করতে হলে নিচে উল্লেখিত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১. মৌ–বাক্স জমিতে থাকলে প্রয়োগের সময় তা সরিয়ে নিতে হবে ;

২. সাধারণ পলিনেটরদের জন্যে সন্ধ্যার পর রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করতে হবে ;

৩. বিষক্রিয়া যে কারণে ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া যেন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ;

৪. দীর্ঘমেয়াদী বিষ প্রয়োগ করা উচিত নয় ;

৫. রাসায়নিক বিষের স্থলে সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থা নিলে তা সবার জন্যেই ভালো ;

উপরোক্ত বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখলে আমাদের পরিবেশ তথা পরিবেশের সকল জীব নিশ্চিন্তে বসবাসের সুযোগ পাবে। সেখানে আমাদের পলিনেটর গ্রুপও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন ঘটবে যা পরিবেশ বিষয়ক গবেষণার মূল লক্ষ্য।

পরিশিষ্ট ২

বিভিন্ন দেশে মৌমাছির ব্যবহার

নিচে বর্ণিত স্ট্যাম্পগুলো বিভিন্ন দেশে মৌমাছি এবং পলিনেটর নিয়ে গবেষণার তথ্য বহন করে। শুধু তাই নয় এগুলো থেকে এও অনুমেয় যে তাদের মৌমাছির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন এবং কিভাবে এদের ব্যবহার হচ্ছে সেসব দেশে। এখানে স্ট্যাম্পগুলোর একটি আলোচনা করা হলো যা থেকে বাংলাদেশেও এ বিষয়ের উপর কি করা উচিত হবে তার একটি দিক নির্দেশনা তৈরি করা যাবে। এর পাশাপাশি মৌমাছি নিয়ে গবেষণার প্রতি এদেশের গবেষকদের মনে বিশেষ উৎসাহ যোগাবে এবং গুরুত্ব পাবে।

১. PRO JUVENTUTE

এটি ইতালির একটি স্ট্যাম্প। ১৯৫০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এখানে একটি চাকের উপর কর্মরত একটি কর্মী মৌমাছিকে দেখানো হয়েছে। এ স্ট্যাম্পটি দেখে বোঝা যায় সে দেশে মৌমাছি সম্পর্কে গবেষণা অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছিল।

২. MONGOLIA

এটি মঙ্গোলিয়ার একটি স্ট্যাম্প। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। এখানে *Apis mellifera* এর একটি রানিকে দেখানো হয়েছে। যদিও *A. mellifera* ইউরোপীয় প্রজাতি কিন্তু এর সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার জনগণের পরিচয় ঘটেছে অতি প্রাচীনকালেই।

৩. JUGOSLAVIJA

এটি যুগোশ্লাভিয়ার একটি স্ট্যাম্প। এখানে *Apis mellifera* এর একটি কর্মী মৌমাছিকে দেখানো হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মধুও উৎপাদন করে থাকে।

৪. REPUBLI QUE OF GUINEE

এটি গিনির একটি স্ট্যাম্প পটভূমি দেখে মনে হচ্ছে *Apis mellifera* এর একটি কর্মী ফুল থেকে নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করছে।

৫. ZAMBIA

এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ স্মারক স্ট্যাম্প যেটা ১৯৭২ সালে মৌমাছি সংরক্ষণের প্রচারণার উদ্দেশ্যে প্রকাশ হয়েছে।

৬. CUBA

চমৎকার একটি স্ট্যাম্প। এখানে মৌমাছির জীবনচক্র অতি পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। এ স্ট্যাম্পটি দেখলে কিউবাতে যে

মৌমাছি পালন হয় তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। স্ট্যাম্পের পটভূমিতে একটি মৌ-বাক্স যেখানে একটি কোম্ব দেখানো হয়েছে আর এক কোণায় ফুল গাছ দেখানো হয়েছে অর্থাৎ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে মৌমাছি পালনের উপর।

৭. MALAYSIA

এখানে একটি কোম্বে কর্মী মৌমাছিদের কর্মব্যস্ততা দেখানো হয়েছে। মৌমাছি খাদ্য (পরাগ এবং / নেকটার) সংগ্রহ করে এনে চাকে জমা করছে। প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে।

৮. JUGOSLAVIJA

এটি যুগোশ্লাভিয়ার একটি স্ট্যাম্প। এখানে মৌমাছির একটি কোম্বকে দেখানো হয়েছে। রেডক্রস দেখিয়ে মধুর ঔষধি গুণাগুণের কথা বোঝানো হয়েছে।

৯. RE-POBLIKA MALAGASY

এটি মালাগাছির একটি স্ট্যাম্প। মৌমাছির অর্থনৈতিক গুণের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। মৌমাছি পালন করলে পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. UNITED NATIONS

জাতিসংঘের স্ট্যাম্পটি এর বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে মৌমাছির অবদানের চমৎকার একটি মিল দেখিয়েছে। মৌমাছির চাকের কোম্বের প্রকোষ্ঠগুলোর ভেতর এক একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যেমন—খাদ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

১১. EUROPA

এ স্ট্যাম্পটি ইউরোপে মৌমাছি পালনের একটি পরিচিতি বহন করে। এখানে একটি চাকের কোম্বের ভিতরে যেভাবে নেকটার, পরাগ, বাচ্চা এবং মধু থাকে তা দেখানো হয়েছে।

১২. NORGE

এ স্ট্যাম্পটিতে নরওয়ের মৌমাছির পালনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছির পালনের জন্যে এভাবে অতি প্রাচীনকালে সেখানে বাসা তৈরি করা হতো এবং মধু উৎপাদন করা হতো। এ স্ট্যাম্পটি ১৮৬৪-১৯৬৪ এর মৌমাছি পালনের ইতিহাসই বহন করছে।

১৩. UNITED NATIONS

জাতিসংঘের এ স্ট্যাম্পটি ইউরোপের ইকোনমিক কমিশন-এর সৌজন্যে প্রকাশিত হয়। এটি মৌমাছির কোম্বের একটি নমুনা দেখিয়েছে যা মৌমাছির সংরক্ষণ এবং পালনের উপর গুরুত্ব বহন করে।

১৪. ARGENTINA

এটি আর্জেন্টিনার একটি স্ট্যাম্প। এটিতে মৌমাছির উপর তাদের ধারণার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. BELGISCH CONGO

কঙ্গোর স্ট্যাম্প এটি। এখানে মৌমাছির প্রতি এদের ভালোবাসার চমৎকার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। কোম্বের ভিতর বিভিন্ন ঐতিহ্যগত চিত্র তুলে ধরেছে এই স্ট্যাম্পটিতে।

১৬. POSTA ROMANA

এটি রুমানিয়া থেকে প্রকাশিত একটি স্ট্যাম্প। চমৎকার উপস্থাপন। একটি কর্মী মৌমাছি ফুল থেকে নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করছে, পেছনেই তার চাক দেখা যাচ্ছে।

১৭. MOCKBA

এটি রাশিয়ার একটি স্ট্যাম্প। চমৎকারভাবে এখানে দেখানো হয়েছে ফুল থেকে একটি কর্মী মৌমাছি যেভাবে পরাগ এবং নেকটার নিয়ে উড়ে চলে যায় সে দৃশ্য। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। পটভূমির কোম্ব দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মৌমাছিটি তার সংগৃহিত পরাগ এবং নেকটার সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে।

১৮. INDIA

ভারতে ১৯৮০ সালে যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয় সেসময় মৌমাছি পালনের উপর স্মারক ডাকটিকিট হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। এখানে মৌমাছির দুটো কর্মীকে দেখানো হয়েছে, যার একটি বাসায় খাদ্য বয়ে নিয়ে এসেছে আর একটি যাচ্ছে বাইরে খাদ্যের সন্ধানে।

১৯. POLSKA

এটি পোল্যান্ডের একটি স্ট্যাম্প। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে মৌমাছিরা ফুল থেকে নেকটার এবং/পরাগ সংগ্রহ করে। আর অদূরেই একটা কৃত্রিম বাসা দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ মৌমাছি পালনের একটি পূর্ণ চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। পোল্যান্ডের মৌমাছি পালনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সেখানের অনেক মানুষই মৌমাছি পালনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জানেন।

২০. JUGOSLAVIJA

এটি যুগোশ্লাভিয়ার একটি স্ট্যাম্প। ১৭৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। মৌমাছি সে দেশে যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পালন হতো তারই একটি চিত্র এ স্ট্যাম্পে পাওয়া যায়। এখনো এখানে মৌ-পদার্থ উৎপন্ন হচ্ছে।

২১. CESKOSLOVENSKO

এটি চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি স্ট্যাম্প। এখানে বিশ্বব্যাপী মৌমাছি পালনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে।

২২. LUXEMBOURG

এটি লুক্সেমবুর্গ থেকে প্রকাশিত একটি স্ট্যাম্প। একটি রানি মৌমাছি চাকের পর্যবেক্ষণ করছে।

২৩. MEXICO

স্ট্যাম্পটিতে মেক্সিকোতে মৌমাছি পালনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে মৌ-পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাণিজ্যিকভাবে মেক্সিকোতে মৌমাছি পালন হয় বলে এর থেকে সে দেশ আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

২৪. ROMINA

এটি রুমানিয়া থেকে প্রকাশিত একটি স্ট্যাম্প। মৌমাছি পালন এবং পরাগায়নের একটি চমৎকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২৫. ESPANA

এটি স্পেনের একটি স্ট্যাম্প। এখানে একটি রানি মৌমাছিকে চাকের উপর পর্যবেক্ষণরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

২৬. ROMINA

এটি রুমানিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এখানেও মৌমাছি পালন এবং পরাগায়নের চমৎকার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পেছনে রাখা মৌমাছির বাক্সের সারি দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে মৌমাছিরা ফুলে ফুলে ঘুরে নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করে।

২৭. REPUBLICA DOMINICANA

এখানে মৌমাছি পালনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক মধু উৎপাদন এবং তার বাণিজ্যিক বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিরাট পিপায় জমা মধু দেখানো হয়েছে যার পাশেই আছে মৌমাছির চাক এবং একটি কর্মী মৌমাছি নেকটার এবং পরাগ ফুল থেকে সংগ্রহ করছে। এটি ডোমিনিকান রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৮. BULGARIA

এ স্ট্যাম্পটি বুলগেরিয়ার। অতি প্রাচীন পদ্ধতির মৌমাছি পালনের একটি নিদর্শন বহন করে এ স্ট্যাম্পটি।

২৯. BULGARIA

এ স্ট্যাম্পটিতে বুলগেরিয়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের নিদর্শন রয়েছে। এখানে এ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছে।

৩০. ANGUILLA

এটি অ্যাঙ্গোলার একটি স্ট্যাম্প। এটিতে মৌমাছির প্রতি সে দেশের মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারের প্রমাণই বহন করছে। প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। মিনি মাউস ফুল নিয়ে যাচ্ছে, আর সে ফুলে মৌমাছির ঝাঁক পড়েছে।

৩১. MOGAMBIQUE

মোজাম্বিকে মৌমাছি পালন এবং পরাগায়নের একটি চমৎকার পরিচয় রয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে। চিত্রটি দেখে মনে হয় এরা মৌমাছির ব্যবস্থাপনাও করে থাকে পরাগায়ন করার উদ্দেশ্যে ও ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩২. TUNISIENNE

অতি প্রাচীনকালেও তিউনিশিয়াতে মৌমাছি পালনের প্রচলন ছিল এ চিত্রটি তাহাই প্রমাণ করে। পুরুষ মহিলা সবাই মিলে এ কাজ সে দেশে করতে দেখা যায়।

৩৩. BRASIL

মৌমাছির ব্যবস্থাপনা ব্রাজিলেও অতি পরিচিত একটি প্রযুক্তি। প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাজিল বর্তমানে বিপুল পরিমাণ মৌমাছি দিয়ে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিকারক একটি দেশ। শুধু তাই নয়, মৌ-পদার্থ রপ্তানি করে এরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করে থাকে।

৩৪. NEDERLAND

এটি নেদারল্যান্ডের একটি স্ট্যাম্প। এ ছবি থেকে এটাই বোঝা যায় এদেশের সাথে মৌমাছির পরিচয় কত পুরোনো। বর্তমানে নেদারল্যান্ড মৌমাছি পালনে অতি দক্ষ একটি দেশ।

৩৫. NOYTA

এ স্ট্যাম্পটিতে ভালুকের মধু চুরির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এখানে রাশিয়াতে প্রাচীনকালে মৌমাছি পালনের এক অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠেছে। স্ট্যাম্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ সালে।

৩৬. CESKOSLOVENSKO

মৌমাছি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণ অনেক পূর্বেই অবগত ছিল। অভিজ্ঞতা কম দিনের নয় তা চিত্র দেখেই বোঝা যায়। শিশুটি মৌমাছিদেরকে সরবত বা গুড়ের রস বানিয়ে দিয়েছে যা ফুলের অভাবের সময়ে মৌমাছির চাক টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্য করণীয় একটি কাজ।

৩৭. ESPANA

স্পেনে মৌমাছি পালন এবং তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এ স্ট্যাম্প থেকে বোঝা যায়। একটি মৌচাক থেকে একজন মহিলা মধু সংগ্রহ করছে।

৩৮. TUTANKHAMUN DISCOVERY

এ স্ট্যাম্পটিতে অন্যান্য প্রাণীর সাথে মৌমাছিকে দেখানো হয়েছে। এর থেকে সে দেশে মৌমাছির গুরুত্ব ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটি অতি প্রাচীন একটি চিত্র।

৩৯. ITALIANA

একটি রানি মৌমাছি চাকে ডিম পাড়ছে। সেখানে বাচ্চা প্রকোষ্ঠগুলোর পাশে মৌমাছির ভেষজ গুণাগুণের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে।

৪০. EGYPTE

মিশরের মৌমাছির পালনের ইতিহাস পৃথিবীতে অতি প্রাচীন। এ স্ট্যাম্পটিতে প্রাচীনকালে মিশরের মধু সংগ্রহের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশ হয় ১৯২৫ সালে। আজও মিশর মৌচাষে অনেক এগিয়ে আছে। সেখানের অর্থনীতিতে মৌ-চাষ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪১. POLSKA

পোল্যান্ডে বর্তমানকালেও মৌমাছি পালন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ছবিটিতে পোলেন্ডে প্রাচীনকালে মৌমাছির পালন সম্পর্কে দেখানো হয়েছে।

৪২. VATICANE

মৌমাছির বাসার কিয়দংশ দেখিয়ে ভ্যাটিকানে প্রকাশিত এ স্ট্যাম্পটি প্রমাণ করে সেখানে মৌমাছির পালনের বিষয়টি।

৪৩. CESKOSLOVENSKO

চেকোশ্লোভাকিয়ায় মৌমাছির প্রতি সেখানের মানুষের ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। জাপানের ওসাকায় এক্সপো '৭০ উপলক্ষে এটি প্রকাশিত করা হয়।

৪৪. MALTA

একটি মুদ্রার গায়ে মৌমাছির ছবিই প্রমাণ করে সেদেশে (মাল্টায়) মৌমাছি কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২ সালে।

৪৫. ROMANIA

মৌমাছি পালনের এক অপূর্ব চিত্র রয়েছে রুমানিয়ার এ স্ট্যাম্পটিতে। অতি প্রাচীনকালেই এখানে মৌমাছির পালন হতো। প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে।

৪৬. BELGIQUE-BELGIE

মৌমাছি পালনের প্রাচীন নিদর্শন ফুটে উঠেছে এ স্ট্যাম্পটিতে। বেলজিয়ামে প্রাচীনকালেও মৌমাছি পালন হতো। এ স্ট্যাম্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সালে।

৪৭. SUOMI-FINLAND

মৌমাছিকে অতি যত্নের সাথে প্রাচীনকাল থেকে লালন করেছে ফিনল্যান্ডবাসীরা। এ ছবিটি তাই প্রমাণ করে। প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে।

৪৮. MAGYR

মৌমাছির একটি কোম্ব দেখানো হয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে। একটি কর্মী মৌমাছি রানির প্রকোষ্ঠগুলোর পরিচর্যায় রত। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে।

৪৯. KOREA

মৌমাছির পরাগায়ন দেখানো হয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে। সাথে সাথে এর কোম্বও দেখানো হয়েছে। এর থেকে সেখানে মৌমাছি পালন এবং পরাগায়ন ক্রিয়ার কথা জানা যায়।

৫০. MAGYAR

অতি প্রাচীনকালে মৌমাছি পালনের নিদর্শন দেখানো হয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে।

৫১. BULGARIA

এ স্ট্যাম্পটিতে মৌমাছি পালনের একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি দেখানো হয়েছে বুলগেরিয়াতে।

৫২. POLSKA

পোল্যান্ডের এ স্ট্যাম্পটিতে ফুলে পরাগায়নের বিষয়টি দেখানো হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পোল্যান্ড মৌমাছি পালনে অত্যন্ত উন্নত। অতএব পরাগায়ন সম্পর্কে তাদের উন্নত ধারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

৫৩. ROMINA

রুমানিয়ার এ স্ট্যাম্পটিতে সূর্যমুখী ফুলে পরাগায়ন দেখানো হয়েছে। মৌমাছির একটি কর্মী পরাগ এবং নেকটার সংগ্রহ করছে।

৫৪. DPRK

কোরিয়াতে (উত্তর কোরিয়া) পরাগায়নরত একটি মৌমাছিকে দেখানো হয়েছে এ স্ট্যাম্পটিতে। প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। কোরিয়া মৌমাছি পালন যথেষ্ট উন্নত। এরা সবধরনের মৌ-পদার্থ উৎপন্ন করতে সক্ষম।

৫৫. FRANCE

Apis mellifera এর একটি কর্মী ফুল থেকে নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করছে যা পরাগায়নে গুরুত্ব বহন করে। প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে।

৫৬. CUBA

কিউবায় এ স্ট্যাম্পটিতে মৌমাছির একটি কর্মী দেখানো হয়েছে। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কিউবা মৌমাছি পালন থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

৫৭. DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

জার্মানির এ স্ট্যাম্পটিতে মৌমাছির ফুল থেকে নেকটার এবং পরাগ সংগ্রহ করার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। মৌমাছি পালনে জার্মান অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। এখানে

মৌমাছি ব্যবস্থাপনা, শস্য পরাগায়ন ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চমানের গবেষণা কর্ম হয়ে থাকে।

৫৮. ENGLAND

ইংল্যান্ডে পরাগায়নের এ দৃশ্যটি অনেক পুরোনো যা সেখানের পরাগায়নের প্রাচীন ইতিহাস বহন করছে। প্রকাশ হয় ১৯৬৩ সালে। মৌমাছির উপর গবেষণার ক্ষেত্রে এবং মৌ-পদার্থের উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ হল ইংল্যান্ড।

৫৯. ROMINA

রুমানিয়ার এ স্ট্যাম্পটিতে পরাগায়নের পরিষ্কার চিত্র রয়েছে। সূর্যমুখীতে একটি মৌমাছি বিচরণ করছে।

৬০. BANGLADESH

দেরিতে হলেও আমাদের দেশে মৌমাছির উপর একটি স্ট্যাম্প বের হয়েছে অন্যান্য কীটপতঙ্গের সাথে। এটি ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। যে মৌমাছিটিকে দেখানো হয়েছে সেটি হলো *Apis cerana indica*। এর সঙ্গে রয়েছে বোলতা, ঘাস ফড়িং, রেশম পোকা এবং আরও দুটি পাখি (পান কৌড়ি ও কানি বক)। এ স্ট্যাম্পটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের সূচনা অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা।

মৌমাছি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত এসব ডাকটিকিট একটি তথ্যই প্রকাশ করে তা হলো মৌমাছির প্রতি সেসব দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতি দেরিতে হলেও বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে ; সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মানের দিক থেকে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও শুরু হয়েছে এটাই বড় কথা। নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেলে দিনে দিনে এ বিষয়ের উন্নতি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরিশিষ্ট ৩

শব্দকোষ

স্বতন্ত্র মৌমাছি (Solitary bee) : যেসব মৌমাছি একাকী একটি মাত্র বাসায় থাকে এরাই স্বতন্ত্র মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছিরা বাসা বানায়, সেখানে খাদ্য জমা করে, ডিম পাড়ে এবং প্রকোষ্ঠটি পরে বন্ধ করে দেয়, ফলে সাধারণত অন্য কারোর সাথে এমনকি এদের সন্তানদের সাথেও দেখা হয় না।

অমৌমাছি (Non-honey bee) : যেসব মৌমাছি তাদের বাসায় মধু জমা রাখে না তারাই হলো অমৌমাছি।

অসামাজিক মৌমাছি (Non-social bee) : যেসব মৌমাছি সাধারণত সামাজিক নয় অর্থাৎ দলবেঁধে একটি কলোনিতে থাকে না এবং যাদের মধ্যে কাস্ট প্রথা (caste system) নেই এরাই অসামাজিক মৌমাছি।

বন্য মৌমাছি (Wild bee) : সাধারণত অসামাজিক মৌমাছিদেরকে বন্য মৌমাছি হিসেবে ধরা হয় যদিও কিছু কিছু সামাজিক মৌমাছিকেও বন্য মৌমাছি হিসেবে ধরা হয়, যেমন ভ্রমর (Bamble bee)।

ফাঁদ-বাসা (Trap nest) : বন্য মৌমাছিদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রকৃতিতে এদের বাসা তৈরির উদ্ভিদকে কেটে রাখা হয় যাতে সহজে এরা সেগুলোকে বাসা তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পারে। যার ফলে উত্তরোত্তর এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ফুলের উপঢৌকন (Floral reward) : ফুলে বিদ্যমান সব পদার্থই ফুলের উপঢৌকন, যেমন– পরাগ, নেকটার, সুগন্ধি ইত্যাদি।

পরাগায়ন (Pollination) : পুরুষ ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলে। পরাগায়ন কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক এ দুই উপায়েই হতে পারে।

কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা (Insect management) : যখন কোনো পতঙ্গকে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনের সময় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে ফসলের পরাগায়ন কিংবা অন্য কোনো কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা যায় তখন সে পতঙ্গটির ব্যবস্থাপনা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়।

খাদ্য সংগ্রহকারী ভ্রমণকারী (Forager) : যখন কোনো মৌমাছি তার বাসা থেকে বের হয়ে খাদ্য (যেমন, পরাগ/নেকটার) এবং নির্মাণ সামগ্রি (যেমন, রেজিন এবং প্রোপলিস)

সংগ্রহ করে বাসায় নিয়ে আসে এবং জমা করে, তাকে তখন ফোরেজার (forager) বলা হয়।

সামাজিক পতঙ্গ (social insect) : যেসব পতঙ্গ সমাজবদ্ধ হয়ে একটি দলে বাস করে তারাই সামাজিক পতঙ্গ (social insect), এদের মধ্যে সাধারণত কাস্ট প্রথা (caste system) থাকে।

কাস্ট প্রথা (Caste system) : কিছু মৌমাছি বিশেষ করে সামাজিক মৌমাছিদের মধ্যে কর্মীদের বয়স কিংবা দেহের আকারের উপর ভিত্তি করে কর্ম ভাগ হয়ে থাকে। ফলে পুরো কলোনিতে একটি সুন্দর কাজের পরিবেশ থাকে। এ ধরনের প্রথা বা নিয়মকে কাস্ট প্রথা (caste system) হিসেবে ধরা হয়।

কর্ম বণ্টন (Task allocation) : কিছু কিছু পতঙ্গে যেমন—সামাজিক মৌমাছিতে একটি নির্দিষ্ট কর্মীর জন্য একটি নির্দিষ্ট কাজ ঠিক হয় এদের বয়স কিংবা দেহের আকারের উপর ভিত্তি করে, এটাই হলো কর্ম বণ্টন (task allocation)। কাজ যখন দেহের আকারের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় তখন তাকে বলে আকারভিত্তিক কর্ম বণ্টন (size-linked Task allocation)। আর যখন বয়সের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় তখন তাকে বলা হয় বয়সভিত্তিক কর্ম বণ্টন (age-linked task allocation)। ভ্রমরে রয়েছে size-linked task allocation, আর *Apis* মৌমাছিতে রয়েছে age-linked task allocation।

মধু ছিনতাই (Nectar robbing) : অনেক সময় দেখা যায় মৌমাছিরা একটি ফুলের খোলা সম্মুখের অংশ দিয়ে না ঢুকে দলের টিউবের গোড়া ছিদ্র করে সেখান থেকে নেকটার সংগ্রহ করে নেয়, যার জন্যে সে ফুলে পরাগায়ন ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। এ ধরনের নেকটার সংগ্রহকে মধু ছিনতাই (nectar robbing) বলা হয়।

পরাগ ছিনতাই (Pollen robbing) : কোনো কোনো মৌমাছি পরাগায়ন না ঘটিয়েও পরাগ সংগ্রহ করে থাকে এ ধরনের ঘটনাকে পরাগ ছিনতাই (pollen robbing) বলা হয়।

বাস্তব্যতন্ত্র (Ecosystem) : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট একটি স্থানের নির্দিষ্ট একটি পরিবেশে জৈবিক ও অজৈবিক সকল গুণাবলি মিলে যখন একটি সহনশীল এবং ধারণক্ষম অবস্থার সৃষ্টি করে তখন সেটাই একটি বাস্তব্যতন্ত্র হয়। যেমন—বনভূমি, সামুদ্রিক পরিবেশ, স্থলজ পরিবেশ ইত্যাদি।

বিদেশি প্রজাতি (Exotic species/flalien species) : যখন কোনো একটি প্রজাতি ভিন্ন কোনো দেশের ভিন্ন পরিবেশে থেকে নতুন পরিবেশে এসে জায়গা দখল করে নেয় অথবা মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে নিয়ে আসে তখন তাকে বিদেশি প্রজাতি (exotic species বা flalien species) বলা হয়।

হোমোজাইগোসিটি (Homozygosity) : জনন ক্রিয়ার যে ক্ষেত্রে জীব একই রকম বৈশিষ্ট্যের জীব উৎপন্ন করে সেটা হেটারোজাইগোসিটি আর যদি জীবের বৈচিত্র্য ঘটে তাহলে সেটা হবে হোমোজাইগোসিটি।

বৈচিত্র্যতা (Variability) : হেটারোজাইগোসিটির ফলে জীবের মধ্যে বৈচিত্র্যের (variability) সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভব ঘটে।

স্ট্রেইন (Strain) : বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে নতুন নতুন গুণ/বৈশিষ্ট্য (strain)–এর মিশ্রণের প্রয়োজন হয়।

জিনের পুনঃবিন্যাস (Gene recombination) : পরপরাগায়নের ফলে জিনের পুনঃবিন্যাস ঘটে। কারণ এতে ভিন্ন ফুল থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরাগ আসে এবং মিলিত হয়।

মৌমাছি পালন (Bee Keeping) : সাধারণত মৌমাছি পালন বলতে বোঝায় কৃত্রিম বাক্সের ভিতরে পালন করাকে। বিশিষ্ট প্রজাতির কয়েকটি মৌমাছি পালনের জন্য ব্যবহার করা হয় ব্যবসায়িক লাভের জন্য। এক্ষেত্রে প্রকৃতিতে প্রচুর ফুল থাকলে এরা সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করে, তবে খাবার প্রকৃতিতে না থাকলে মৌমাছির পালককে সে খাবার সরবরাহ করতে হয় (চিনির শরবত, পানি এবং পরাগ)।

সুড়ঙ্গ বাসা (Tube nest) : কিছু কিছু মৌমাছি বিশেষ করে অমৌমাছি বা বন্য মৌমাছিরা সাধারণত বিভিন্ন নলাকার উদ্ভিদের সুরঙ্গে বাসা তৈরি করে যেমন, নলখাগড়ার নল বা কাশ ফুলের কাণ্ড ইত্যাদিতে। এদের বাসাগুলোই হলো টিউব নেস্ট বা সুড়ঙ্গ–বাসা। এসব মৌমাছিদের ব্যবস্থাপনার জন্যে এ ধরনের সুড়ঙ্গ বাসা ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক।

ইউগ্লোসিনি (Euglossine) : অর্কিডের পরাগায়নকারী মৌমাছিগুলো Euglossine tribe–এর অধিনে রয়েছে, এগুলোকে অর্কিড মৌমাছি বা ইউগ্লোসাইন মৌমাছি (Euglossine bee) বলা হয়।

পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যা (Pollination ecology/Anthecology) : সাধারণত পরাগায়ন প্রতিবেশবিদ্যাকেই anthecology বলা হয়। এখানে উদ্ভিদ এবং পলিনেটরের মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কি করে একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের কাছ থেকে উপকৃত হয় তা নিয়ে গবেষণা করা হয়। শুধু তাই নয়, কি করে এদের উন্নয়ন করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

বাচ্চা প্রকোষ্ঠ (Brood cell) : মৌমাছির ক্ষেত্রে যে প্রকোষ্ঠে বাচ্চা থাকে অর্থাৎ ডিম পাড়ার পর একটি প্রকোষ্ঠে সাধারণত একটি বাচ্চাই থাকে। যদিও কোনো কোনো মৌমাছিতে প্রথম পর্যায় লার্ভা (first instar larva) পর্যন্ত একসঙ্গে অনেকগুলো থাকতে পারে, এই বাচ্চাসহ প্রকোষ্ঠটিই হলো বাচ্চা প্রকোষ্ঠ (brood cell)। এতে ডিম, লার্ভা এবং পিউপা থাকতে পারে।

পলিনেটর (Pollinator) : যে কীটপতঙ্গ বা প্রাণী বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুলে পরাগায়ন ঘটায় তাকে পলিনেটর বলে।

অ্যান্থার (Anther) : ফুলের পুংস্তবকের অংশ যা পুরুষ গ্যামেটোসাইট বা পরাগ উৎপন্ন করে।

অ্যানিমোফাইলি (Anemophily) : বাতাসের সাহায্যে পরাগায়ন ঘটনাকে অ্যানিমোফাইলি বলে।

কিরোপটেরোফাইলি (Chiropterphily) : বাদুরের পরাগায়ন ক্রিয়াকে বলা হয় কিরোপটেরোফাইলি।

জুফাইলি (Zoophily) : প্রাণীর পরাগায়ন ক্রিয়াই জুফাইলি নামে অভিহিত।

এন্টোমোফাইলি (Entomophily) : কীটপতঙ্গের পরাগায়ন ক্রিয়াকে এন্টোমোফাইলি বলা হয়।

অলিগোলেকটিক (Oligolectic) : যখন কোনো পতঙ্গ নির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি উদ্ভিদে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ভ্রমণ করে তখন তাকে অলিগোলেকটিক পতঙ্গ বলে।

পরাগ (Pollen) : অতি ক্ষুদ্র/মিহি পাউডার যা ফুলের পুংকেশরে উৎপন্ন হয়, যেখানে পরাগ কণা (pollen grain) থাকে এবং প্রত্যেকটি পরাগ কণা একটি পুরুষ গ্যামেট বহন করে।

পরাগ কণা (Pollen grain) : বীজ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের হ্যাপ্লয়ড মাইক্রোস্পোর (haploid microspore) যা পুরুষ গ্যামেট উৎপন্ন করে এবং বহন করে।

বাটুমেন (Batumen) : এক ধরনের পদার্থ (সেরুমেন, মাটি) যা হুলবিহীন মৌমাছির বাসা তৈরিতে ব্যবহার হয়।

সেরুমেন (Cerumen) : রেজিন এবং মোম–এর মিশ্রিত পদার্থ যা হুলবিহীন মৌমাছিরা তাদের বাসা তৈরিতে ব্যবহার করে। সাধারণ মৌমাছিরাও খুব অল্প পরিমাণে এর ব্যবহার করে থাকে।

বাচ্চা (Brood) : কীটপতঙ্গের বাচ্চাকালীন সময়ের নাম ব্রুড। সাধারণত ডিম, লার্ভা এবং পিউপাকে একত্রে ব্রুড বলা হয়ে থাকে।

কাস্ট (Castes) : সামাজিক (social) কীটপতঙ্গের কলোনিতে কর্ম সম্পাদনকারী দুটি গ্রুপ আছে, এদেরকে কাস্ট/বর্ণ বলা হয়। কাস্ট দুটি হলো কর্মী এবং রানি। বিভিন্ন প্রজাতির সামাজিক মৌমাছির বেলায় কর্মীদের কাজ করার যোগ্যতা এবং কর্ম বণ্টন (task allocation) পদ্ধতি নির্ভর করে এদের শারিরীক গঠন কিংবা বয়সের তারতম্যের উপর। পুরুষ কোনো কাস্ট নয়।

কলোনি (Colony) : মৌমাছির ক্ষেত্রে কলোনি হলো পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী মৌমাছির দল যারা একটি বাসায় থাকে, কাজ করে এবং বাচ্চাদের খাওয়ায়।

ফুল পছন্দ (Flower constancy) : খাদ্য সংগ্রহকারী মৌমাছিগুলোর একই ফুলে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলে ভ্রমণের ঝোঁক বা ব্যবহার করার প্রবণতাই ফুল পছন্দ ; এটি সাধারণত পরাগ সংগ্রহের জন্যে ঘটে থাকে।

মধু (Honey) : ফুলের নেকটার যা মৌমাছিরা সংগ্রহ করে আংশিক হজম করার ফলে প্রস্তুত হয়, যাতে থাকে সহজ চিনি এবং এর থেকে পানি সরিয়ে নেয়া হয়।

নেকটার (Nectar) : সুমিষ্ট রস যা উদ্ভিদের নেকটারগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। সাধারণত ফুলেই থাকে এ নেকটারগ্রন্থি। এ রস মৌমাছিদের আকর্ষিত করে, কারণ এটি তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় এবং এর থেকে মৌমাছিরা মধু উৎপন্ন করে।

পলিলেকটিক (Polylectic) : যেসব মৌমাছি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে তাদেরকে পলিলেকটিক মৌমাছি বলা হয়।

প্রোপলিস (Propolis) : উদ্ভিদ নিঃসৃত রেজিন যা মৌমাছিরা সংগ্রহ করে তাদের বাসা তৈরি বা মেরামত করার কাজে।

হুলবিহীন মৌমাছি (Stingless honey bee) : এদের কার্যত হুল নেই তাই এদেরকে হুলবিহীন মৌমাছি বলা হয়। এরা Apidae গোত্রের অন্তর্গত পতঙ্গ।

মোম (Wax) : মৌমাছির শরীর থেকে নিঃসৃত এক ধরনের পদার্থ। পেটের Terga বা Sterna-এর সংযোগস্থলে এ পদার্থ নিঃসৃত হতে দেখা যায়। মোম মৌমাছিরা সাধারণত বাসা তৈরিতে ব্যবহার করে।

ফুল চুরি (Flower larceny) : কিছু কিছু পতঙ্গ আছে বিশেষ করে ছোটো ছোটো মৌমাছি, মাছি ইত্যাদি এরা ফুলের ভিতরে ঢোকে ঠিকই কিন্তু পুংকেশর এবং গর্ভমুণ্ডে ছোঁয় না এবং সেখান থেকে সুকৌশলে নেকটার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, এ ঘটনাই হলো ফুল চুরি (floral/flower larceny)।

পরাগবল (Pollen ball/Pollen lump) : মৌমাছি পরাগ সংগ্রহের জন্যে ফুলে ঢুকলে, সেখান থেকে এর সমস্ত গায়ের লোমগুলোতে পরাগ আটকে যায়। সেগুলো পর্যায়ক্রমে সামনের এবং মাঝখানের পায়ের সাহায্যে সমস্ত শরীর থেকে এনে পিছনের পায়ের করবিকিউলিতে জমা করে। ক্রমান্বয়ে জমা হতে হতে সে পরাগের স্তূপ একটি বলের আকার ধারণ করে, যাকে পরাগ বল, পরাগ লাম্প (Pollen lump) অথবা পরাগ স্তূপ বলা হয়।

তথ্যপঞ্জি

Ackerman, J.D.. 1975. Reproductive biology of *Goodyera oblongifolia* (Orchidaceae). *Madrono.* **23** : 191-198.

Appanah, S. and H.T. Chan. 1981. Thrips : the pollinators of some dipterocarps. *Malaysian Forester.* **44** : 234-252.

Asada, S. and M. Ono. 1996. Crop pollination by Japanese bumble bees, *Bombus* spp. (Hymenoptera : Apidae) : Tomato foraging behavior and pollination efficiency. *Applied Entomology and Zoology.* **31** : 581-586.

Baker, H.G. and P.D. Hurd. 1968. Intrafloral ecology. *Annu. Rev. Entomol.* **13**: 385-414.

Banda, H. J. and R.J. Paxton. 1991. Pollination of greenhouse tomatoes by bees. *Acta Horticulturae.* **288** : 194-208.

Batra, S.W.T. 1978. *Osmia cornifrons* and *Pithitis smaragdula*, two Asian bees introduced into the United States for crop pollination. *Proceedings 4th International Symposium on Pollination.* Maryland Agricultural Experimental Station Miscellaneous Publication. **I** : 307-312.

Bauer, P. J. 1983. Bumble bee pollination relationships on the Beartooth Plateau Tundra of Southern Montana. *Amer. J. Bot.* **70** : 134-144.

Bhuiya, B. A. and M. I. Miah. 1990. A preliminary report on the bees (Hymenoptera : Apoidea) of Chittagong, with brief biological notes. *Chittagong University Studies, Part II : Science.* **14 (2)** : 61-71.

Bohart, G. E. 1950. The alkali bee *Nomia melanderi*, a native pollinator of alfalfa. *Proc. 12th Alfalfa Improvement Conference. Lethbridge, Alberta* : 32-35.

Bohart, G. E. 1970. Commercial production and management of wild bees--A new entomological industry. *Bulletin of the Entomological Society of America* **16 (1)** : 8-9.

Bohart, G.E. and M.W. Pedersen. 1963. The alfalfa leaf-cutting bee, *Megachile rotundata* F. for pollination of alfalfa in cages. *Crops. Sci.* **3**:183-184.

Brantjes, N. B. M. 1981. Ant, bee and fly pollination in *Epipactis palustris* (L.) Crantz (Orchidaceae). *Acta Botanica Neerlandica.* **30** : 59-68.

Buchmann, S. L. 1983. Buzz pollination in angiosperms. pp. 73-114 in C.E. Jones and R. J. Little eds. *Handbook of Experimental Pollination Biology*. Van Nostrand Reinhold, New York.

Bunting, S. and D. Griffiths. 1990. Bumble bee factory. *Grower.* **114 (20)** : 15-17.

Calvo, R. N. 1990. Inflorescence size and fruit distribution among individual, in three orchid species. *American Journal of Botany* **77** : 1378-1381.

Dafni, A. 1984. Mimicry and deception in pollination. *Annu. Rev. Ecol. Syst.* **15** : 259-278.

Dafni, A. 1992. *Pollination Ecology - A Practical Approach.* Oxford University Press. XVI+250.

Darwin, C. R. 1859. *On the origin of species by means of natural seletion, or the preservation of favoured races in the struggle for life.* (Ist edition) John Murray, London, 502 pp.

Darwin, C. 1877. *The various contrivances by which orchids are Fertilized by Insects*. John Murray, London. (300 pp. Reprinted in 1984 by the University of Chicago Press).

Daumer, K. 1956. Reizmetrische Untersuchung des Farbensehens der Biene. *Zeitschr. Vergl. Physiol.* **38** : 413-478.

Daumer, K.1958. Blumenfarben, wie sie die Bienen sehen. *Zeitschr. Vgl. Physiol* **41**: 49-110.

Donovan, B. J. and S. S. Wier. 1978. Development of hives for field population increase, and studies on the life cycles of the four species of introduced bumble bees in Newzealand. *N. Z. J. gar. Res.* **21** : 733-756.

Doorn, A. van and J. Heringa. 1986. The ontogeny of a dominance hierarchy in colonies of the bumble bee *Bombus terrestris* (Hymenoptera, Apidae). *Ins. soc.*, **33** : 3-25.

Doorn, A. van. 1987. Investigations into the regulation of dominance behaviour and of the division of labour in bumble bee Colonies (*Bombus terrestris*). *Neth. J. Zool.*, **37** : 255-276.

Dressler, R. L. 1981. *The orchids : Natural History and Classification.* Harvard University Press, 332 pp., Cambridge.

Dressler, R. L. 1990. The *Orchids : Natural History and Classification.* Harvard University Press. Cambridge.

Dressler, R. L. 1993. *Phylogeny and Classification of the orchid family.* Dioscorides Press, Portland.

Duchateau, M. J. 1991. Regulation of colony development in bumblebees *Acta Hortic.*, **288** : 139-143.

Duchateau, M. J. and H. H. W. Velthuis. 1988. Development and reproductive strategies in *Bombus terrestris* colonies. *Behaviour.* **167** : 186-207.

Eijnde, J., ven den, A. De Ruijter and J. van der Steen. 1991. Method for rearing *Bombus terrestris* continuously and the production of bumble bee colonies for pollination purposes. *Acta Hortic.*, **288** : 154-158.

Faegri, K. and van der L. Pijl. 1979. *The Principles of Pollination Ecology* (3rd edn) Pergamon Press, New York.

Felicioli, A., A. Rossi, and M. Pinzauti. 1996. Pollination of greenhouse tomatoes (*Lycopersicon esculentum cornua)* Latr. (Hymenoptera, Megachilidae). *Proceedings (XX International Congress of Entomology. Firenze, Italy, August 25-31.*

Free J. B. 1955. Queen production in colonies of bumblebees. *Proc. R. entomol. Soc. Lond.* (A) **30** : 19-25.

Free, J. B. and C. G. Butler. 1959. *Bumblebees* (New Naturalist Series). Collins, London.

Free, J.B. 1993. *Insect Pollination of Crops* (2nd eds.). xii + 684 pp. Academic Press, London *et al.*

Frisch, K.von. 1967. *The dance language and orientation of bees.* Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge. Mass.

Frohlich, D. R. and F. D. Parker. 1983. Nest building behaviour and development of the sunflower leafcutter bee : *Eumegachile (Sayapis) pugnata* (Say) (Hymenoptera : Megachilidae) *Psyche*, **90** : 193-209.

Gray, A. 1862. Fertilization of orchids through the agency of insects. *Am. J. Sci.* **34** : 420-429.

Hackwell, G. A. 1968. The biology and behaviour of the alkali bee *Nomia melanderi* Cockerell (Hymenoptera : Apoidea). Ph.d. thesis, Oregon State Univ., Corvallis.

Hannan, M. A., Maeta, Y. and K. Hoshikawa. 1997. Colony development of two species of Japanese bumblebees *Bombus (Bombus) ignitus* and *Bombus (Bombus) hypocrita* reared under artificial condition (Hymenoptera, Apidae). *Japanese Journal of Entomology.* **65** : 343-354.

Hannan, M.A., Maeta, Y. and K. Hoshikawa. 1998. Feeding behavior and food consumption in *Bombus (Bombus) ignitus* under artificial condition (Hymenoptera : Apidae). *Entomological Science.* **1 (1)** : 27-32.

Hasselrot, T. B. 1952. A new method for starting bumblebee colonies. *Agr. J.*, **44** : 218-219.

Hasselrot, T. B. 1960. Studies on Swedish bumblebees (genus *Bombus* Latr.) : their domestication and biology *Opusc. ent. suppl.* **17** : 1-192.

Heemert, C. van ; Ruijter, A. De ; Eijnde, J. van den and J. van der Steen. 1990. Year round production of bumblebee colonies for crop pollination. *Bee World.* **71** : 54-56.

Heinrich, B. 1979. *Bumblebee Economics.* Harvard University Press, Cambridge.

Heinrichs, D.H. 1967. Seed increase of alfalfa in growth chambers with *Megachile rotundata* F. *Can. J. Pl. Sci.* **47** : 691-694.

Katayama, E. 1973. Observation on the brood development in *Bombus ignitus* (Hymenoptera, Apidae) II. Brood Development and feeding habits. *Kontyu, Tokyo.* **41** : 203-216.

Katayama, E. 1975. Egg-laying habits and brood development in *Bombus hypocrita* (Hymenoptera, Apidae) II. Brood development and feeding habits. *Kontyu, Tokyo.* **43** : 478-496.

Kempff Mercado, N. 1962. Mutualism between *Trigona compressa* Latr. and *Crematogaster stolli* Forel. *J. New York Entomol. Soc.* **70** : 215-217.

Kenoyer, L.A. 1916. Insect pollination of timberline flowers in Colorado. *Proc. Iowa Acad. Sci.* **23** : 483-486.

Kerr, W.E. 1951. Bases para o estudo da genetica de populcoes das Hymenoptera em geral e dos Apinae sociais em particular. *An Esola Superior Agr. "Luiz de Queiroz"* **8**: 219-354.

Kerr, W.E. and C. da Costa Cruz. 1961. Funcoes diferentes tomadas plea glandula mandibular na evolucao das abelhas em geral e em *"Trigona (Oxytrigona) tataira"* em especial. *Rev. Brasileira Biol.* **21** : 1-16.

Kerr, W.E. and E. de Lello. 1962. Sting glands in stingless bees a vestigial character. *J. New York Entomol. Soc.* **70**: 190-214.

Kerr, W.E. and H.H. Laidlaw. 1956. *General Genetics of Bees. Advances in Genetics.* New york: Academic Press. **8**: 109-153.

Kevan, P.G. 1972. Insect pollination of high arctic flowers. *J. Ecol.* **60** : 831-847.

Kevan, P.G. 1978. Floral coloration, its colorimetric analysis and significance in anthecology. pp. 51-79 in A.J. Richards. ed. The pollination of Flowers by Insects. Academic Prees, New york.

Kevan, P.G. 1983. Floral colors through the insect eye: What they are and what they mean. pp 3-30 in C.E. Jones and R.J. Little eds. Handbook of experimental pollination ecology. Van Nostrand Reinhold, New york.

Kippings, J. L. 1971. Pollination studies of native orchids, Masters thesis, San Francisco State College, San Francisco (cited in Ackerman 1975).

Michener, C.D. 1974. *The Social Behavior of the Bees : A Comparative Study.* xi+404pp. Harvard Univ. press, Cambridge, Mass.

Muller, H. 1873, *Die Befruchtung der Blumen durch Insekten.* Englemann, Leipzig.

Nagamitsu, T. and T. Inoue. 1997. Cockroach pollination and breeding system of *Uvaria elmeri* (Annonaceae) in a lowland mixed dipterocarp forest in Sarawak. *American Journal of Botany.* **84 (2)** : 208-213.

Nilsson, L. A. 1980. The pollination ecology of *Dactylorhiza sambucina* (Orchidaceae). *Botaniska Notiser.* **133** : 367-385.

Nilsson, L. A. 1978. Pollination ecology of *Epipactis palustris* (Orchidaceae). *Botaniska Notiser.* **131** : 355-368.

Nilsson, L. A. 1979. Anthecological studies in the ladys slipper, *Cypripedium calceolus* (Orchidaceae). *Botaniska Notiser.* **132** : 329-347.

Nogueira-Neto, P. 1948. Notas bionomicas Sobre meliponineos. I. Sobre a ventilacao dos ninhos e as construcoes com ela relacionadas. *Rev. Brasileira Biol.* **8**: 465-488.

Nogueira-Neto, P. 1970. *A criacao de abelhas indigenas sem ferrao.* [1st ed., 1953] Sao Paulo: Chacaras e Quintais.

Nur, N. 1976. Studies on pollination in musaceae. *Ann. Bot.* **40** : 167-177.

Ono, M. 1995. Bumblebees and biological control agents, *Insectarium,* 32 : 4-9 (In Japanese).

Ono, M.; Mitsuhata, M. and M. Sasaki. 1994. Use of introduced *Bombus terrestris* worker helpers for rapid development of Japanese native *B. hypocrita* colonies (Hymenoptera, Apidae). *Appl. Entomol, Zool.,* **29** : 413-419.

Perry, D.R. 1978. *Paratropes bilunata* (Orthoptera : Blattidae) : an outcrossing pollinator in a neotropical wet forest canopy. *Proceedings of the Entomological Society of Washington.* **80** : 657-658.

Pijl, L., van der and C. H. Dodson. 1966. *Orchid flowers, their pollination and Evolution,* University Miami Press. 214 pp., Coral Gables.

Kölreuter, J. G. 1761-1766. Vortäufiger Nachricht von einigen das Geschlecpt der pflanzen betreffenden Versuchen und Beobacten. Leipzig.

Sprengel, C. K. 1793. Das entdeckte Geheimniss der Natur in Bau und in der Befruchtung der Blumen. Friedrich Vieweg, Berlin.

Camerarius, R. J. 1694. Academia, Caesareo Leopold. N. C. Hectoris II. Rudolphi Tacobi Camerarii. Professoris Tubingensis, ad Thessalum, D. Mich. Bernardum Valentini, Professorem Girssensem excellentissi mum, de sexu plantarum epistola, Tübingen.

Darwin, C. 1858. On the agency of bees in the fertilisation of papilionaceous flowers. *Gardeners chronicle*. **1858** : 824-844.

Darwin. C. 1862. On the two forms, or dimorphic condition, in the species of *Primula* and on their remarkable sexual relations, *Journal of the Linnean Society (Botany)*. **6** : 77-96.

Free, J. B. 1970. *Insect Pollination of Crops*, Academic Press.

Kress. W. J. 1983. Self incompatibility in Central American *Heliconia*. *Evolution*. **37** : 735-744.

Brantjes, N. B. M. 1980, Flower morphology of *Aristolochia* species and the consequences for pollination. *Acta Botanica neerlandica*. **29:** 212-213.

Bergström, G. 1978. Role of volatile chemicals in *Ophrys* pollinator interactions biochemical aspects of plant-animal co-evolution (ed. T. B. Harborne), pp. 207-232. Academic Press, London.

Kato, M. and Inoue T. 1994. Origin of insect Pollination. *Nature*. 368 : 195.

Vogel, S. 1963. Duftdrüsen im Dienste der Bestaübung : über Bau ünd Funktion der Osmophoren. Abhandlungen, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. **1962 (10)** : 599-763.

Vogel, S. 1990 Olblümen und ölsammelnde Bienen, dritte Folge, Momordica, Thladiantha und die Ctenoplectridae. *Tropische und Subtropische Pflanzenwelt*. **73** : 1-186.

Alam, M. Z. 1967. *A report on the survey of insect and mite fauna of Bangladesh* (former East Pakistan). Bangladesh Agricultural Research Institute, Dhaka.

FAO Agricultural Services Bulletin. 1995. *Pollination of cultivated plants in tropics* (Edited by D. W. Roubik). pp. 196.

Williams, I. H. 1983. The pollination of ppigeon pea *(Cajanus cajan)* in India. *Second International Conference on Apiculture in Tropical Climates 1980, 661-666.* New Delhi : Indian Agricultural Research Institute.

Tadauchi, O. and M. Z. Alam 1993. Survey of pollinating wild bee fauna on mustard fields in Bangladesh. Bull, Inst. Trop. Agr. Kyushu Univ. 16 : 91-106.

Torchio, P. F. 1987. Use of non-honey bee species as pollinators of crops. *Proceedings of the Entomological Society of Ontario.* **118** : 111-124.

Pijl, L. van der, and C. H. Dodson. 1966. *Orchid flowers : Their pollination and Evolution.* Miami, Florida : Univ. Miami Press.

Frohlich, D. R., and F. D. Parker. 1983. Nest building behavior and development of the sunflower leafacutter bee : *Eumegachilae pugnata* (Hym : Megachilidae). *Psyche.* **90** : 193-209.

Wille, A. 1963. Behavioral adaptations of bees for pollen collecting from *Cassia* flowers. *Rev. Biol. Trop.* **11.** 205-210.

Sakagami, S. F. and E. Katayama. 1977. Nests of some Japanese bumblebees (Hym. : Apidae). *Jour. Fac. Sci. Hokkaido Univ. Ser. VI, Zool,* **21 (1)** : 92 — 153.

Katayama, E. 1993. Supplementary notes on the nests of some Japanese bumblbees (III) *Bombus (Thoracobombus) deuteronymus maruhanabachi. Jpn. J. Ent.* **61 (4)** : 749-761.

Doorn, A. van. 1987. Investigations into the regulation of dominance behavior and of the division of labour in bumblbee colonies *(Bombus terrestris). Netherlands Journal of Zoology.* **37 (3-4)** : 255-276.

Maeta, Y. 1990. Utilization of wild bees. *Farming Japan. (24-6)* : 13-19.

Roth, L. M. and E. R. willis. 1960. The biotic associations of cockroaches. *Smithsonian Miscellaneous Collections*. **141** : 139-165.

Hasselrot, T. B. 1952, A new method of starting bumblebee colonies. *Agron. J. 44* : 218-219.

Richards, K. W. 1982. Inputs, expectations, and management of the alfalfa leafcutter bee, *Megachile rotundata. Proceedings of the First International Symposium on Aflalfa leafcutting bee management.* University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, PP. 113-135.

Morse, R. A. and F. M. Laigo. 1969. *Apis dorsata* in the Philippines, Monograph No 1, Philippine Association of Entomologists Inc.

Hannan, M. A. 2001. Beekeeping and apicultural products in Bangladesh. *Honey bee Science. 21(4)* : 154-158. (In Japanese, Summary in English).

Pettersson, B. and L. A. Nilsson,1993. Floral variation and deceit pollination in *Polystachy rosea* (Orchidaceae) on an inselberg in Madagascar. *Opera Botanica,* **121** : 237-245.

Smith, D. R. 1991. *Diversity in the genus Apis.* Oxford & IBH Publ. Co. pp. 265.

Poovey, C. 1992. Royal hayan bee. *Beekeeping & Development.* 25 : 6-7.

নির্ঘণ্ট

A. cerana ৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ৪১, ৫৪, ৫৫, ৮৪, ৯৮
A. m. adansonii ৭১
A. m. carnica ৮৮
A. m. cecropia ৮৮
A. m. iberica ৮৭
A. m. lehzeni ৮৭
A. m. ligusrica ৮৭
A. m. macedonica ৮৮
A. mellifera ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৪০, ৪১, ৫৫, ৫৯, ৭৭, ৮৭, ৯৮
A. m. sicula ৮৭
Academic garden ১১৪
Acarapis aoodi ৮৫
Acarina disease ৮৫
Acetonemia ৮০
Acherontia atropos ৮৪
Aethina tumida ৮৪
Aethopyga siparaja ৫
Age linked task allocation ৩৩
Alarm pheromone ৭২
Alfalfa leaf cutting bee ১০০
Alien species ৯২
Alkali bee ৯৮, ১০০
American Foul Bord ৮৫
Anaesthetic ১৫৩
Andrena ১৮, ৪২
Andrena mollis ৪২
Andrenidae ২৫, ২৮, ৪২
Anemophily ৯২, ১৯১
Anther ১, ১৪১
Anthidium rasorium ৪২
Anthophora ২৯
Anthophoridae ৪২, ৪৩, ৪৫, ৫৩
Apidae ৩১, ৩২, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৫৬, ৮৭, ১০২
Apinae ১৮, ৯৮, ১০২
Apis andreniformis ৬২, ৬৪, ৯৮
Apis breviligula ৯৮
Apis dorsata ৬২, ৬৩, ৭০, ৯৮
Apis florea ২৪, ৪২, ৬২, ৬৩, ৭০, ৯৮
Apis koschevnikovi ৬২, ৯৮
Apis laboriosa ৬২, ৯৮
Apis nigrocinta ৬২, ৬৫
Apis nuluensis ৬২, ৬৫
Arachnothera longirostris ৫
Attractants ১৩, ২৩
Azteca ৩৩
Bacillus bacteria ৮৫
B. montivagus ১০০
Bald brood ৮৫
Bashkiria ৮৯
Basitarsi ৩১
Batumen plate ৩২

Bee milk ৬৯
Bee-keeper ৫, ১০১
Biosphere reserves ১১৩
Blattodea ৬
Bombinae ১০৩
Bombus (Bombus) hypocrita ১০০
Bombus Bombus ignitus ১০০
Bombus eximius ১০০
Bombus terrestris ৮৯, ১০০
Borassus flabellifer ৭৩
Brassica juncea ২৬
Braula ৮৪
Brood cell ২৪, ১৯১
Bumble bee ৮৯, ১০০
Camponotus senex ৩৬
Cantharophily ৯১
Capped honey ৭৯, ৮১
Cast determination ৩২
Caucasian ৭১
Ceratina ৪২
Ceratina hieroglyphica ৪২
Ceratina perforatrix ৪২
Ceratina sexmaculata ৪৩
Ceratina viridissima ৪৩
Chalk brood ৮৫
Chilled brood ৮৫
Chiropterophily ৯১
Ciba ৭৩
Cleptotrigona ৩৫
Coelioxys argentifrons ৪৩
Coelioxys basalis ৪৩
Coelioxys capitatus ৪৩
Coelioxys decipiens ৪৩
Coelioxys histrio ৪৩
Coleoptera ৫
Compositae ১০২
Corbicula ৬৯, ১৩৩
Corolla ৯২
Crematogaster stolli ৩৬
Crop pollination ১৯, ১১১
Ctenoplectra cornuta ৪৩
Cylindrical cavity ৩৪
Diptera ৫, ১০৬
Disturbed habitat ৩০
Division of labor ৩৩
Dorsal abdomen ৭৩
Drone ৭১
Dwarf honeybee ৪২
Ecosystem ৬৬, ৯৩, ১৮৯
Emergence ২৯
Entomophily ৯১
Euglosinae ১৩৬
Eumegachile pugnata ১০২
European Foul Brood ৬০, ৮৫
European honey bee ৮৭
Evolution ৯১
Exotic species ১৮৯
Fanning ৩২
Fermented ৬৯
Fertilization ১
Forager ২৬, ১৮৮
Gene recombination ৯০, ৯৩
Genera ১০৫
Geometridae ৩

Giant honey bee ৪২
Gnetum ৩
Golden insect ২৭
Gravity-pollination ৯১
Greenhouse ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৯, ৮৯, ১০০
Gregarious ৯৭
Habitat ১১২
Habitat management ১০৫
Halictidae ৪১, ৫২, ১৪৪
Halictus ciris ৪৩
Halictus senescens ৪৩
Halictus subopacus ৪৩
Halictus viscinus ৪৩
Halictus wroughtoni ৪৩
Hand pollination ১৭, ১৮, ১০৪
Harmatan ৭৮, ৮০
Heliconia ৫
Heriades parvula ৪৩
Hesperiidae ১১০
Heterozygosity ৯৩
Hey fewer ৮০
Highly eusocial ৩৪
Hive ৩০, ৯২
Homalictus ৪৩
Homozygosity ৯৩, ১৯০
Homozygus ৯৩
Honey crop ৩২, ৩১
Honey pot ৩১
Honey bee ১০, ৩৪, ৯৩, ১০২
Hot bath method ৮০
House garden ১১৪
Horned faced bee ১০০, ১০১
Hymenoptera ৫
Hypopharyngeal gland ২২
Iberian peninsula ৮৭
Incubation ২৯
Inflorescence ১৪৮
Insect pollinator ১০০
Iralian ৭১
Langstroth ৭৪
Large carpenter bee ১২
Larra fuscipennis C. ৪৮
Lasioglossum ১৮, ৪৪
Lasioglossum albescens ৪৪
Lasioglossum massuricus ৪৪
Lasioglossum matheranensis ৪৪
Lasioglossum nasicenses ৪৪
Lasioglossum propinqua ৪৪
Lauxaniidae ৩
Leaf cutting bee ১০১, ১১২
Leguminous ১৩০
Lepidoptera ৫
Lestrimelitra ৩৫
Lime forest ৮৯
Lithurgus atratus ৪৩৪
Live ember ৭৯
Long tongued bee ১০৬
Macroglossinae bats ৫
Macroglossus solorinus ৫
Malacophily ৯১
Management ৩০, ৩৮
Mandibular gland ৩৬
Mason bee ১০১
Mated ৯৪

Maya ৫, ৩০
Mechanical pollination ১০৪
Medicago sativa ২৯
Megachile ৮৯
Megachile (Eutricharea) ২৮
Megachile anthracina ৪৪
Megachile bicolor ৪৪
Megachile conjuncta ৪৪
Megachile disjuncta ৪৪
Megachile faceata ৪৪
Megachile gathela humida ৪৫
Megachile monticola ৪৫
Megachile ronutdata ২৯, ১২৬
Megachile rotundata ২৯, ৮৯
Megachilidae ৩১, ৪১, ৪৪
Melecta himalayana ৪৫
Meliponiculture ৩৪
Melissococus platon ৮৫
Meliponini ১৩৬
Melittophily ৯১
Micropteriqidac ১১০
Musa acuminata ১৬
Myophily ৯১
National Park ১১৫
Nectar robbing ৩৮, ৯২
Nesting habitat ৩০
Nesting site ৩৪
Nitrogen fixing plants ২০
Nomada ২৮
Nomada adjusta ৪৫
Nomada lusca ৪৫
Nomada subpetiolata ৪৫
Nomia ২৮
Nomia aurifrons ৪৫, ১০১
Nomia clypeata ৪৫
Nomia curvipes ৪৫, ১০১
Nomia elliotii ৪৫
Nomia exbeloides ৪৫
Nomia melanderi ২৯, ১০১, ১০৬, ১২৬
Nomia westwoodi ৪৫
Non honey bee ১০, ৯৩, ৪৮, ৯৮, ১৮৮
Non social bee ১০, ৯৮
Nosema apis ৮৫
Ocloo's method ৮০
Oligolectic ১৯১
Orchid ৩, ৪
Orchard crops ১০২
Origin of Species ২
Ornithophily ৯২
Osmia conifrons ২৩, ১০০, ১২৬
Osmia corunta ২৯
Osmia lignaria propinqua ১০০
Out crossing ১২৮
Oxytrigona ৩৬, ৪৮
Paralized ৮৪
Parent colony ৩৪
Partamona ৯৮
Paratrigona ৩৬
Phalaenophily ৯১
Phorid ৩৫
Pithitis ১৭, ২৮, ২৯
Pithitis smaragdula ২৯
Pollen ball ৩১, ১৯২
Pollen lump ৩১, ১৯২

Prepupa ৮৫
Primitively eusocial ৩৪
Pseudoscorpion ৮৪
Psithyrus bellardii ৪৫
Psychophily ৯১
Pyralidae ৩
Pyrgotids ১০৮
Quality of food ৩২
Quantity of food ৩২
Recruit ৩২
Repellents ২১, ২৩
Robber flies ১০৮
Rove beetles ১০৯
Sac brood ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৮৫
Salivary gland ৩২
Sanctuaries ১১৫
Savannah ৭০
Scopa ৩১
Sealed combs ৬৯
Self-pollination ৯০
Selfing ৯০
Semi-social ৩৪
Short tongued bee ১০৬
Size linked task allocation ৩৩
Social bee ১০
Solanaceae ১৭
Solar wax melter ৭৯
Solitary bee ১০, ১৭, ২৮, ৯৮, ১৮৮
Sphecodes ২৮
Sphecodes crassicornis ৪৬
Sphecodes fumipennis ৪৬
Sphecodes matheranensis ৪৬
Stamen ১
Steganomus nodicornis ৪৬
Stigma ২৩
Stigmatic exudate ৬
Stingless bee ৩০, ৩৪
Stingless honey-bee ৩০, ৩৪
Stone brood ৮৫
Strains ৯৩, ১৯০
Stratomyid ৩৪, ৩৫
Sub-family ১০২, ১০৩
Sub-genus ৩৭, ১০২
Summer bird ৮২
Sulawesi island ৬৫
Swarming cluster ৬৬
Syrphid flies ৩৫
T. (Paratrigona) peltata ৩৬
T. (Trigona) compressa ৩৬
Task allocation ৩৩, ১৯১
Temporal task allocation ৩৩
Tibia ৩১
Trap nest ১২
Trigona ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮
Trigona (Scaura) latitarsis ৩৬
Trigona fuscobaltiata ৪৫
Trigona jaty ৩৮
Trigona postica ৩২
Tropical agriculture ৩৭
Tube nests ১০১, ১০২
Unsealed honey ৬৯
Uvaria elmeri ৬
Variability ৯০, ৯৩, ১৯০
Varieties ৯০, ৯৩

Ventilation ৮১
Vespa ২৭
Wild bee ১০, ৯৮
Worker ৩০
World heritage reserve ১১৩
Xylocopa ২৮, ২৯, ১১৩
Xylocopa acutipennis ৪৬
Xylocopa aestuans ৪৬
Xylocopa auripennis ৪৬
Xylocopa basalis ৪৬
Xylocopa dissimilis ৪৬
Xylocopa fenestrata ৪৬
Xylocopa latipes ৪৬
Xylocopa rufescens ৪৬
Xylocopa tenuiscopa ৪৬
Xylocopa verticalis ৪৬
Xylocopidae ৪৬
Zoological park ৩৭
Zoophily ৯২, ১৯১

অভয়ারণ্য ১১৫
অমৌমাছি ৯৮
অর্কিড ৩, ৪
অলিগোলেকটিক ১৯১
অ্যানিমোফাইলি ১৯১
আধুনিক বাক্স ৭৪
আফ্রিকান মৌমাছি ৭১, ৬৭
আলপাইন সুইফট ৮৪
আলফালফা ১০১
আলফালফা পাতাকাটা মৌমাছি ১০০
ইউরোপের মৌমাছি ৭১, ৭২
উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য ৯০
উদ্ভিদের বিবর্তন ১২৮
উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ১২৮
উপটৌকনহীন ১৪৪
উষ্ণমণ্ডলীয় বাদল অরণ্য ১১৯
এন্টোমোফাইলি ৯১, ৯২
এপিয়ারি ৭৫, ৮৫, ৮৬
এপিয়ারি ব্যবস্থাপনা ৭৮
এশিয় মৌমাছি ৬২
করবিকিউলা ৬৯, ১৩৩
কলোনি ১৫, ১৯, ২০
কাঠের বাক্স ৭৩
কাস্ট ১৯১
কাস্ট প্রথা ১৯১
কিরোপটেরোফাইলি ১৯১
কীটনাশক ৬১
কীটপতঙ্গ ১১২
কুমড়ো বাক্স ৭৩
কৃত্রিম পরাগায়ন ৮, ৯৭, ১০৪
কৃত্রিম বাসস্থান ৬, ১২
কৃত্রিম বাসা ১০১
কৃত্রিম হরমোন দ্বারা পরাগায়ন ১০৪
ক্রস পরাগায়ন ১৯, ১০৫
ক্ষারীয় মৌমাছি ১০০, ১০১, ১২৬
ক্ষুদে মৌমাছি ৪৫
খাদ্য সংগ্রহকারী ১২
গর্ভমুণ্ড ২৩, ১২৯
গ্রিনহাউজ ১০, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৯, ৮৯, ১০২
ঘাসের বাক্স ৭৩
ছোট ছুতার মৌমাছি ৪২
ছোট জিহ্বাযুক্ত মৌমাছি ৫৭, ৯২, ১৩২
জাতীয় উদ্যান ১১৫
জিনের পুনঃবিন্যাস ৯০, ৯২
জীববৈচিত্র্য ৬৭, ৯৬, ১১৩
জুফাইলি ৯২, ১২৮, ১৯১
জৈব দমনকারী

ব্যারেল বাক্স ৭৩
ভাইব্র্যাটিং ১৪১
ভেন্টিলেশন ৮১
ভ্রমর ৪১, ৯৮
মথ ৩, ৫৮, ৯১, ৮৪
মধু ৪, ১০, ১১, ২০, ২৭, ৫৪, ৫৫, ৮৮, ৯৫
মধু উৎপাদন ৪০, ৫৯, ৭২, ৭৮
মধু কুঠরি ৬৯
মধুর ব্যবহার ৮০
মধু সংগ্রহ ১৩, ৬৭, ৭৮
মাকড়সা ৮৪
মাছি ৩, ৮৪, ৯১, ১০৬, ১১২, ১৩৩
মাটির পাত্র ১০, ৩২, ৭৪
মেশন মৌমাছি ১০, ১৪, ৯৮
মেসোপেটামিয়া ১
মোম ১০, ১৩, ২০, ৫৫, ৮৮, ৯৫
মোম মথ ৫৮, ৮৪, ১১৯
মৌ উদ্ভিদ ১৩, ৫৫, ৭৫, ১৫৫, ১৫৬
মৌচাক ১৩, ৬১
মৌপদার্থ ৭৩
মৌবাক্স ৮, ৬১, ৭৩, ৯৩, ৯৪
মৌ বিষ ৫৮, ৭০
মৌমাছি পালক ২০, ৫৪
মৌমাছি পালন ৮, ২০, ৫৫, ৭০, ৭৩, ৯৫
মৌমাছি ব্যবস্থাপনা ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৩০
মৌমাছির অসুখ ৮৫, ৮৬
মৌমাছির চাকের উৎস ৭৬
মৌমাছির শত্রু ৮৪
মৌয়াল ৮, ১৩, ৮৪
ম্যানাটিস ৮৪
যান্ত্রিক পরাগায়ন ১০৪
রয়েল জেলি ৫৮, ৬১, ৬৯
রেড ক্লোভার ১৫, ১৬
লাউয়ের বাক্স ৭৩
শস্য পরাগায়ন ১১১
শিংমুখো মৌমাছি ৩০, ৩৪, ১০০, ১২৬
সরীসৃপ ৮৪
সাভানা অঞ্চল ৬৭, ৮২
সেরুমেন ১৯১
সামাজিক মৌমাছি ১০, ১৫, ১৬, ২২, ৪১, ৯৫, ৯৮, ১০৪, ১০৬, ১২২, ১৩৩
সুড়ঙ্গ বাসা ১৯০
স্কুপা ৩১
স্ট্রেইন ৯৩
স্বতন্ত্র মৌমাছি ১২, ১৭, ২২, ২৩, ২৮, ৪১, ৯৮, ১০৪, ১০৬
স্বপরাগায়ন ৯০
হামিং বার্ড ১০
হস্ত দ্বারা পরাগায়ন ১৭, ১৮, ১০৪
হস্ত-পরাগায়ন ১০৪
হুলবিহীন মৌমাছি ৩০
হোমোজাইগাস ৯৩

রঙিন চিত্রাবলী

চিত্র ১ : তেলাপোকার পরাগায়নের চিত্র

চিত্র ২ : *Apis dorsata*-র একটি চাক গাছের ডালে রয়েছে

চিত্র ৩ : এ খেজুর পাছটি থেকে *Trigona*-এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে। ডালের ভিতর খেজুরের ফুল দেখা যাচ্ছে

চিত্র ৪ : *Apis florea*-র একটি চাকের চিত্র

চিত্র ৬ : ভ্রমরের পরাগায়ন করা টমেটো এবং হরমোন দিয়ে পরাগায়ন করা টমেটোর তুলনা

চিত্র ৪: গবেষকরা ফাঁদ বাসা তৈরির কাজে রত

চিত্র ১০: *Apis dorsata*-র একটি কর্মীর চিত্র

চিত্র ১৩: *Apis cerana*-র একটি কর্মীর চিত্র

চিত্র ১৪: একটি *Xylocopa*-র মৌমাছি, যা আমাদের দেশে সাধারণত ভ্রমর নামে পরিচিত

চিত্র ১৫ : *Nomada*-র একটি চিত্র

চিত্র ৭ : একটি শিংমুখো মৌমাছি *(Osmia cornifrons)*-এর ফুল থেকে নেকটার ও পরাগ সংগ্রহ করছে।

চিত্র ৫ : আপেল বাগানে পরাগায়নের জন্য রাখা *Osmia cornifrons*-এর সুদৃশ্য বাসার পাশে দাঁড়িয়ে বাগানের মালিক

চিত্র ১১ : *Apis cerana*- র একটি চাকের চিত্র

চিত্র ১৩ : *Apis cerana*- র একটি বাক্স যা একজন সৌখিন মধু উৎপাদনকারী তাঁর আঙিনায় রেখেছেন

চিত্র ১৭ : একটি বন্য মৌমাছি *Lasioglossum*-এর চিত্র

চিত্র ১৮ : একটি বড় [illegible] মৌমাছি ফুল থেকে [illegible]

চিত্র ৩৬ : পরাগায়নের ফলে কলা গাছের ফলন বৃদ্ধি পায়

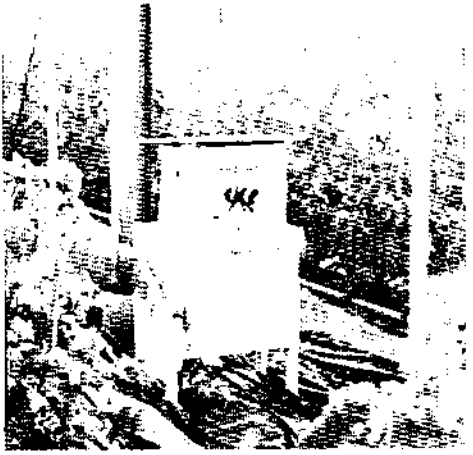

চিত্র ৩৩ : গ্রিন হাউজে পরাগায়নের জন্য স্থাপিত মৌ বাক্স

চিত্র ১৯ : *Trigona*-এর একটি কর্মীর চিত্র

চিত্র ২৪ : মিষ্টি কুমড়োর ফুলে পরাগায়নরত একটি ভ্রমর কর্মী

চিত্র ২৩ : একটি কালো ভ্রমর *Bombus ignitus* -এর ছবি। কৃত্রিম বাসায় ডিম প্রকোষ্ঠে তা দিচ্ছে

চিত্র ২৫ : একটি বড় ভ্রমরের *Bombus hypocrita*-এর চিত্র

চিত্র ২৬ : গবেষক *Osmia cornifrons*-এর সুড়ঙ্গ বাসা পরীক্ষা করছে। এগুলো আপেলের পরাগায়নে কাজে ব্যবহার করা হবে

চিত্র ২৮ : জাপানের তরুরি প্রদেশে হাত দিয়ে নাসপাতির পরাগায়ন করা হচ্ছে

চিত্র ২৪ : *Bombus ignitus*-এর কৃত্রিম কলোনির চিত্র

চিত্র ৩০ : গুজি ফুলে খাদ্য সংগ্রহ করতে প্রচুর পলিনেটর আসে

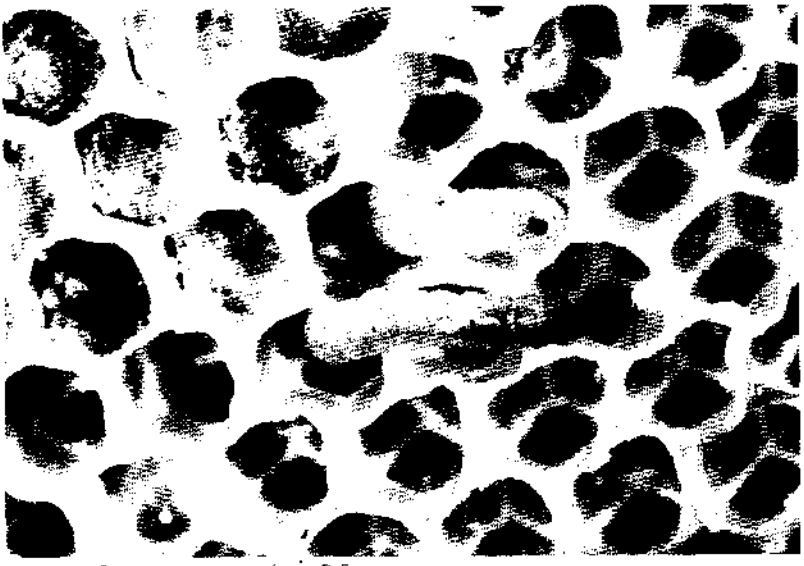

চিত্র ৩১ : মোম মথের লার্ভার একটি চিত্র, যা *Apis mellifera* -র চাক থেকে তোলা হয়েছে

চিত্র ৯ : রাস্তার পাশে বনজ গাছপালায় প্রচুর ফুল ফোটে যা মৌমাছির খাদ্যের যোগান দেয়।

চিত্র ৩২ : মৌমাছি ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করছে করবিকিউলিতে পরাগের স্তূপ দেখা যাচ্ছে

চিত্র ২০ : *Blastophaga nipponica*-এর ডুমুরে পরাগায়নের চিত্র

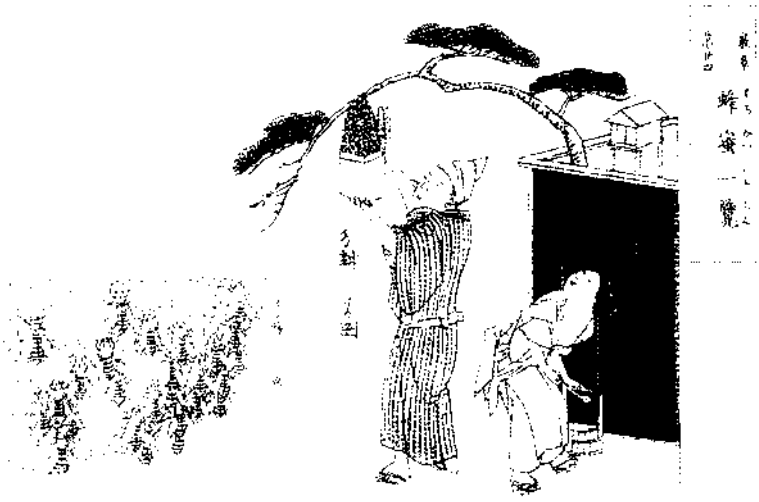

চিত্র ৩৫ : প্রাচীন জাপানের একটি অঙ্কিত চিত্রে মৌচাক থেকে মৌমাছি অপসারণ করার দৃশ্য
সূত্র-The Outline of Honey

চিত্র ৩৪ : মোম দিয়ে একটি কর্মী মৌমাছি মৌচাক তৈরি করছে

বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছির চিত্র

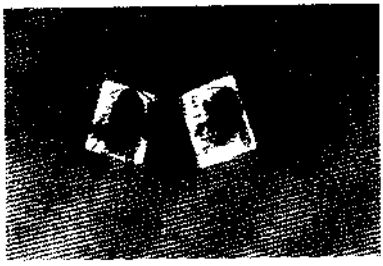

ক

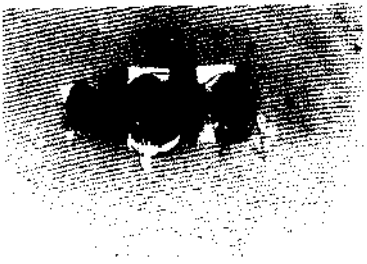

খ

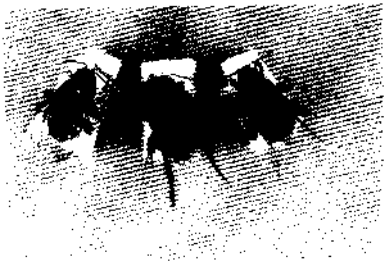

গ

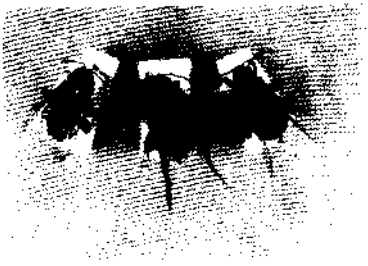

ঘ

ঙ

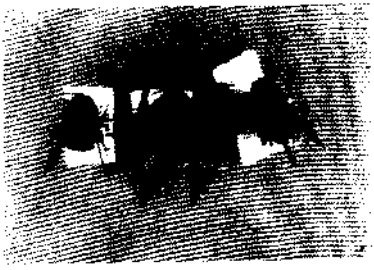

চ

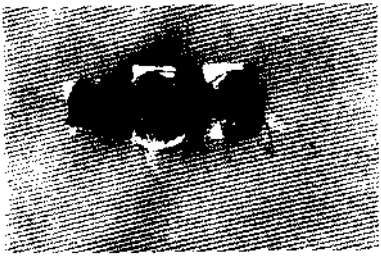

ছ

জ

বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছির চিত্র

ঝ

ঞ

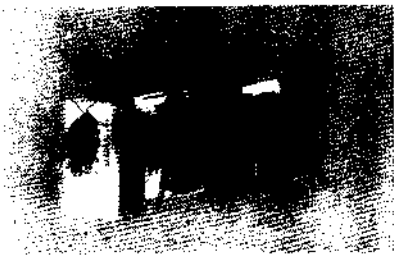

ট

ঠ

ড

ঢ

ন

ত

বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেটে মৌমাছির চিত্র

বিভিন্ন দেশের ডাকটিকেটে মৌমাছির চিত্র

ড. মোঃ আবদুল হান্নান (১৯৬৪-), বিক্রমপুর। পিএইচ.ডি. (তত্তরি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান, ১৯৯৮)। তিনি মনবুশো স্কলারশিপ নিয়ে জাপানের শিমানি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৬টি গবেষণাপত্র ও ৬০টি জনপ্রিয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রিপোর্টের সহপ্রণেতা। তিনি দেশী-বিদেশী বেশ কিছু বিজ্ঞান সমিতির সদস্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Kansas Entomological Society, USA, এবং Bangladesh Research Groups of Biodiversity. লেখক দেশে বেসরকারি পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর বিভিন্ন গবেষণা কর্মে নিয়োজিত। এছাড়াও নিজস্ব গবেষণা কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের পলিনেটর গ্রুপ-এর একটি তালিকা তৈরির কাজ করছেন। বিবাহিত। এক কন্যার জনক।